বা পৃথিবীর রসের এমন কোনও শক্তি নাই, যাহাতে ইহার কিংশুককে কদম্বরূপে বা অপরাজিতাকে চম্পকের আকারে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যেও কাক কাকই এবং কোকিল কোকিলই থাকিয়া যায়। একদিক দিয়া দেখিলে কোনও অভিব্যক্তিপরায়ণ পদার্থেরই পরিবর্ত্তন হয় না, চিরদিনই তাহার একত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

আবার, আর এক দিক দিয়া দেখিলে, ইহাই বোধ হয় যে, অভিব্যক্তিপরায়ণ পদার্থ মাত্রই কেবলই পরিবর্ত্তনশীল, ইহার একত্ব খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ভ্রূণ হইতে শিশু, শিশু হইতে বালক, বালক হইতে বৃদ্ধ,কেবলই তো পরিবর্ত্তন। ডাক্তারেরা বলেন,প্রতি সাত বৎসরের মধ্যে মানব দেহের পরমাণুপুঞ্জের সমুদায় আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যে পরমাণুপুঞ্জকে সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার দেহ বলিয়া জানিতাম, তাহার একটীও আজ এই দেহে নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে পরমাণুপুঞ্জকে প্রিয়জনের প্রিয়দর্শন অঙ্গ বলিয়া প্রেমভরে নিরীক্ষণ করিতাম, তাহার একটীও আজ সে শরীরে বিদ্যমান নাই। ফলে যাহা আছে, ফুলে বা বীজে অনেক সময় তাহার চিহ্নও লক্ষিত হয় নাই। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র পল্লব শাখা প্রশাখা ফুল ফল, কেবলই বিভিন্নতা। এই দিক্ দিয়া দেখিলে তো অভিব্যক্ত পদার্থ মাত্রই এক অশ্রান্ত ও নিত্য পরিবর্ত্তনের ইতিহাস রূপে প্রতীয়মান হয়।

ইহার কোনটীই মিথ্যা নহে। অভিব্যক্তিপরায়ণ পদার্থ বস্তুতঃই নিত্য এক ও নিত্য বহু; নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ও নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়। ফলতঃ অভিব্যক্তি বলিতেই পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিত্যত্ব ও নিত্যত্বে পরিবর্ত্তন বুঝায়।

কথাটা কেমন কেমন শুনায়; আপাতত স্ববিরোধী বলিয়াই বোধ হয়; এবং কোনও শব্দজ্ঞ পণ্ডিত ইহাকে নিতান্ত অজ্ঞের উক্তি বলিয়াই উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু এ আপত্তি খণ্ডনের উপায় নাই। অভিব্যক্তির প্রণালীকে মানবের ব্যবহারিক জ্ঞানের ভাষায় বিবৃত করিতে গেলেই, সেই ভাষার অপূর্ণতা ও অক্ষমতা নিবন্ধন, এই সকল আপাত অসঙ্গতি দোষ ঘটিবেই ঘটিবে। কিন্তু যাহারা চৈতন্যের বিকাশ বস্তুটা কি একটু ভাবিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের নিকটে ভাষাগত এ অসঙ্গতি মারাত্মক মনে হইবে না। ভাষার এই অসঙ্গতির কারণও সহজেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। অভিব্যক্তির ঘটনা সমূহকে শুদ্ধ নিত্যত্ব বা শুদ্ধ পরিবর্ত্তন, এইরূপ ভাষার ছাঁচে ফেলিতে গেলেই চৈতন্যের কার্য্য প্রণালীকে এমন সাংঘাতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করিতে হয় যে, তাহার পরে আর সে প্রণালীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। কারণ অভিব্যক্তিতে কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্যেই একত্ব প্রকাশিত হয়, এবং এই পরিবর্ত্তনের দ্বারাই একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে যুগপৎ বিভিন্নতা ও একাঙ্গতা প্রতিপাদনই অভিব্যক্তির প্রণালী। যে বিভিন্নতায় একাঙ্গতা বিনষ্ট হয় না, বরং যে একাঙ্গতা ও বিভিন্নতার প্রাকৃতিক বিরোধের মধ্যেও বিরোধের দ্বারাই মৌলিক একাঙ্গতা আরো সমধিক পরিস্ফুট ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই অভিব্যক্তির লক্ষণ। একত্ব হইতে বহুত্ব সম্পাদন, অথচ এই বহুত্বের মধ্যে মৌলিক একত্বেরই প্রতিষ্ঠা ও পরিস্ফূর্ত্তি, ইহাই অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিই সৃষ্টি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২। **পদ্যকুসুম**।—শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায় বি-এ, প্রণীত, মূল্য।০। এই সরল এবং সুরুচিপূর্ণ কবিতাপুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম। স্কুলের শিক্ষকগণ সুকুমারমতি বালকদিগের অভাব যেমন বুঝেন, এমন আর কেহ নহেন। নগেন্দ্রবাবু

সমস্তিপুর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। তিনি বালক বালিকাদিগের একান্ত উপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। এখন শিক্ষবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই পুস্তক খানির প্রতি অনুকূল দৃষ্টি করিলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হয়। উপযুক্ত ব্যক্তিগণের রচিত পুস্তক আদৃত না হইলে এদেশের ভবিষ্যতের মঙ্গল নাই।

৩। পরলোক ও মুক্তি।—মূল্য ৵০ শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। বিষম তর্ক যুক্তির কালে উন্নত অধ্যাত্মজীবনের স্বোপার্জ্জিত কথা কতদূর তৃপ্তিকর হওয়ার সম্ভব, এই পুস্তক তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ এই পুস্তক পাঠে যারপর নাই বিমল আনন্দ পাইবেন।

৪। দম্পতী সুহৃদ্‌।—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ॥০, দ্বিতীয় সংস্করণ। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। প্রথম সংস্করণে আমরা ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলাম, সুতরাং এবার আর কিছু লেখার প্রয়োজন নাই।

৫। ফুল।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ।০, দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণে আমরা ফুলের অনেক প্রশংসা করিয়াছি। এই সংস্করণে কবির অনেকগুলি নূতন কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বাবু বিপিনবিহারী রক্ষিত মহাশয় রচিত "সঞ্জীবনী" প্রভৃতি কবিতাও ইহাতে আছে। পুস্তকখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। ইহার মধ্যে যে যে কবিতা অন্য কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত।

৬। হিতকথা।—শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত, মূল্য ৵০। গ্রন্থকার নিবেদনে লিখিয়াছেন—"জগতের সাধু ও সুধী সমাজ, মানব সমাজের হিতোদ্দেশে যে সকল কল্যাণ কথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, এ পুস্তিকায় তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র শুনাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।" গ্রন্থকার মৌলিকতার কিছুই ভাণ করেন নাই। স্পেন্সার, ব্লাকি প্রভৃতি মহাত্মাগণের কথা অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিয়া দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। সার সত্য কথার আলোচনা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক কল্যাণের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে মানুষ কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে, এ পুস্তকখানি তাহার সুন্দর উপদেশে পূর্ণ। এই এক খানি পুস্তক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেকের অনেক শিক্ষা লাভ হইতে পারে। শশিবাবুর ভাষার সামান্য ২ ত্রুটী থাকিলেও, মোটের উপর ভাষা প্রাঞ্জল, মধুর এবং সংযত। শশিবাবু যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দররূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকখানি স্কুল-পাঠ্য-লিষ্ট ভুক্ত হইলে আমরা যারপর নাই সুখী হইব।

৭। হেমহার।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ॥০। এ পুস্তক অতি সুন্দর হইয়াছে। এইরূপ গল্পের অভাব আছে। অমানুষী, অতিমানুষী, অতিকল্পিত চরিত্রের চিত্রে সমাজের কি ক্ষতি হয়, নবেলের আকর ইয়ুরোপে এখন অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। জীবন্ত চরিত্রের চিত্রে আলো ও ছায়ার যথোপযুক্ত সমাবেশে কল্পনা পরাস্ত হয়, দক্ষ চিত্রকরেরা এখন তাহা বুঝিয়াছেন। আয়েসা, তিলোত্তমা, গিরিজায়া ও কপালকুণ্ডলা বঙ্গ সমাজের কি ক্ষতি করিয়াছে, বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রে তাহা বুঝিয়াছেন। বাঙ্গলার জোয়ারে ভাটা পড়িলে বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্ম ও সমাজ-হিতৈষণার পরীক্ষার প্রকৃত সময় হইবে।

৮। সেক্সপিয়র।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ১॥০। আটখানি নাটকের মর্ম্মানুবাদ ইহাতে আছে। যথা অথেলো, ভেনিস্ নগরের বণিক, রোমিও জুলিয়েট, পেরিক্লিস, ভ্রাতা ও ভগিনী, টাইমন, সিম্বেলিন, ও লিয়র। মূলগ্রন্থের ভাবের সুকুমারতা ভাষান্তরে রক্ষা করা যায় না। বিশেষতঃ রঙ্গমঞ্চে আরভিঙের ন্যায় নটের অভিনয় না দেখিলে, বিদেশী গ্রন্থ ও টীকা পড়িয়া সেক্সপিয়রের ভাব সমুদায় গ্রহণ করিতে

পারা যায় না। এই পুস্তকে নাটকগুলির গঠন-কৌশল দেখাইতে যত চেষ্টা করা হইয়াছে, ভাবের উৎকর্ষতা, সুকুমারতা ও জটিলতা দেখাইতে তত চেষ্টা করা হয় নাই, ইহা বড় সন্তোষের কথা। ইংরাজি-অনভিজ্ঞ লোকে সেক্সপিয়র সম্যক বুঝিতে পারিবেন, কখন আশা করা যায় না। অথচ আখ্যায়িকার গঠন-কৌশলে সেক্সপিয়র যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা বালক বালিকা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারে। সেক্সপিয়রের এই দক্ষতা এই গ্রন্থে স্পষ্ট প্রকটিত হইয়াছে। ভাষা বিশদ ও কোমল, বুঝিতে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। ল্যাম্ব সাহেব সেক্সপিয়রের আখ্যায়িকার ইংরাজি ভাষায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এই গ্রন্থকারের কৃতিত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এই গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় একটী অভাব মোচন করিয়াছে। ইংরাজি-নবিশেরাও আনন্দে এ গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আশা করি, গৃহে গৃহে ইহা সমাদৃত হইবে। এই গ্রন্থ খানি সচিত্র। ইহাতে ২২ খানি ছবি আছে।

৯। রায়পরিবার।—(গার্হস্থ্য উপন্যাস) শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ১৷৹। আজ কাল বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাস-লেখকের বড়ই প্রাদুর্ভাব। শস্তার বাজারে খাঁটি জিনিস বাছিয়া লওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইলেও, ভাল জিনিসের আদর কমে না। "রায়পরিবার" একখানি প্রকৃত উপন্যাস। এ পুস্তকে গ্রন্থকার অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় একটী বঙ্গপরিবারের যথাযথ চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র-নৈপুণ্য খুব প্রশংসনীয়। নীতি উচ্চ, রুচি মার্জ্জিত। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু একটী কথা বলিয়া আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না। গ্রন্থের প্রধান চিত্র রায় মহাশয়, কৃপাময়ী, রামকমল, কৃষ্ণকমল, স্বর্ণকমল, দীনেশ চন্দ্র, মহামায়া, মুক্তকেশী, সুকুমারী ও গিরিবালা, সর্ব্বশেষে সুধীরচন্দ্র। সকল গুলি চিত্রই গ্রন্থকার সুন্দর নৈপুণ্যের সহিত আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্ণকমল, দীনেশচন্দ্র ও সুধীরচন্দ্রের চরিত্রে—বর্ত্তমানসুশিক্ষার ফল এবং সুকুমারী ও গিরিবালার চরিত্রে, সুকোমল রমণী-চরিত্র-সুশিক্ষার পথকে কত সুন্দর, কত মধুরকরে, তাহাই দেখান হইয়াছে। মানুষ কুসংসর্গে কুশিক্ষায় কত হীন হইতে পারে—কত স্বার্থপর ও জঘন্য হইতে পারে—রামকমল, কৃষ্ণকমল, মহামায়া, মুক্তকেশী, নন্দগোপাল প্রভৃতির চরিত্র তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। গ্রন্থকার স্বর্ণকমল ও সুকুমারীর চরিত্র দুটীকেই অধিকতর উজ্জল করিয়াছেন। সুকুমারীর চরিত্র আঁকিবার সময় গ্রন্থকার একটী দিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে চিত্রটী আরো পূর্ণ হইত বলিয়া মনে হয়। সকলের প্রতিই সুকুমারীর দয়া দাক্ষিণ্য ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাহার পিতৃকুলের সম্বন্ধে যেন আমাদিগকে একটু আঁধারে রাখিয়াছেন। সে দিকটা একটু পরিষ্কার হইলে সুকুমারীর চরিত্র যেন আরো মধুর হইত। আর রাম কমলকে মানবদেহে দানব সাজাইতে যাইয়া গ্রন্থকার দুই একটা ঘটনা একটু অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার পাশবিক ব্যবহারই সম্ভবপর, কিন্তু আপনার মাতা, ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টাটা যেন আমাদের কাছে একটু অধিক অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। জানি না, হিন্দুকুলে এমন কুলাঙ্গার আছে কি না। খাঁটি সোণা যেমন পোড়াইলে উজ্জল হয়, স্বর্ণকমল, সর্ব্বোপরি সুকুমারীর চরিত্রও, বিপদের পর বিপদে, অত্যাচারের পর অত্যাচারে ফেলিয়া গ্রন্থকার উজ্জল হইতে উজ্জলতর করিয়াছেন। আমরা দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে এক-বাক্যে বলিতেছি "এমন রমণী যদি বঙ্গে অধিক থাকিত, তবে বুঝি বাঙ্গালীর দুঃখ থাকিত না।" কিন্তু এই গ্রন্থখানির গল্পাংশ সম্পূর্ণ রূপ "স্বর্ণলতার" দ্বারা অনুপ্রাণিত।

১০। শ্রীমদ্গোপাল ভট্টগোস্বামীর জীবন-চরিত।—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত মৈনা শ্রীহট্ট হইতে শ্রীঅনিরুদ্ধ চরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৹ আনা। জীবন-চরিত বলিলে যাহা বুঝা যায়, এইগ্রন্থে তাহা নাই। তবে গ্রন্থখানি পাঠ করিলে একটী ভক্ত জীবনের কতকগুলি ঘটনার আভাস পাওয়া যায় মাত্র। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য

দেবের প্রচারেরও কিছু কিছু ঘটনা জ্ঞাত হওয়া যায়। ভক্ত জীবনের সকলই উপাদেয় ও জীবন্ত,সুতরাং এসম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহাই আদরনীয়। গ্রন্থের ভাষা একেবারে নির্দ্দোষ না হইলেও সহজ হইয়াছে।

১১। নীতিকণা।—শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত।—এখানি ছেলেদের পাঠ্য নীতিগ্রন্থ; পদ্যে লিখিত। মূল্য ৵০। ছাপা খুব ভাল হইয়াছে। বর্ণাশুদ্ধি নাই। নীতি কথা গুলি ভালই। তবে ভাষাটা খুব সরল হয় নাই। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, এ তাঁহার প্রথম উদ্যম। তাঁহার এ উদ্যম প্রশংসনীয় বটে।

১২। সারনিত্যক্রিয়া।—অর্থাৎ-বেদের সারভাগ। ইহাতে পরমহংস শিব নারায়ণ স্বামীর কতকগুলি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ হিন্দিভাষায় লিখিত। "সাধারণ উপদেশ" 'ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণ' প্রভৃতি কতক ৺গুলি উপদেশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১৩। জীবন-সন্দর্ভ।—(প্রথমভাগ) জনৈক নববিধান-ব্রাহ্মসমাজের সভ্য কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ।৵০। এ পুস্তক খানিতে চিন্তা, মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য, কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রভৃতি ২০টী চিন্তাশীল ও সারবান প্রবন্ধ আছে। ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ এ গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর হইয়াছে।

১৪। প্রেম-পঞ্চক ও জীবন-সঙ্গীত। —শ্রীশ্রীশ গোবিন্দ সেন প্রণীত; সান্যাল এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০। এখানি পদ্য গ্রন্থ। প্রেম-পঞ্চকে গ্রন্থকার দুটী প্রেমিকের ছবি আঁকিয়াছেন। এবং জীবনসঙ্গীতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও নিয়তি কি,বিশেষ ভাবে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাব পবিত্র ও উচ্চ। ভাষা মিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্যের একটু অভাব দৃষ্ট হয়।

১৫। স্বভাব-নীতি।—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত। জীব জন্তুর প্রকৃতি দেখিয়া আমরা কি নীতি শিক্ষা করিতে পারি, গ্রন্থকার তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ খুব ভাল হইয়াছে। ভাষা সরল ও সুপাঠ্য।

১৬। প্রেমাশ্রু।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি,এ, এল, এম, এস্, প্রণীত,মূল্য ।৵০ আনা। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন ;—

> "কি করিয়া মানুষের প্রাণ শোকে তাপে আকুলিত হইয়া স্তবকে স্তবকে স্বর্গরাজ্যের দিকে ধাবমান হয়, তাহারই আভাস কতকটা ইহার ভিতরে আছে।"

তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না, এ সম্বন্ধে তিনি একটু সন্দিহান হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই। আমরা কবিতাগুলি পড়িয়া বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি। সমস্ত কবিতাগুলিই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। ভাব বিশুদ্ধ ও উচ্চ, ভাষা সুমধুর ও সরল হইয়াছে। আশা করি,আমাদিগকে মাঝে মাঝে এরূপ সুললিত ও সুন্দর কবিতা পাঠে গ্রন্থকার বঞ্চিত করিবেন না।

১৭। সঙ্গীত-প্রবাহ।—(প্রথম উচ্ছ্বাস) শ্রীগোপালচন্দ্র মৈত্রেয় বিরচিত ও প্রকাশিত—মূল্য ৶০, এ পুস্তক খানিতে কতকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক সংগীত আছে। সঙ্গীতগুলি পুরাতন সাধক সঙ্গীতের অনুকরণে রচিত। কিন্তু ভাবের গভীরতায় কিম্বা ভাষার মধুরতায় কিছুতেই সেই পূর্ব্বতন সাধকসঙ্গীতের তুল্য নহে। তবে ধর্ম্ম-সঙ্গীত পড়িলেই উপকার হয়, এই যা কথা।

১৮। চিকিৎসক ও সমালোচক। —মাসিক পত্র, ডাক্তার শ্রীসত্যকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত। আষাঢ়-শ্রাবণ,১৩০৩ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। বার্ষিক মূল্য ২৲। এই পত্রিকাখানি সুসম্পাদিত হইতেছে। ইহাতে অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসা থাকে।

দুঃখ।

এ সংসারে দুঃখের বিষয়ে কত চিন্তা ও আন্দোলন হইয়া থাকে! সকলেই ভাবে, আমার এ সব অভাব কিসে দূর হইবে? স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ হয় না, স্বীয় মান সম্ভ্রম বজায় রাখা যায় না, কন্যাবিবাহের ব্যবস্থা হয় না, শরীর নিরোগ হয় না— উপায় কি? বিধাতা কি শেষকালে চিন্তা চেষ্টা করিয়া এমনই সৃষ্টি রচনা করিলেন যে, দুঃখ ব্যতীত লোকই দেখা যায় না? ঐ যে ক্রোড়পতি অশ্বযুগল যোজনা করিয়া সুন্দর শকটে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন, অনুসন্ধান করিয়া দেখ, হয়ত পুত্রশোকে পুত্রশোকে তাঁহার হৃদয় চিরকালের জন্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বিধবা বালিকার দীর্ঘশ্বাসে তাহার ঐশ্বর্য্য ভস্ম হইতেছে। আর ঐ যে অন্ধ বৃদ্ধ দিনান্তে শাকান্ন সংগ্রহ করিতে অপারক, শীতে ঠক্ ঠক্ কাঁপিতেছে—বিধাতার কি এমনই ইচ্ছা, উহার যে একমাত্র শিশুকন্যাটী যষ্ঠি ধরিয়া দ্বারে দ্বারে লইয়া যাইত, এই কলেরা রোগে সে-ই মারা গেল, আর ঐ বুড়ো মরিল না? বিধাতাই যখন দুঃখ কষ্টকে সৃষ্টি মধ্যে যত্নে আশ্রয় প্রদান করিতেছেন, তখন আর নিবৃত্তিই বা কি প্রকারে হইবে? যে বায়ু না হইলে প্রাণ রক্ষা হয় না, যাহাকে প্রাণ বলে, দেখ দেখি, সেই বায়ুর আঘাতে কত ঘর বাড়ী, নৌকা জাহাজ, উদ্ভিদ্ প্রাণী ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে—লৌহময় অট্টালিকা পর্য্যন্ত ঘূর্ণিত হইতেছে। যে জল না হইলে জীবন রক্ষা হয় না, যাহাকে জীবন বলে, দেখ দেখি, সেই জল বন উপবন গ্রাম নগর দেশ মহাদেশ প্লাবিত করিয়া কত কষ্টই না প্রদান করে! যে অগ্নি শরীরে না থাকিলে জীবন সৃষ্টি হয় না, যাহার সাহায্যে সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা আমরা শরীর রক্ষা করিতেছি, যাহার আশ্রয়ে অমানিশার অন্ধকারে নির্ভয়ে বিচরণ করি, বিধাতার কি এমনই অভিপ্রায়, সেই আগুনে আমার ঘর বাড়ী ভস্মীভূত হইল, শশীর পুত্রটী পুড়িয়া মরিল, খিদিরপুরে অসংখ্য নরনারী নিরাশ্রয় হইল, কত জাহাজ, কত ট্রেন যাত্রীসহ দগ্ধ হইয়া গেল! কতই বা বলা যায়? বলিতে গেলে শেষ নাই। যে পদার্থটী ধরিবে, তাহাতেই দেখিবে যে, তাহা কত রকমে দুঃখদায়ক। পদার্থের মর্ম্মস্থানে, সৃষ্টির রঞ্জে রঞ্জে দুঃখ ক্লেশ এমনই নিবিষ্ট রহিয়াছে যে, তাহার উচ্ছেদ সম্ভবপর নয়। তবে আর বলিব না কেন যে, বিধাতার অভিপ্রায়ই জীবকে কষ্ট দেওয়া? কথাটা কষ্টদায়ক বটে, অবিশ্বাসব্যঞ্জক বটে, ধর্ম্মাত্মার নিকট ঘৃণিত বটে— কিন্তু কি করি, সত্যইত প্রচার করিতে হইবে? আমাকে অধার্ম্মিক, অবিশ্বাসী, পাপী, নাস্তিক, নারকী বলিতে পার। কিন্তু এ কথা বলিতে ছাড়িব না যে, তুমি তোমার ধর্ম্মগ্রন্থে, আরাধনায়, প্রার্থনায়, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনে বিশ্বস্রষ্টার যে নামই কেন দেও না, তিনি যখন দুঃখকে সৃষ্টির অঙ্গে অঙ্গে, শিরায় শিরায়, রঞ্জে রঞ্জে এরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রবিষ্ট করিয়াছেন, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, জীবকে কষ্ট দেওয়া তাঁহার অভিপ্রায়।

বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া কেহ কেহ বলেন, দুঃখকে গ্রাহ্য করিতে হইবে না, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না, কষ্টে কষ্টবোধ করিতে হইবে না, অটল অচল ভাবে ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। কিন্তু হা অদৃষ্ট! ভগবান কি সে পথ খোলা রাখিয়াছেন? দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করিব না, অমানিশার অন্ধকারে শারদীয় জ্যোৎস্না দেখিব, ব্যাধি দারিদ্যের বৃশ্চিক-দংশনে স্বর্গীয় সঙ্গীত অনুভব করিব, এ শক্তি কি বিধাতা আমার হাতে রাখিয়াছেন? তাহলে যে তাঁর অভিপ্রায় বিফল হয়, আমাকে কষ্ট দিতে পারেন না। এ সংসারে অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্র হইয়া আপনাকে সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ বলিও না, তাহলে তোমার কষ্ট আরো বাড়িবে, চারিদিক হইতে ইট পাথর যষ্ঠি মুদ্‌গর তোমার সম্ভাষণে প্রযুক্ত হইবে! এ জীবনে ত কত কষ্টই ভোগ, কই কখনত দুঃখকে সুখ বলিয়া অনুভব করিতে পারিলাম না?

দুঃখ কি আমাদিগকে এক রকমে বেদনা দেয়? বর্ত্তমান দুঃখ; তারপর আবার দুঃখের স্মৃতি, ভবিষ্যতের নৈরাশ্য। একেত দুঃখের যন্ত্রণায় অস্থির, তারপর আবার দুঃখের দুঃখ। দুঃখ কেন জগতে সৃষ্টি হইল? দুঃখের পরিণাম কি? এই সকল প্রশ্ন লইয়াই বা কত লোকে কষ্ট করিতেছেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছেন। কেহ বলিতেছেন,"দুঃখ কি বিধাতা দিতেছেন? তোমার দুঃখ তুমি আপনিই সৃষ্টি করিয়াছ, এ তোমারই অতীত অধর্ম্মের ফল। তুমি তোমার স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াছ,তার ফল তোমায় ভোগ করিতেই হইবে। ঈশ্বর তোমার দণ্ডবিধান করিতেছেন, সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ কর, তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে।" ভাল, তাই যদি হয়, তবে কেনইবা এ স্বাধীনতা দান, কেনইবা এ দণ্ডবিধান, আর কেনইবা এ চিত্তশুদ্ধি? আমাকে আদ্যন্ত শুদ্ধচিত্ত রাখিলেই ত হইত? আর সকল দুঃখত বাস্তবিক আমার একার পাপের ফল নয়। পূর্ব্বপুরুষ কোন্ কালে কি অজ্ঞাত অপরাধ করিয়াছেন, তার জন্য আমি ব্যাধিগ্রস্ত! নগরের এক প্রান্তে, লোকে স্বাস্থ্যের কি নিয়ম ভঙ্গ করিল, আর অমনই অপর প্রান্তে, দেশ দেশান্তে, সেই দণ্ড বিস্তৃত হইয়া পড়িল, জলের স্রোতে, বায়ুর প্রবাহে সেই দণ্ডবিধান বিস্তৃত হইতে লাগিল! বিচার করিয়া কে ইহার সিদ্ধান্ত করিবে? তাই বলে, বিধাতার লীলা, ভগবানের খেলা। কি আশ্চর্য্য! জীবের দুঃখ লইয়া খেলা! শিশুর ঢিলে একটা ভেকের পা ভাঙ্গিলে সে ঘৃণিত, আর এই কোটি কোটি জীবের হৃদয় ভাঙ্গিয়া বিধাতার খেলা! তাঁহার খেলার জন্য জীবসৃষ্টি, আর জীবকে কষ্ট প্রদান! এ লীলার মহিমা আমি বুঝি না। আমার কাছে দুঃখটাই প্রধান বলিয়া বোধ হয়। ঐ রূপ কল্পনা জল্পনায় আমার পরিতৃপ্তি হয় না। দুঃখের উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা করিবার অবসর ও শক্তি আমার নাই। ঐ সব দর্শন মর্শন, বিজ্ঞান কুজ্ঞান আমি বুঝি না। আমি দুঃখেই জর্জ্জরিত, আমি বুঝি দুঃখ। দুঃখ দুঃখই—সুখ নহে। সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুঃখ, জীবের মজ্জায় মজ্জায় দুঃখ। স্রষ্টার যখন এই অভিপ্রায়, তখন আর উপায় কি? তিনি যখন কথায় কথায়, পদে পদে বলিতেছেন 'দুঃখ নেও দুঃখ নেও', দুঃখ তোমার নিতেই হইবে, উপায় নাই। সন্তুষ্ট চিত্তে নেও—এ কথা বলি না। দুঃখের সহিত সন্তোষ মিশ্রিত

হয় না, দুঃখে উপেক্ষা ঔদাস্য সম্ভব নয়। বৃথা দুঃখের উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা করিও না।

অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে যখন বোধ হয়, সম্মুখে ঘাসের ভিতর কি যেন আছে, তখন তুমি ঘাসের উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা কর, না সেই ঘাসের দিকে তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর? পান করিবার নিমিত্ত যখন নদীর জল উত্তোলন কর, তাহার ভিতর কিছু আছে কি না, দেখিবার জন্য নদীর উৎপত্তির অভিমুখে ছুটিতে থাক, না সেই পান পাত্রের ভিতর সূক্ষ্মতর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর? সহচর বন্ধুর চক্ষুর ভিতর অকস্মাৎ কিছু প্রবেশ করিলে, সেই মলয় পবনের উৎপত্তি স্থানে উড়িয়া যাও, না বন্ধুর চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাহারই ভিতর সূক্ষ্মরূপে অন্বেষণ কর? তাই বলি, দর্শন বিজ্ঞানের ঐরূপ উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা তোমার আমার পক্ষে আবশ্যক কি; দুঃখের সম্বন্ধে আমি দর্শন বিজ্ঞান বুঝি না, মায়াবাদ, অবিদ্যাবাদ, অদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যবাদ, অনাত্মবাদ, কিছুই মানি না। সোজা কথায় এই বুঝি যে, আমি জীব ত বটে, যত দিন জীব থাকিব, যত কাল অপূর্ণ থাকিব—(কখনও কি পূর্ণ হইব?)—আমার অভাব থাকিবেই। আর অভাব থাকিলেই দুঃখ। দুঃখ জীবের সহচর, জীবাত্মার অবিচ্ছেদ্য উপকরণ।

সামান্য বুদ্ধিতে লৌকিক চক্ষে একবার দুঃখের দিকে তাকাও। দেখিবে, সব দুঃখ সমান নহে। পিপীলিকার কামড় হইতে মৌমাছির হুল শতগুণ কষ্টদায়ক, কার্ত্তিকের শীত অপেক্ষা মাঘের শীত সমধিক ক্লেশপ্রদ, পৌষের রৌদ্র অপেক্ষা জ্যৈষ্ঠের উত্তাপ অধিকতর দুঃসহ। এক দিনের সর্দ্দির কাছে শিরঃশূল কি ভয়ানক! অপরিচিত প্রতিবেশী বিয়োগের তুলনায় পুত্রশোক অসহ্য। এইরূপ দুঃখের অবস্থার দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, দুঃখের প্রাখর্য্য ভেদ আছে। আর প্রাখর্য্যভেদ না থাকিলে যে চলে না—সৃষ্টির অভিপ্রায় বিফল হইয়া পড়ে—দুঃখের লাঘব হয়, তাহা নহে, দুঃখের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়। সর্ব্বদা যে দুর্গন্ধ ঘৃণার জনক স্থানে থাকে, তার কি শেষে আর বোধ থাকে? একই দুঃখ কিছু দিন থাকিলে তাহা সহ্য হইয়া যায়, ভুগিতে ভুগিতে অনুভব শক্তির বিলোপ হয়। তখন দুঃখদাতা দুঃখের প্রাখর্য্য একটু বাড়াইয়া দেন, আর জীব সজীব হয়, পুনরায় দুঃখ অনুভব করে। দুঃখের বোধ শক্তি তিরোহিত না হয়, তাই বিশ্বস্রষ্টার এত আয়োজন, দুঃখের এই অনন্ত প্রাখর্য্যভেদ, তাই তিনি অসংখ্য পিপীলিকা দ্বারা সর্ব্বদা জীবকে চিমটি কাটিতেছেন, অনন্ত বিষদন্ত দ্বারা জীবকে সর্ব্বদা দংশন করিতেছেন। অবিশ্বাসী পাপী নারকীর উক্তি—কিন্তু সত্যের অপলাপ ত ধর্ম্ম হয় না? সত্য কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশ্ব যদি তাঁরই হয়, দুঃখ দাতাও তিনিই। তিনি কেবল সুখ শান্তি দেন, আর সয়তান দুঃখ দেয়? এই বিশ্বে তাঁরও যেমন অধিকার, সয়তানেরও তেমনি—তদপেক্ষা অধিকতর অধিকার? তা নয়, তিনিই দুঃখদাতা। সুখ বর্ণনা করিবার সময় যথাযথ বর্ণনা করিবে, অলঙ্কারের আশ্রয় লইবে, আর দুঃখ বর্ণনা করিবার সময় পাছে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি দোষারোপ হয়, এই ভয়ে লেখনী সংযত করিবে, অলঙ্কার ছাড়িয়া দিবে, যেন প্রকৃত সত্য পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারে। এ তোমার কেমন সত্য—কেমন ধর্ম্ম? সুখের বিষয়ে যদি বল

যে, তিনি সুখের অনন্ত আয়োজন করিয়া, সর্ব্বদা অন্তরালে থাকিয়া, সকল প্রকারে সুখবিধান করিতেছেন, দুঃখের বিষয়ে কেন বলিতে কুণ্ঠিত হইবে যে,তিনি অনন্ত দুঃখের আয়োজন করিয়া, সর্ব্বদা অন্তরালে থাকিয়া, সর্ব্বপ্রকারে দুঃখ দিতেছেন ? সুখের বিষয়ে সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সহস্র কণ্ঠ পবাভূত করিয়া, চিৎকার কর, আর দুঃখের কথা পাড়িলে কেন একধারে সরিয়া অদৃশ্য হও ? নাস্তিক, তুমি না আমি ? অসত্য অসরলতা তোমার, না আমার ?

আমি তাঁর সৃষ্টি,সকল প্রকারে তাঁর আয়ত্তাধীন, তাইত তিনি আমাকে কষ্ট দেন। সুখ অনেকেই দিতে পারে, কিন্তু নিরুপায় অনাথ নিরাশ্রয় যদি সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন না হয়,তবে কি তাহাকে কষ্ট দেওয়া যায় ? জীব তাঁহার সম্পূর্ণ করায়ত্ত, তাইত তিনি জীবকে কষ্ট দেন, নতুবা কি পারিতেন ? কেবল কি দুঃখের প্রাথর্য্যভেদ করিয়া ক্ষান্ত, দুঃখের আবার আয়তন-ভেদ করিয়াছেন। একে গায়ে কাপড় নাই, তাতে আবার অন্নাভাব, আবার দেখ ছেলেটীর অসুখ হইয়া পড়িল, ঔষধই বা কোথায় পাই, আর পথ্যের পয়সাই বা কে দেয় ? গৃহিণীর অসুখ, তাতে আবার ঝি আসে নাই, ব্রাহ্মণ পালাইয়াছে, আবার দশটায় আপিসে না যাইতে পরিলে সাহেবের ভ্রুকুটী ! রোগ যখন আসে,তখন কি কেবল একটী যন্ত্রণা ? কথাই আছে "ছিদ্রেস্বনর্থা বহুলী ভবন্তি"। অভাবের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের আয়তন বৃদ্ধি। মানব এ সংসারে একা বিচরণ করে না। জীবনের সহিত জড় জগতের কি একটী পদার্থের সম্বন্ধ ? জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোন্ পদার্থের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই ? যার সঙ্গে সম্বন্ধ, সে-ই যেমন আমাকে সুখ দিতে পারে, তেমনি আবার দুঃখও দিতে পারে। দুঃখের আয়তন বৃদ্ধির সম্যক আয়োজনেই সংসার রচিত। এক বিষয়ে দুঃখ পাইতেছ, বিষয়ান্তর চিন্তা কর, আরও দুঃখ বাড়িবে। কোন্ পথে তুমি পলাইবে ? চারিদিক আবদ্ধ।

তাই বলি,যতই চিন্তা কর,দুঃখ বাড়ে বই কমে না। ভূত ভবিষ্যৎ, উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা করিয়া কূল কিনারা পাওয়া যায় না, কোন স্থির সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। সিদ্ধান্ত করিলেও তাহাতে বর্ত্তমান দুঃখের কিছুই লাঘব হইবার নয়। আবার দেখিলে, দুঃখের স্বরূপ-চিন্তা করিলে বোঝা যায় যে, যাহাতে দুঃখ সজীব থাকে, জীবন বেদনা-বিহীন না হয়, তাহার বিধিমত ব্যবস্থা রহিয়াছে। একথা বলিতে পারা যায় যে, জীব যেমন পঞ্চভূতে নির্ম্মিত,তদ্রূপ দুঃখও একটী ষষ্ঠ ভূত। দুঃখময় জীবন, জীবনময় দুঃখ।

জীবন যখন এড়াইতে পারিতেছ না, স্রষ্টার রাজ্য যখন পরিত্যাগ করিতে পার না, দুঃখদাতার শাসন অতিক্রম করিবার শক্তি যখন নাই ; তখন কেন মিছে মারামারি, কেন মিছে অসরল অকৃতজ্ঞতা, কেন মিছে সত্যের অপলাপ ? সর্ব্বান্তঃকরণে দুঃখদাতার বশীভূত হও, ভগবানের ইচ্ছা পালন কর। দুঃখদাতার অভিপ্রায় কখনও অন্যথা হইবে না। তিনি যখন দুঃখের এত আয়োজন করিয়াছেন, এত প্রাথর্য্যভেদ,আয়তনভেদ করিয়াছেন ; তিনি যখন সর্ব্বদা বলিতেছেন, "দুঃখ নেও,দুঃখ নেও"; তখন দুঃখ নেওই না কেন ? আর দুঃখ যখন তোমার জীবনের উপকরণ, তখন দুঃখের জন্য তোমার একটা অতৃপ্য পিপাসাও থাকিতে পারে। পঞ্চভূতের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা ত রহিয়াছে। জলের

জন্ম পিপাসা, অন্নের জন্ম ক্ষুধাত নিশ্চয়ই আছে, তবে এই ষষ্ঠভূত দুঃখের জন্ম একটা অনিবার্য্য আকাজ্ক্ষা নাই কি? এ দার্শনিক কল্পনা নয়, কবির উপমা নয়। দুঃখ যখন জীবনের মজ্জাগত,তখন যুক্তিদ্বারাই পাওয়া যায় যে,দুঃখের জন্ম একটা আকাঙ্ক্ষা আছে —চিত্তের বিকার হৃদয়ের প্রলাপ নয়,একটী স্বাভাবিক ক্ষুধা আছে। যখন স্রষ্টার অভি-প্রায়ে "দুঃখ নেও দুঃখ নেও" একটা ধ্বনি হইতেছে, তখন জীবের হৃদয়ে "দুঃখ দেও দুঃখ দেও" একটী আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই উত্থিত হইবে। এত যুক্তির কথা, কিন্তু তোমার হৃদয়ের দিকে তাকাও ত সত্য সত্যই উপ-লব্ধি করিবে যে,জীবনের মূলে দুঃখের ক্ষুধা বাস্তবিকই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তবে আর ভূত ভাবিষ্যতের দিকে চাহিও না,উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা করিও না,দুঃখেতে সুখের ভ্রম রাখিও না। দুঃখ বাড়াও,দুঃখকে প্রখর ও বিস্তৃত কর। এক বিষয়ে দুঃখ ভুগিতে ভুগিতে যদি অনুভব ম্লান হইয়া থাকে,বিষয়া স্তর অবলম্বন কর। আজীবন অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইতে পাইতে যদি তদ্বিষয়ে দুঃখবোধ বির-হিত হইয়া থাক, বিদ্যা বুদ্ধি শ্রদ্ধা চরিত্রের অভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দুঃখকে জাগরূক কর। কেবল অভাবের সংখ্যা বাড়ান নয়, দুঃখকে প্রখর কর,ক্রমশঃ তাহা অসহ্য হউক। এই সব চিন্তা করিয়া যখন দুঃখ প্রখর হইল, তখন—আর কি করিবে? দুঃখ আরো বাড়াও।

"স্ত্রীর পরিবারের অভাবের অভাব চিন্তা করিতে করিতে দুঃখ কষ্টে যখন শরীর অবসন্ন হইতেছে, হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে, তখন যে আর দুঃখ সহ্য হয় না? আমি কেন এই পরিবারের প্রতিপালক হইলাম? আমি যে ইঁহাদের কোন অভাব দূর করিতে পারি না। স্ত্রীপুত্রকে সমুচিত আহার দিতে পারি না, তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির সহায়তা করিতে পারি না,দাসদাসীর উপযুক্ত বেতন দিতে পারি না,তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে তাকাইতে পারি না, অভাবে রোগে সাহায্য করিতে পারি না।—চিন্তা করিতে গেলে কষ্ট যে অসহ্য হইয়া পড়ে।"

এইরূপ যখন অবস্থা তখন?—আর কি বলিব? দুঃখ আরো বাড়াও। দুঃখদাতা তোমাকে দুঃখের উপকরণেই গঠন করিয়া-ছেন, দুঃখভারে জীবন কখনই ভাঙ্গিবে না। দুঃখের অভাবে জীবন বাঁচিবে না। দুঃখ বৃদ্ধিই করিতে থাক। বামে দক্ষিণে তাকাইও না, অগ্র পশ্চাৎ দেখিও না,পরিণাম চিন্তা করিও না, কেবল দুঃখ বাড়াও—প্রাখর্য্য বাড়াও, আয়তন বাড়াও। নিজের দুঃখ, পরিবারের দুঃখ যথেষ্ট হইতেছে না,দুঃখ আরো বাড়াইতে হইবে। দুঃখের মাত্রার শেষ নাই,যতই বাড়াও, ততই বাড়িবে। কোন্ প্রতিবেশী অনাহারে আছে, কাহাব পুত্রকন্যা বস্ত্রহীন, কাহার ছেলের শিক্ষা হইতেছে না—এই সকল সূত্রে দুঃখকে বাড়াও। সে যেন তোমারই ঘরে অন্ন নাই,তোমারই পুত্রকন্যা বস্ত্রহীন,তোমা-রই শিশু অশিক্ষিত, এইরূপ উপলব্ধি কর—নতুবা তোমার দুঃখ বাড়িবে না। তোমার পাড়ায় পুকুর নাই, সকলের পিপাসার নিদা-রুণ কষ্ট তুমি সহ্য কর, সহস্র জিহ্বার জলা-ভাব তুমি অনুভব কর, সহস্র শুষ্ক কণ্ঠের অসহ্য যন্ত্রণা তুমি ভোগ কর। ম্যালেরিয়া জ্বরে তোমার দেশ উৎসন্ন হইতেছে, সকল জ্বররোগীর প্রদাহ, সকলের কষ্ট তোমার নিজের করিয়া লও। দুঃখ যত বাড়াইবে, ততই বাড়িবে। তোমার এই বঙ্গভূমির জেলায় জেলায় দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাবে লোকে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণা আরো

বাড়াইতেছে, অন্ন কষ্টের সহিত রোগ যন্ত্রণা যোগ করিতেছে। প্রেমময়ী পত্নী স্নেহের সন্তান পরিত্যাগ করিয়া উদ্বন্ধনে পলায়ন করিতেছে। এই কোটি কোটি প্রাণীর ক্ষুধার জ্বালা, রোগের যন্ত্রণা, পত্নীর পতিবিরহ, শিশুর পিতৃশোক, নিরুপায়ের নৈরাশ্য যদি তোমার হৃদয়ে একীভূত করিতে পার, তোমার দুঃখ কত বাড়িবে, তোমার যন্ত্রণা কত দুঃসহ হইবে। তার পর আরো বাড়াও। তোমার এই ভারতে অন্যায় অবিচার, অধর্ম্ম অত্যাচার ভীষণ যমদূতবেশে নগরে নগরে, সমাজে সমাজে, পাড়ায় পাড়ায় বিচরণ করিতেছে, লৌহময় মুদ্গরের প্রহারে নরনারীর মস্তক চূর্ণ করিতেছে, শাণিত তরবারির অবিরাম আঘাতে কত শত হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। এই সকল মুদ্গর তোমার মস্তকে পড়ুক, এই তরবারির আঘাতে তোমার হৃদয় সহস্রধা বিভক্ত হউক, তোমার দুঃখ কত বাড়িবে। দুঃখের আয়তন বাড়াও, প্রখরতা বাড়াও। দুঃখ প্রখর না হইলে, যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ না হইলে, কিছুই হইল না। দুঃখ বাড়িল না। ভারতের সকল যন্ত্রণা যদি তোমাকে বিদ্ধ না করিল, নরনারীর সকল কষ্টে যদি তোমার হৃদয় ছিন্ন না হইল, তবে তোমার দুঃখ বাড়িল কই? মানবের হৃদয়ে যত শেলবিদ্ধ হইতেছে, তাহা তোমার হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে, বিধাতার যত বিষদন্ত তোমাকে বিদ্ধ করিবে, জীবদুঃখের অসংখ্য ফণার অবিরত আঘাতে তোমার হৃদয় সহস্রধা বিচ্ছিন্ন হইয়া রক্তে প্লাবিত হইবে। তা হলে?—তা হলে আর কি? তা হলেও তোমার দুঃখ-পিপাসা মিটিবে না, দুঃখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে না। জীবনে যা কিছু সুখ থাকে, যতটুকু শান্তি থাকে, তাহাই অসহ্য হইয়া উঠিবে। ত্রিতলগৃহের সুশীতল সমীরণ ছাড়িয়া তুমি দুঃখের ভিখারী বেশে মাঠে মাঠে ছুটিবে। "দুঃখ দেও দুঃখ দেও" বলিয়া দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইবে। তোমার দুঃখের আয়তন, প্রখরতা খুব বাড়িবে, তবু তোমার দুঃখ-ক্ষুধা তৃপ্ত হইবে না। এ "দুষ্ট ক্ষুধা" নয়, চিত্তের প্রলাপ নয়, হৃদয়ের বিকার নয়। জীবনের মজ্জাগত উপকরণের জন্য তোমার হৃদয় অস্থির হইবে। তখন? তখন, আর কি হইবে? তুমি অশ্রুধারে হৃদয় প্লাবিত করিয়া কাঁদিবে,

"হায়! আমার দুঃখ কি এত কম! নর নারীর দুঃখ আমাকে বিদ্ধ করে না, জীব-যাতনার অসংখ্য ফণা কেন আমার হৃদয়কে সজোরে দংশন করে না? আমার হৃদয়ে যে এখনও শান্তি আছে, আমার চিত্তে যে এখনও সুখ আছে। শান্তির ছায়া, সুখের চিহ্ন কেন হৃদয় হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় না? কেন আমি জগৎপ্রাণ জগদ্‌হৃদয় হইয়া জীব জগতের সকল যন্ত্রণা অসীম প্রখরতার সহিত অনুভব করিতে পারি না?"

দুঃখের কি অপার মহিমা! দুঃখদাতার কি অচিন্ত্য অভিপ্রায়! তাই বলি, দুঃখ ছাড়িতে পারিবে না, দুঃখ ছাড়িও না। দুঃখে সুখের ভ্রম করিও না, অগ্রপশ্চাৎ, উৎপত্তি পরিণাম চিন্তা করিও না। দুঃখ জীবের মজ্জাগত, দুঃখ জীবনের উপকরণ; দুঃখ বাড়াইয়া—জীবন বাড়াও। দুঃখই সত্য, দুঃখের প্রখরতাই প্রকৃত বিজ্ঞান, দুঃখের বিস্তারই দর্শনের সার, দুঃখের পরিবর্দ্ধনই প্রকৃষ্ট ধর্ম্মসাধন।

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (২)

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শনের মতে, ব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান জগতের নিমিত্ত কারণ (Instrumental cause)। ইঁহাদের উভয়েরই মতে ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের আর একটী করিয়া উপাদান (Material cause) স্বীকৃত হইয়াছে। সেই উপাদান-কারণ ন্যায়মতে পরমাণু, এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতি। আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে এই উভয় প্রকার মতেরই বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি। আরও দেখিয়াছি যে, বেদান্ত দর্শন একটু বিভিন্ন-ভাবে সৃষ্টি-তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন; ইহার প্রণালী একটু স্বতন্ত্র। বেদান্তদর্শন একমাত্র ব্রহ্মকেই প্রকৃত প্রস্তাবে নিখিল-জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই মতেরই একটু বিশেষ বিবরণ ও দোষ গুণ বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আমরা অগ্রসর হইতেছি। বেদান্ত পরিভাষায় লিখিত আছে:—

"নিখিল জগদুপাদানত্বং ব্রহ্মণো লক্ষণং।
উপাদানত্বঞ্চ জগদধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং,
জগদাকারেণ পরিণমমান মায়াধিষ্ঠানত্বং বা"।

বেদান্তদর্শনের জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে কিরূপ মত, তাহা এই কারিকাটী বুঝিতে পারিলেই উত্তম পরিস্ফুট হইবে। ব্রহ্ম এই নিখিল জগতের উপাদান। উপাদান কাহাকে বলে? এই জগৎ রূপ আরোপ বা অধ্যাস যাহাতে আরোপিত হয়, তাহাই জগতের উপাদান। আধার না থাকিলে, আরোপ সম্ভবে না। সুতরাং যে আধারে এই জগৎ অধ্যস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই উহার উপাদান। বেদান্তকার বলেন মায়াই * এই জগতের আধার; মায়াতেই এই জগৎ অধ্যস্ত আছে;—অর্থাৎ মায়াই পরিণত হইয়া নাম ও রূপে ব্যাকৃত বা প্রকাশিত হইয়া—এই জগদাকারে দেখা দিয়াছে। সুতরাং অনির্ব্বচনীয় মায়াই এই জগতের উপাদান। তাহা হইলেই এখন বুঝিতে হইবে যে, মায়াই যদি জগতের উপাদান-কারণ হইল, তবে আর ব্রহ্মকে কেমন করিয়া উপাদান কারণ বলা যায়? কিন্তু এ-স্থলে একটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। মায়াই বাস্তবিক পক্ষে জগতের উপাদান; কিন্তু মায়া ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ হইলে পর নিবৃত্ত হয়, সুতরাং মায়াও মিথ্যা পদার্থ। সুতরাং মায়াও ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই জন্যই, মায়া জগতের উপাদান কারণ হইলেও ব্রহ্মই বাস্তবিকপক্ষে জগতের প্রকৃত উপাদান কারণ হইয়া পড়িতেছেন।

কিন্তু এস্থলে একটী বিষয় একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা

---

* বেদান্ত-মতে অজ্ঞানকেই মায়া বা অবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বেদান্তের মায়া এবং সাংখ্যের প্রকৃতি বা প্রধান একই কথা। এই অজ্ঞান সদসদাত্মক ও অনির্ব্বচনীয়। ইহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার কোন উপায় নাই। এই মায়াই জ্ঞানকে আবরণ করে। সাংখ্যে প্রকৃতির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, বেদান্তে মায়ার পৃথক্ অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই। মায়া ও ব্রহ্ম যে এক, তাহা বেদান্তে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। ব্রহ্ম চৈতন্যে মায়া আছে বলিয়া বা মায়া ব্রহ্মেরই স্বভাব বা অংশ বলিয়া এই জগৎ ব্রহ্ম-চৈতন্যেই প্রতিভাত।

দেখিয়া আসিলাম যে, ব্রহ্ম এবং তৎ-শক্তি মায়া উভয়ই জগতের উপাদান কারণ। কিন্তু উপাদানই জগৎরূপে প্রকাশিত হয় বা দেখা দেয়। উপাদান পরিণত হইয়াই কার্য্য জন্মিয়া থাকে। তাহা হইলেই ভাবিয়া দেখ যে, অপরিণাম-স্বভাব ব্রহ্মও "পরিণামী" হইয়া পড়িতেছেন ;—কেননা, ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু অপরিণামী ও অবিকারী পূর্ণ-ব্রহ্মের পরিণাম কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই জন্যই বেদান্ত-দর্শনে,পরিণাম ও বিবর্ত্ত,এই দুইভাগে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। উপাদান পরিণত হইয়া কার্য্যোৎপত্তি হয় এবং উপাদান বিবর্ত্তিত হইয়া কার্য্যোৎপত্তি হয়। আমরা দেখিয়াছি, মায়া ও ব্রহ্ম উভয়ই এ জগতের উপাদান। এখন বুঝিয়া দেখ, মায়াই পরিণত হইয়া এই জগদাকারে আবির্ভূত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মও বিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। অর্থাৎ মায়ারই পরিণাম হয়, কিন্তু তাহার বিবর্ত্ত হয় না। ব্রহ্মের পরিণাম হয় না, বিবর্ত্ত হয় মাত্র। মায়ারূপ উপাদানসম্বন্ধে জগতের পরিণতি এবং ব্রহ্মরূপ উপাদান-সম্বন্ধে জগতের বিবর্ত্তন স্বীকৃত হইয়াছে। এ কথাটী ভাল করিয়া না বুঝিলে, বেদান্তের প্রকৃত মত কি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না ;—সেইজন্য আমরা একটু বিশেষ ভাবে বলিতেছি। "পরিণামো নাম—বস্তুনঃ স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য স্বরূপান্তরাপত্তিঃ" এবং "বিবর্ত্তোনাম—স্বস্বরূপাপরিত্যাগেন স্বরূপান্তরাপত্তিঃ"(বে,সার।—সুবোধিনী টীকা)। বস্তু স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া, অন্যরূপ ধারণ করিলে "পরিণাম" বলে। যেমন দুগ্ধ নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া দধ্যাকারে পরিণত হয়। পরিণত-কার্য্যে,কারণের স্বরূপের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। কিন্তু "বিবর্ত্ত" ইহা হইতে বিভিন্ন। স্বরূপ স্বত্বেও, যে বস্তু অন্য একটী মিথ্যা রূপ ধারণ করে, তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়। যেমন মনে কর, তোমার সম্মুখবর্ত্তী রজ্জুতে হঠাৎ সর্প ভ্রম উপস্থিত হইল। হঠাৎ তুমি রজ্জুটীকে সর্প বলিয়া মনে করিলে। এস্থলে প্রকৃত-রজ্জুতে একটী মিথ্যা-সর্প-জ্ঞান হইতেছে। কিন্তু এ স্থলে রজ্জু নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ করে নাই। রজ্জুর নিজের স্বরূপের বাস্তবিক কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না,কেবল উহাতে একটী মিথ্যাভূত বস্তুন্তরের প্রতীতি জন্মিল মাত্র। এখন জগৎ-সৃষ্টি-সম্বন্ধেও এই কথা। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মায়াই পরিণত হইয়া জগৎরূপে প্রব্যক্ত হইয়াছে ;—অর্থাৎ মায়া স্বরূপ পরিত্যাগ করতঃ অন্যরূপে অর্থাৎ সৃষ্ট-পদার্থ-সমূহরূপে দেখা দিয়াছে। আবার ব্রহ্মও বিবর্ত্তিত হইয়াছেন ;—অর্থাৎ ব্রহ্মের নিজের স্বরূপ ভূত চৈতন্য ঠিকই আছে, কেবল সেই চৈতন্যে একটা মিথ্যা পদার্থের—এই জগৎ-টার—ভ্রম-প্রতীতি হইতেছে মাত্র। তাহা হইলেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিতা মায়াই জগদাকারে পরিণত হওয়াতে, চৈতন্যে এই জগতের অধ্যাস হয় মাত্র। অতএব এরূপে, ব্রহ্মে পরিণাম-দোষ আসিতে পারিল না। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই বাস্তবিক জগতের উপাদান কারণ। আবার সেই ব্রহ্মই, অবিদ্যা বা মায়াকে জগদাকারে পরিণত করাইবার "কর্ত্তা"। ব্রহ্মই, সেই উপাদানে ভূত মায়া বিষয়ক-প্রত্যক্ষ জ্ঞান, চিকীর্ষা ও যত্ন প্রভৃতি দ্বারা (এই প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যা দেখ) এই জগতের কর্ত্তা হইয়া পড়িতেছেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাই-

তেছে যে, ব্রহ্মই এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয়ই।

আমরা দেখিয়াছি, ন্যায়-প্রণেতা ও সাংখ্যকার উভয়ই ব্রহ্মকে জগতের কেবল অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বেদান্তকার বলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (বেদান্তদর্শন, ২।২।৩৭) নামক সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কতকগুলি দোষের অবতারণা করিয়াছেন। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ তিনি যুক্তিবলে দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিতেই হইবে।

আমরা উপরে যাহা দেখিয়া আসিলাম, তদ্দ্বারা মীমাংসিত হইল যে, মৃত্তিকা সুবর্ণাদি যেরূপ ঘটকুণ্ডলাদির উৎপত্তির কারণ, ব্রহ্মও সেইরূপ এই জগতের উৎপত্তির কারণ। কিন্তু এরূপ মীমাংসার বিরুদ্ধেও অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। এখন আমরা সেই আপত্তিগুলির আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। প্রথমতঃ সেই প্রশ্ন বা আপত্তিগুলির পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিয়া, তৎপরে তাহাদের খণ্ডনার্থ উত্তর প্রদান করা যাইবে। সেই আপত্তিগুলি এই :—

(ক) দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিতান্ত মূঢ়-ব্যক্তিও বিনা প্রয়োজনে কোন কার্য্য করে না। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, কি অভিপ্রায়ে ও কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কার্য্য করিতেছে, লোকে তাহার আবশ্যকতার অনুভব করিয়া থাকে। ব্রহ্ম যে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি তাঁহার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই জগৎ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন? যাঁহার কোনও অভাব নাই, যিনি নিত্য পরিতৃপ্ত, তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? আর যদি বল যে, তিনি বিনা-উদ্দেশ্যে জগৎ-সৃষ্টি করিয়াছেন। তদুত্তরে আমি বলি যে, প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। উন্মত্ত ব্যক্তি বুদ্ধি-দোষে কখনও কখনও নিষ্প্রয়োজনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বর ত উন্মত্ত নহেন। তাঁহার বুদ্ধি-দোষও থাকিতে পারে না, কেন না, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না।

(খ) সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ বা অনন্ত সুখের ভাজন হইয়া জন্মিয়াছে। ইচ্ছামাত্র শত শত দাসদাসী সমস্ত অভাব পূরণে ব্যস্ত। আর কেহ বা মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালায়িত। ঈশ্বর যদি এরূপ বিষম-সৃষ্টির কারণ হন, তবে ত তিনি অতীব নির্দ্দয় ও পক্ষপাতী! কিন্তু নিত্য-শুদ্ধ নির্লিপ্ত পরমেশ্বর পক্ষপাত দোষদুষ্ট ও নির্ম্মম নির্দ্দয় হইবেন কেমন করিয়া? সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না।

(গ) কুম্ভকার প্রভৃতি 'কর্ত্তা' নানাবিধ সাধন লইয়াই ঘট পটাদির সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সূত্র প্রভৃতি অশেষ প্রকার সামগ্রী না থাকিলে, কুম্ভকারাদি কখনই ঘটাদি উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে, ব্রহ্মের সেরূপ কোন সাধন সামগ্রী থাকা অসম্ভব। কিন্তু বিনাসাধনে কেমন করিয়া নির্ম্মাণ ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে? অতএব ব্রহ্ম এ জগতের কারণ হইতে পারেন না।

(ঘ) ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম একমাত্র পদার্থ। সেই এক অদ্বিতীয় পদার্থ হইতে অনেকবিধ পদার্থ উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া? বস্তুর পূর্ব্বাবস্থার নাশ হইলেও বরং উৎপত্তি হওয়া

সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপের নাশ হওয়া কদাচ সম্ভব নহে। তবে কেমন করিয়া স্বরূপের উপমর্দ্দব্যতিরেকেও, একমাত্র ব্রহ্ম হইতে এই নানাবিধ ভূতগ্রামবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইল? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না।

(ঙ) ঈশ্বর সৃষ্টির পরই যাবতীয় পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছে—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, কে কোন্ দিন্ বুদ্ধি-পূর্ব্বক নিজেরই অহিত করে? কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের বন্ধনাগার নিজেই সৃষ্টি করিয়া, নিজেই তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে? যিনি অতি নির্ম্মল, তিনি কেন এই মলিন ও জন্মজরারোগাদি বিবিধ অনর্থপূর্ণ বন্ধনাগারস্বরূপ শরীরে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন? অতএব ব্রহ্ম, সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না।

(চ) সংসারে দ্বিবিধ পদার্থ রহিয়াছে। কতকগুলি ভোগ্যপদার্থ, অপরগুলি ভোক্তা। ভোক্তা শারীরী চেতন এবং ভোগ্য শব্দাদি বিষয় সমূহ। যদি বল যে, ব্রহ্মই সমস্ত পদার্থের উপাদান, তবে ভাবিয়া দেখ যে, তোমার মতে ভোক্তা ও ভোগ্য বলিয়া বিভাগ থাকিতে পরিতেছে না। পরম-কারণ ব্রহ্ম হইতে যদি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ অভিন্ন হয়, তবে ভোক্তা ভোগ্য হইয়া পড়েন এবং ভোগ্য ভোক্তা হইয়া পড়ে। উভয়বিধ পদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, কেন না সমস্তই ব্রহ্ম। সুতরাং সংসার হইতে এই প্রসিদ্ধ ভোক্তা ও ভোগ্য বিভাগ উঠিয়া যায়। অতএব ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিতে পার না।

(ছ) বেদান্ত সৎকার্য্যবাদী। এমতে, কার্য্য, উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহার কারণেই গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকে। তাহা হইলেই দেখ, যদি চেতন শুদ্ধ ও শব্দাদি নামরূপ হীন ব্রহ্ম,—এই অচেতন, অশুদ্ধ ও শব্দাদিবিশিষ্ট জগতের কারণ হন, তবে বেদান্ত অসৎ-কার্য্যবাদী হইয়া পড়িলেন। আরো দেখ;—প্রলয়কালে বা জগতের বিনাশ-সময়ে সমস্ত বস্তুই কারণে বিলীন হইবে। এই অশুদ্ধ, অচেতন জগৎ, উহার শুদ্ধ, চেতন কারণ স্বরূপ ব্রহ্মে বিলীন হইবে। তবেই দেখ, কার্য্যের দোষ, কারণে সংস্পৃষ্ট হইতেছে। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, বেদান্তমতেও, ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা যাইতে পারে না।

(জ) যে পদার্থ যাহার বিকার, সেই পদার্থে তাহার ধর্ম্ম বা গুণ থাকিবেই। দধিতে দুগ্ধের ধর্ম্ম থাকে। ঘটে মৃত্তিকার ধর্ম্ম থাকে।

তবেই দেখ, যদি ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বল, তবে জগতে চৈতন্য-ধর্ম্ম অবশ্যই থাকিত। প্রকৃতি হইতে বিকার বিসদৃশ বা বিলক্ষণ হইতে পারে না। বিকারে, উপাদানের সদৃশ-ধর্ম্ম থাকাই নিয়ম। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যদি নিত্যশুদ্ধ চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ বা উপাদান হন, তবে এই জগৎরূপ বিকার অনিত্য অশুদ্ধ ও অচেতন হইল কেমন করিয়া? অতএব, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না।

আমরা প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে, অতি সংক্ষেপে প্রধানতঃ এই আটটী আপত্তির উল্লেখ-করিলাম। বারান্তরে এই আপত্তি কয়েকটীর উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

নিরাকারের সাকার রূপ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

এই সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেকেরই অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন, সৃষ্টি একটা ঘটনা বিশেষ, কোনও বিশেষ সময়ে ঈশ্বর সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করেন, বা সম্পাদনে নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কেবল মাত্র ঈশ্বরই ছিলেন।

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ, সদেব-সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।

সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়ঃ।

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে সৌম্য, কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্ম বিহীন মহান্ আত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য, ও অভয়। তিনি বিশ্ব সৃজন বিষয়ে আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

ব্যবহারিক ভাষায় বলিতে গেলে এক হইতে—অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ, অজ, অমর, নিত্য পরব্রহ্ম হইতে,—এই বহুর উৎপত্তি; সেই একেরই বিকাশে বা অভিব্যক্তিতে এই বিচিত্র জগতের জন্ম হইয়াছে, এই রূপই বলিতে হয়। কিন্তু এই ভাষায় সৃষ্টিকে যেরূপ একটা বিশেষ কালে সংঘটিত একটা বিশেষ ঘটনা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সত্য বর্ণনা নহে। ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ—অগ্রে ছিল না পরে হইয়াছে,—ইহাতেই সৃষ্টি কার্য্যকে কালাধীন করা হইল। ইহাকে একটা ঘটনা বা একটা কার্য্য বলিয়া ধরা হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি একটা ঘটনা বা কার্য্য নহে, কিন্তু একটা প্রণালী; একটা event in time নহে, কিন্তু a process through eternity. এই সৃষ্টির আদি নাই, অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহার অন্তও নাই, অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে। স্রষ্টা যেমন অনাদি অনন্ত, সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি অনন্ত। সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ, সৃষ্ট জীবের জন্ম ও মৃত্যু আছে বটে;—কিন্তু সৃষ্টি বলিতে এস্থলে জীব বা বস্তু নহে, কিন্তু অব্যক্তের অভিব্যক্তিই বুঝাইতেছে। এই অভিব্যক্তি অনাদি অনন্ত।

কারণ, এই অভিব্যক্তি চৈতন্যেরই মৌলিক লক্ষণ। অভিব্যক্তিতেই চৈতন্যের উৎপত্তি, অভিব্যক্তিতেই চৈতন্যের স্থিতি, অভিব্যক্তিতেই চৈতন্যের বিকাশ। অভিব্যক্তি চৈতন্যের সার্ব্বভৌমিক উপাধি। জ্ঞান মাত্রেই অভিব্যক্তিপরায়ণ। অভিব্যক্তি আত্মজ্ঞানের অপরিহার্য্য প্রণালী। অভিব্যক্তি বলিতেই জ্ঞান বুঝায়, আর জ্ঞান বলিতেই অভিব্যক্তি বুঝায়।

কথাটা একটু পরিষ্কার করা যাউক।

---

* ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ—ইত্যাদি শ্রুতির প্রকৃত উদ্দেশ্যও সৃষ্টিকে বিশেষ কালেতে আবদ্ধ করা নহে। ফলতঃ ইদং এস্থলে সৃষ্টিকে নহে, কেবল এই দৃশ্যমান জগৎকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এবং এই দৃশ্যমান জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইয়াছে, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু সাধারণ লোকে এই শ্রুতি সাধারণ সৃষ্টি তত্ত্ব, অর্থাৎ অনন্ত চৈতন্যের অভিব্যক্তিই বুঝাইতেছে, মনে করেন। এই ভ্রম নিরসনার্থেই এস্থলে উদ্ধৃত শ্রুতির প্রকৃত অর্থ না ধরিয়া লৌকিক অর্থ ধরা হইয়াছে।

জ্ঞান বলিতে দুটী বস্তু ও এই দুয়ের একটা সম্বন্ধ বুঝায়। আর এই সম্বন্ধ স্থাপনেই চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। চৈতন্য আপনাকে আপনা হইতে পৃথক্ না করিয়া, কোনও ক্রমেই জ্ঞানের এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। আমি শ্যামকে জানিতেছি। এখানে আমি জ্ঞাতা, শ্যাম জ্ঞেয়। কিন্তু আমি যখনই শ্যামকে জানিতেছি, তখনই তার সঙ্গে সঙ্গে, আবার আমার আপনাকেও শ্যামের জ্ঞাতারূপে জানিতেছি। অর্থাৎ এই জ্ঞানক্রিয়ার মূলেই আমি আমার সার্ব্বভৌমিক আমিত্ব হইতে শ্যামের জ্ঞাতারূপ বিশেষ আমিত্বকে পৃথক্ করিতেছি। এই পৃথগকরণের দ্বারাই, আমার সার্ব্বভৌমিক আমিত্বের ভূমিতে, জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় শ্যামের যোগ স্থাপিত হইয়া, শ্যামকে জানারূপ জ্ঞানক্রিয়া সম্ভাবিত হইতেছে। আমার একত্বকে এইরূপে বিভিন্ন করিয়া, তাহার মৌলিক যোগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে, অর্থাৎ আমার আমিত্বের বা চৈতন্যের এইরূপ অভিব্যক্তি ব্যতীত, আমার পক্ষে শ্যামের জ্ঞান বা কোনও কিছুরই জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। প্রত্যেক জ্ঞান ক্রিয়াতেই the Self separates itself from itself to return to itself to be itself ইহাই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল সত্য।

অভিব্যক্তি জ্ঞানের নিত্যসঙ্গী, চৈতন্যের নিত্য উপাধি। জ্ঞানম্ ছিলেন, চৈতন্য ছিলেন, অথচ তাঁহার অভিব্যক্তি ছিল না, ইহা স্ববিরোধী কথা। ইহার অর্থ এই হয় যে, জ্ঞানময় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল না; চৈতন্য ছিলেন, কিন্তু সে চৈতন্যের চেতনা হয় নাই। অতএব সৃষ্টি কালাধীন ঘটনা নহে—অগ্রে হয় নাই, পরে হইয়াছে, এরূপ নহে—কিন্তু ইহা জ্ঞানেরই প্রকৃতি। জ্ঞানম্ যেমন কালাতীত সত্য, সৃষ্টিও সেইরূপ কালাতীত প্রণালী। ইহা জ্ঞানের নিত্য ধর্ম্ম, অনাদি জ্ঞানের অনাদি সহচর। এই সৃষ্টি বা অভিব্যক্তিই, বোধ হয়, হিন্দুর অপর-ব্রহ্ম, এবং খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের বাণী—The Word. পরব্রহ্ম, অব্যক্ত, নির্গুণ, নিরুপাধিক ব্রহ্ম, যেমন অনাদি অনন্ত, এই অপর-ব্রহ্মও সেইরূপ অনাদি অনন্ত। অনাদি আদিতে পরব্রহ্মেরই সঙ্গে একাঙ্গ হইয়া অপর-ব্রহ্ম ছিলেন, অপরব্রহ্মই পরব্রহ্ম;—In the beginning there was the Word, the Word was with God, the Word was God.

এই অভিব্যক্তি-তত্ত্বই অপর-ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিযাও উভয়ের মৌলিক একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে; এই অভিব্যক্তিতত্ত্বই সসীমকে অসীম হইতে ভিন্ন করিয়াও উভয়ের অবিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠা করে; এই অভিব্যক্তি-তত্ত্বই সৃষ্টিকে স্রষ্টা হইতে, বিশ্বকে বিশ্ব-বিধাতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়াও আবার যুগপৎ উভয়ের যুগল মিলন সম্পাদন করিয়া দেয়; এই স্থানেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য; ইহা হইতেই সাকারবাদ ও নিরাকারবাদের বিবাদ নিষ্পত্তি; এই অভিব্যক্তি-তত্ত্বের উন্নত ভূমিতেই অমূর্ত্ত পুরুষ বিরাট-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিশ্বরূপাত্মকরূপে মানবের পূজা গ্রহণ করেন।

আত্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞানের জন্য অখণ্ড চৈতন্যের আত্মবিভাগের দ্বারা বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধ স্থাপনই সৃষ্টি; এবং তাহা হইলে এই বিশ্বকে অব্যক্ত চৈতন্যেরই ব্যক্তরূপ—নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি—ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? প্রত্যেক জ্ঞান ক্রিয়াতেই সার্ব্বভৌমিকের সঙ্গে পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধ ও যোগ স্থাপিত হয়। All knowledge,

all self-knowledge, is the realisation, by the Universal, of itself, through the particular. পরিচ্ছিন্ন সত্তাকে পরিহার করিয়া সার্ব্বভৌমিক সত্তার আত্মজ্ঞান জন্মে না, জন্মিতে পারে না; এবং এই পরিচ্ছিন্ন সত্তাও সার্ব্বভৌমিক সত্তারই অঙ্গ, সেই অখণ্ডনীয় সত্তারই খণ্ড, সেই সুদীপ্ত সর্ব্বব্যাপী পাবকেরই স্ফুলিঙ্গ। কারণ, যে পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়া সার্ব্বভৌমিক সত্তা আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাহা যদি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়, তাহা যদি তাঁহারই অঙ্গ, অংশ, তাঁহারই রূপান্তর, তাঁহারই আত্মবস্তু না হয়, তবে, যাহার মধ্য দিয়া তিনি আপনার সার্ব্বভৌমিকত্ব উপলব্ধি করিবেন, তাহারই দ্বারা সেই সার্ব্বভৌমিকত্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মের আত্ম জ্ঞানের এই বিষয়ই অনাদিসম্ভব, মায়া নামক জগদ্বীজ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তের আত্মজ্ঞান কেবল এক প্রণালীতেই সম্ভব। আত্মোপলব্ধির জন্য অনন্তের আপনাকে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া, বিষয় রূপে—সান্তরূপে—আপনার নিকটে উপস্থিত হওয়া ভিন্ন আত্ম জ্ঞানের আর পন্থা নাই। অনন্ত আপনিই বিষয় সাজিয়া, আপনিই বিষয়ী হইয়া, আপনাকে আপনি জানিতেছেন। এইটী অস্বীকার করিলে হয় ঈশ্বরের অনন্ততা, না হয় তাঁহার চৈতন্য, দুয়ের একটী স্বরূপকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ব্রহ্মকে অনন্ত চৈতন্য বলিলেই ব্রহ্মাণ্ডকে সেই নিরাকারের সাকার মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে।

অতএব এই বিপুল বিশ্ব আর কিছুই নহে, কেবল সেই নিত্য-অব্যক্ত চৈতন্যেরই নিত্য ব্যক্ত আকার; কেবল সেই চিরবিদেহী পুরুষেরই চিরবিরাটমূর্ত্তি। যাহাকে জড় বলি এবং যাহাকে চেতন বলি, তাহা সকলই সেই অনন্ত চৈতন্যের প্রকাশে, সেই অনন্ত চৈতন্যেরই প্রয়োজনে, সেই অনন্ত চৈতন্য দ্বারা, সেই অনন্ত চৈতন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

> এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
> খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী॥

এই পুরুষ হইতেই প্রাণ, মন, সমুদায় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, আলোক, জল, এবং সমুদায়ের আধারভূত পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

> তদেতৎ সত্যম—
> যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
> সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
> তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
> প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥

'ইহা সত্য যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি হে সৌম্য, অক্ষয় পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয়। জড় এবং চেতন;—চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, বৃক্ষলতা, নদীসরিৎ, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, মনুষ্য,—সকলেই সেই অক্ষয় পুরুষের—সেই অনন্ত চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি। এই বিপুল বিশ্ব অনন্ত নিরাকার চৈতন্যেরই সাকার মূর্ত্তি। এই বিশ্বরূপ—

> অনেক বক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনং
> অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং॥
> দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং
> সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখং॥

এই অদ্ভুত আকৃতিতে অসংখ্য মুখ, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য দিব্য আভরণ, অসংখ্য উদ্যত অস্ত্র শস্ত্র আছে; ইহা দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্র দ্বারা শোভিত, এবং দিব্য গন্ধ দ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত; এই মূর্ত্তি সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, জ্যোতিঃপূর্ণ, অনন্ত,

এবং বিশ্বের মুখস্বরূপ। এই বিরাট মূর্ত্তি যেমন আপনার নিকটে জ্ঞেয় বিষয় রূপে বিদ্যমান, সেইরূপ, তোমার আমার নিকটস্থ বিষয় রূপে উপস্থিত রহিয়া, প্রতিনিয়ত সসীমের আত্মজ্ঞান ও তাহার ভিত্তি রূপে, অসীমের আত্ম চৈতন্য প্রকটিত করিতেছেন। জড়ে চেতনে ঈশ্বর আছেন, কেবল তাহা নহে; কিন্তু ঐ জড় ও এই চেতন--সকলই ঈশ্বর। তোমাতে এবং আমাতে বদ্ধ থাকেন নহে,— এই থাকেন, এ যে স্বাতন্ত্র্য বুঝায়, তাঁহার ও তোমার আমার মধ্যে সে স্বাতন্ত্র্য নাই। তিনি মহতো মহীয়ান্, আকাশ রূপে সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি অণোরণীয়ান্ ক্ষুদ্রতম পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম আকারে সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। জড় শক্তির প্রত্যেক কার্য্যে এক তিনিই ক্রিয়াশীল; প্রাণ শক্তির প্রত্যেক প্রাণনে এক তিনিই সঞ্জীবিত; চৈতন্যের প্রত্যেক জ্ঞানে এক তিনিই আপনাকে আপনি জানিতেছেন। আমাদিগের প্রত্যেক দৃষ্টিতে তিনিই দর্শন করেন; আমাদিগের প্রত্যেক শ্রুতিতে তিনিই শ্রবণ করেন; প্রত্যেক আঘ্রাণে তিনিই ঘ্রাণ প্রাপ্ত হন, এবং প্রত্যেক আস্বাদনে তিনিই রস গ্রহণ করেন। আমাদিগের এই দেহ যন্ত্রের দ্বারা তিনিই তাঁহার বিষয় বনে বিচরণ করেন; আমাদিগের মনের মধ্য দিয়া তিনিই তাঁহার চিন্তারাজ্যে ক্রীড়া করেন; আমাদিগের হৃদয়ের দ্বারা তিনিই তাঁহার ভাবনিকুঞ্জে বিহার করেন; আর এই সকল ব্যাপারের মধ্য দিয়া তাঁহারই আত্মক্রীড়া, আত্মরমণ, আত্মবিহার হইতে উৎপন্ন তাঁহারই আনন্দ রস উথলিত হইয়া তোমাকে আমাকে আসিয়া প্রতিনিয়ত আপ্লুত করিতেছে। পরমেশ্বর তোমার আমার দাঁড়াইবার জন্য ত্রিভুবনে তিলার্দ্ধ স্থানও রাখেন নাই। সকল কাল ও সকল দেশ তিনিই তাঁহার এই বিরাটমূর্ত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। তোমার আমার আমিত্বের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করি, এই জন্য সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও তাঁহার এই বিপুল বিশ্বে তিনি তোমাকে বা আমাকে প্রদান করেন নহে। বিচিত্র এই বিশ্ব রঙ্গভূমিতে তিনিই একাকী রঙ্গ করিতেছেন।

"আপনি নাচেন, আপনি গায়েন, আপনি বাজান তালে তালে, মানুষ তো সাক্ষিগোপাল, কেবল আমার আমার বলে॥"

এই 'আমার "আমার"ও আবার তিনিই বলান। তিনি না বলাইলে কি আমি কখনও এই "আমার আমারই" বলিতে পারিতাম? আত্ম প্রকৃতিনিহিত যে অপরিহার্য্য প্রয়োজন অনুরোধে পরমাত্মার আত্মচৈতন্যের অভিব্যক্তিতে এই বিপুল বিশ্বের উৎপত্তি, সেই প্রয়োজন অনুরোধেই মানবের এই আমিত্ব বোধেরও সৃষ্টি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চৈতন্যের অভিব্যক্তির অর্থই এই যে, আত্মোপলব্ধির জন্য অনন্ত চৈতন্য আপনি আপনা হইতে পৃথক্ হইয়া পুনরায় আপনাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কোনও বৃত্তাকার বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরিধিস্থ কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পরিধি অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিলে যেমন যুগপৎ সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দূরে, ও তাহার নিকটেই যাওয়া হয়, সেইরূপ চৈতন্যের অভিব্যক্তিতেও সৃষ্টি যুগপৎ অনন্ত হইতে দূরে গমন করে ও অনন্তের নিকটবর্ত্তী হয়। এই অবিভাজ্য প্রণালীকে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মনে মনে ভাগ করিয়া লইলে, দুইটী স্রোতের সঙ্গে অতি সুন্দররূপে তুলনা

করিতে পারা যাইতেছে; যদি একটী স্রোতে চৈতন্যের অবতরণ হইলেও, উহার বিকাশ ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি; অপরটীতে চৈতন্যের অধিরোহণে জীবের উৎপত্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, সৌন্দর্য্যচর্চ্চা প্রভৃতির স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। মানবে এই উভয় স্রোতের মিলন হইয়াছে। মানবেই অবতরণ স্রোতের শেষ ও অধিরোহণ স্রোতের পরিস্ফূর্ত্তি। আবার মানবেই চৈতন্য হইতে চৈতন্যের পরিচ্ছিন্নতা পূর্ণ হইয়াছে—the separation of the self from itself is complete. এই জন্যই জীবের স্বাধীনতা, এই জন্যই জীবের এই আমিত্ব বোধ, এই জন্যই জীবের এই দ্বৈত ভাব। তবে ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল এই যে মানবে অনন্ত চৈতন্য, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া, সেই পৃথগ্‌করণের দ্বারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মোপলব্ধি লাভ করিতেছেন।

আমরা দেখিয়াছি, এই আত্মোপলব্ধিই সৃষ্টির নিগূঢ় প্রয়োজন,—আত্মোপলব্ধির জন্য পরমাত্মার আত্মবিভাগের দ্বারা বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধ স্থাপনই সৃষ্টি। কিন্তু কেবল অনাত্মবিষয়ের বিষয়ীরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেই আত্মবস্তুর সম্যক্ ও সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধি হয় না, হইতে পারে না। অচেতন পদার্থের জ্ঞানে আমাদের যতটুকু আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট হয়,চেতন পদার্থের জ্ঞানে তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই অসাড় জড় রাজ্যে যদি তুমি বা আমি কেবল একমাত্র প্রাণীই বিদ্যমান থাকিতাম, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, সে অবস্থায় আমাদিগের কতটুকুই বা জ্ঞানলাভ সম্ভব হইত? জড় এবং আত্মার যে বিশাল বিভিন্নতা, যে বিভিন্নতা দ্বারা, যে বিভিন্নতার পরিমাণ অনুসারে, আত্মজ্ঞানের উজ্জ্বলতার পরিমাপ হইয়া থাকে, সে অবস্থায়, সেই বিভিন্নতার জ্ঞানও পরিস্ফুট হইত কি না বিশেষ সন্দেহের কথা। তখন পশুর যতটুকু আত্মজ্ঞান আছে,তোমার বা আমারও সম্ভবতঃ ততটুকুই আত্মজ্ঞান থাকিত। অতএব কেবল জড়ের বিষয়ীরূপে আপনাকে জানিলে, চৈতন্যের যতটা আত্মোপলব্ধি হয়, জীবের বিষয়ীরূপে আপনাকে জানিলে, তদপেক্ষা অধিক আত্মোপলব্ধি হইয়া থাকে, আবার চৈতন্যের—আত্মার—আপনারই বিষয়রূপে আপনাকে জানিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মোপলব্ধি হয়। এই চৈতন্যের রাজ্যে মানব সমাজেও, অজ্ঞ, অসভ্য, পশুপ্রায় মানবের বিষয়ী বা জ্ঞাতা রূপে আমাদের যতটা আত্মোপলব্ধি হয়, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক মহাপুরুষদিগের জ্ঞানে—অর্থাৎ সাধুসঙ্গে—তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আত্মোপলব্ধি হইয়া থাকে। কারণ এই উপায়েই আমরা আমাদিগের আত্মনিহিত অব্যক্ত চৈতন্যের ব্যক্ত আকার দেখিতে সমর্থ হই। বিষয়ের অভিব্যক্তির উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠতা দ্বারা বিষয়ী আত্মার আত্মোপলব্ধির গভীরতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ বিষয়ের মধ্যে, বিষয়রূপে, চৈতন্য যতটা আত্ম প্রকাশ করেন, বিষয়ীরূপে তাঁহার তত আত্মোপলব্ধি হইয়া থাকে। অনন্ত চৈতন্যের যে আত্মোপলব্ধির সূচনার জন্য জড়ের উৎপত্তি, সেই আত্মোপলব্ধির প্রয়োজনানুরোধে, সেই আত্মোপলব্ধির পূর্ণতার জন্যই, আধ্যাত্মিক জীব, মানবের সৃষ্টি। দর্পণের উপরে আপনার প্রতিকৃতি নিক্ষেপ করিয়া যেমন মানুষ আপনার আকৃতির জ্ঞান লাভ করে, আপনার মুখচ্ছবি বা দেহগঠন উপলব্ধি করে,—সেইরূপ অনন্ত চৈতন্য মানব আত্মাতে আপ-

নাকে প্রতিফলিত করিয়া, আপনার প্রকৃতি সন্দর্শন করিয়া থাকেন। অথবা অভিব্যক্তির ভাষায় বলিতে গেলে, অনন্ত চৈতন্য আপনাকে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া, পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য মানবরূপে, আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের, এই মানবের মধ্যে সত্য সত্যই,

> স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার—
> অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা,
> ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা।
> আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে,
> এ দর্পণের আগে নব নব রূপ ভাসে।
> দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী,
> আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি।
> বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়,
> রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়।

বৈষ্ণব কবির এই উক্তিকে কাব্য বলিব, না দর্শন কহিব; সঙ্গীত বোধে সম্ভোগ করিব, না বিজ্ঞান জ্ঞানে বিচার করিব, ভাবিয়া পাই না। চৈতন্য-চরিতামৃতকার, এই কয়টী কথাতে অতি মধুর অথচ পরিষ্কার রূপে, চৈতন্যের অভিব্যক্তির মূল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন।

আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে—অনন্ত চৈতন্যের এই কথাই তো শোভা পায়! অনন্তের আবার বৃদ্ধি কি? কিন্তু বৃদ্ধি যে নাই, তাহা উপলব্ধি হইবে কি রূপে?—সৃষ্টিতে, অভিব্যক্তিতে, বা reproduction-এই কেবল এই উপলব্ধি সম্ভব। অনন্তের মধ্যে যে অনন্ত মাধুর্য্যের বিকাশের অবকাশ নাই, যখন সেই অনন্ত মাধুর্য্যই অভিব্যক্তির প্রণালী অনুযায়ী, প্রকৃতি অঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল; প্রকৃতিতে যখন সেই মাধুরী নব নব রূপে ভাসিতে আরম্ভ করিল, তখন প্রকৃতিরূপ দর্পণে আপনার এই নব নব মাধুরী দর্শন করিয়া, অনন্তের সা[illegible] হইয়া, জীব হইয়া, মানব হইয়া যে সে মাধুরী [illegible]াদন করিতে সাধ যাইবে, ইহাই বা আর আশ্চর্য্য [illegible]?

আর এই সাধ হইতেই চৈতন্যের অবতরণ বা অবতারের প্রয়োজন। এক অর্থে অনাদি সৃষ্টির আদি হইতেই অনন্ত চৈতন্যের অবতার হইতেছে। ইথরে, জড়ে, উদ্ভিদে, কীটাণুতে, পশুপক্ষীতে তিনিই অবতীর্ণ হইতেছেন;—এ সকলই সেই অনন্ত চৈতন্যের অবতার; সেই নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি। কিন্তু যে অর্থে ইথর, জড় বা ইতর প্রাণীকে চৈতন্যের অবতার বলা যায়, তদপেক্ষা উন্নততর ও গভীরতর অর্থে মানবকে অনন্তের অবতার বলা হয়। ইথরে, জড়ে, ও ইতরপ্রাণীতে চৈতন্য যেন আত্মহারা, চৈতন্য যেন আত্মবিস্মৃত, আপনার প্রকৃত স্বরূপ—আপনার মূল প্রকৃতি—হইতে ভ্রষ্ট। মানবে কিন্তু সেই আত্মজ্ঞান স্ফূরিত, সেই পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত। মানবে, জীবে, ব্রহ্ম আপনাকে আপনি চিনিয়া আপনার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন; এবং আপনি আপনার সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া নরলীলা বা প্রেমলীলাতে রত হইয়াছেন। সাধারণ ভাবে সমগ্র সৃষ্টি ব্রহ্মের অবতার হইলেও, জীব, মানব, বিশেষ ভাবে তাঁহার অবতার। আবার সেইরূপ সাধারণ ভাবে সমুদায় জীব, মানব মাত্রেই, ব্রহ্মের অবতার হইলেও বিশেষ বিশেষ মানব—বিশেষ বিশেষ সাধুসজ্জন—বিশেষ ভাবে ব্রহ্মের অবতার। জড়ে ও ইতর প্রাণীতে চৈতন্য আত্মহারা ও আত্মবিস্মৃত; কিন্তু মানব মাত্রেই কি চৈতন্য আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হয়, না হইয়াছে? এ জগতে কত কোটী কোটী নরনারী রহিয়াছে যাহারা পশুত্বের ভূমিতে এখ-

নও বিচরণ করিতেছে; যাহাদিগেব মানবত্ব প্রধূমিত হইলেও, প্রজ্জলিত হইয়া উঠে নাই ; যাহাদিগেব মধ্যে চৈতন্যের স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশিত হয় হয় করিয়াও এখনও প্রকাশিত হইবাব অবসব পায় নাই। অপেক্ষাকৃত সভ্য,জ্ঞানী ধর্ম্মসাধনশীল লোকেব মধ্যেই কি চৈতন্য আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? তোমাব আমাব মধ্যেই কি চৈতন্যেব লক্ষণ সুন্দবরূপে প্রতিফলিত হইযাছে ? সাধাবণ মানবে—সকল জীবেই—চৈতন্যেব অবতবণ আবম্ভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিশেষ বিশেষ মানবে, জগতেব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগেব মধ্যে সে অবতবণ পবিস্ফুট ও পূর্ত্তির বলিয়া ইহাদিগকে মানব ইতিহাস ও মানব ভাষা বিশেষ ভাবে ও বিশেষ অর্থে অনন্ত চৈতন্যেব অবতাবরূপে গ্রহণ ও বর্ণনা করিয়াছে এই অবতাববাদকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পাবিনা, আব চৈতন্যেব শ্রেষ্ঠতব ও নিকৃষ্টতর অভিব্যক্তির প্রকৃত ভেদাভেদ অগ্রাহ্য কবিযা, তুমিও অবতাব, আমিও অবতাব বলিয়া, ইহাব গুরুত্ব লাঘব কবাও পাপ বলিযাই মনে হয়।

কিন্তু এই উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টেব তুলনা কবিবাব আমাব অধিকাব কি ? সকলই যখন ব্রহ্ম—সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ—তখন আবাব সৃষ্টি মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টেব ভেদ কোথায় ? অদ্বৈতবাদে পুরীষ ও চন্দনে প্রভেদ নাই—প্রভেদ থাকিতে পাবে না। এক প্রকাবেব প্রচলিত অদ্বৈতবাদে জগতে ভাল মন্দেব ভেদাভেদ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে অদ্বৈতবাদে অভিব্যক্তিব জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই ; তাহা অভিব্যক্তির অদ্বৈতবাদ নহে। অভিব্যক্তির প্রাণই এই সকল ভেদাভেদ—ভেদাভেদকে স্বীকার করিয়া, ভেদাভেদকে সত্য বলিয়া জানিয়া,—ভেদাভেদেব মধ্য দিয়া সে অক্ষয় অবিনাশী কিন্তু নিয়ত স্ফুটমান, একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়,—তাহাই অভিব্যক্তির অদ্বৈতবাদ। ফলতঃ ইহাকে অদ্বৈতবাদ না বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদই বলা বিধেয়। এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টেব ভেদ কদাপি নষ্ট হয় না। তাহাতে ব্রহ্ম সন্ধনায় হইলেও তাঁহার মধ্যে স্বগত ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে, কাবণ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট-বোধ চৈতন্যেব আত্ম-জ্ঞানেবই চিবসহচব, চৈতন্যেব স্ফুবণ যত হয, ততই যুগপৎ জগতেব মৌলিক ও সার্ব্বভৌমিক একত্বেব সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বিবযেব পবিচ্ছিন্নত্ব ও এই পবিচ্ছিন্নত্বেব সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদেব পবস্পবেব শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট ভেদেব জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

আমবা যতদূব জানি,মানুষ যতটা আজি পর্য্যন্ত বুঝিতে পাবিযাছে, তাহাতে মানবোপহিত চৈতন্যেই এই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট জ্ঞানেব প্রথম স্ফুবণ আবম্ভ হয়। ভাল ও মন্দ এ জ্ঞান ইতব প্রাণীব আছে বলিয়া পণ্ডিতেবা প্রায়ই স্বীকাব কবেন না। তাহাদের সুখ দুঃখেব অববোধ আছে সত্য, প্রিয় ও অপ্রিযেব জ্ঞান আছে সত্য, কিন্তু শ্রেয় ও প্রেয়েব মধ্যে যে বিভেদ, তাহাদেব জ্ঞান, নাই। অনন্ত চৈতন্যেব অভিব্যক্তি সোপানে সর্ব্ব প্রথম মানবেই শ্রেয় এবং প্রেযের বিভিন্নতাব বিশেব জ্ঞান দৃষ্ট হয। এই জ্ঞানেব উৎপত্তিব মৌলিক কাবণ এবং প্রয়োজনও নির্দ্দেশ করা নিতান্ত কঠিন নহে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে,জীবে বা মানবে চৈতন্য হইতে চৈতন্যেব পবিচ্ছিন্নতা পূর্ণ হইয়াছে—the separation of the Self from itself is complete কিন্তু এই পবিচ্ছিন্নতা ব্যবহারিক ভাষার, জড় জ্ঞানেব, পবিচ্ছিন্নতা নহে ;

কিন্তু অভিব্যক্তির বা তত্ত্বজ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা; ইহার মধ্যেই আবার একাঙ্গতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ইহার দ্বারাই সেই একাঙ্গতা যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কারণ যে বিভিন্নতায় একাঙ্গতা বিনষ্ট হয় না, বরং যে বিভিন্নতার সঙ্গে আত্ম প্রকৃতির মৌলিক একতার স্বাভাবিক বিরোধের মধ্যে এবং সেই বিরোধের দ্বারাই, সেই মৌলিক একতা সমধিক পরিস্ফুট, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উপলব্ধ হয়, তাহাকেই অভিব্যক্তির মৌলিক লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। অতএব অভিব্যক্তির প্রণালীতে সর্ব্বদা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানাধীন চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সার্ব্বভৌমিক চৈতন্যের প্রকাশিত ও স্ফুরিত হয়। পরিচ্ছিন্ন জীবোপহিত চৈতন্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই, তাহার মধ্যেই অনন্ত চৈতন্যও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। জীবের এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানই তাহার জীবন, তাহার ব্যক্তিত্ব,--তাহার reality; আর এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সঙ্গে যুগপৎ প্রকাশিত অনন্ত চৈতন্যই তাহার সার্ব্বভৌমিকত্ব, তাহার নীতি, তাহার ঈশ্বর—তাহার Ideality জীবের ব্যক্তিত্বই তাহার প্রেয়, তাহার সার্ব্বভৌমিকত্বই তাহার শ্রেয়; এবং শ্রেয়ের আলোকে প্রেয়কে, আদর্শের পরিমাপে বাস্তব জীবনকে পরীক্ষা করিতে যাইয়াই মানব শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের, ভাল মন্দের, পাপ পুণ্যের ভেদ করিয়া থাকে। এ ভেদ মিথ্যা নহে, ইহা অজ্ঞানতা-প্রসূত নহে, অলীক মায়া নহে, কিন্তু সত্য। এই প্রভেদ অভিব্যক্তির প্রণালীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত। এই প্রভেদ মানব-কল্পিত নহে, কিন্তু বিধাতা-প্রতিষ্ঠিত। এই প্রভেদই নীতি বা morals —এই প্রভেদ অতিক্রম করিবার জন্য মানবাত্মাতে যে আন্তরিক আগ্রহ, তাহাই ধর্ম্ম; এবং এই প্রভেদকে অতিক্রম করিয়া শ্রেয়কে প্রেয়েতে পরিণত করিবার জন্য যে চেষ্টা, তাহারই নাম সাধন।

অতএব যে অভিব্যক্তির প্রয়োজন অনুরোধে অনন্ত চৈতন্যের পরিচ্ছিন্ন আকার ধারণ, সেই অভিব্যক্তির প্রয়োজনেই এই পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব বা স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি, আবার সেই প্রয়োজনই মানবের এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যুগপৎ তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশে শ্রেয়প্রেয়ের—Ideal এবং Real এর—প্রভেদ জ্ঞানের উৎপত্তিতে নীতি এবং ধর্ম্মের সৃষ্টি। মানবের জড় দেহ যেমন অভিব্যক্তির নিয়মে, চৈতন্যের আত্ম-প্রয়োজনে, চৈতন্যেরই দ্বারা তিলে তিলে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ব্যক্তিত্ব যেমন সেই নিয়মে, সেই প্রয়োজনে, সেই চৈতন্যেরই দ্বারা তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ তাহার ধর্ম্মও সেই একই অলঙ্ঘ্য নিয়মে, এই একই অপরিহার্য্য প্রয়োজনে, সেই একই চৈতন্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবীয় ধর্ম্ম মাত্রেই বিধাতা-প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু, তাই বলিয়া, ইহার অর্থ এই নহে যে, জগতের প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহ সকলই সমান,—সকল ধর্ম্মই অভিব্যক্তি-সোপানের একই স্তরে, একই অবস্থায়, অবস্থিতি করিতেছে। বিভিন্নতা সম্পাদন, উচ্চ নীচের প্রভেদ উৎপাদন, অভিব্যক্তি প্রণালীরই মৌলিক লক্ষণ। ধর্ম্মের অভিব্যক্তিতে এ মৌলিক লক্ষণ লুপ্ত হইতে পারে না। নানা কারণে জগতের লোকে ধর্ম্মের মৌলিক একত্ব বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই সেই একত্বের কথা বারম্বার প্রচার করা প্রয়োজন হইয়াছে। প্রচলিত ধর্ম্মা-

বলম্বীগণ, অনেকেই, আপনাদের আচরিত ধর্ম্মকে একমাত্র পূর্ণ সত্য ধর্ম্মরূপে প্রচার করিতে যাইয়া। তত্ত্বজ্ঞানের মৌলিক, একত্ব কার্য্যতঃ অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করিতেছেন বলিয়াই জগতের সকল ধর্ম্মই সত্য, সকল ধর্ম্মই বিধাতা-প্রতিষ্ঠিত, এই মহা সত্য ঘোষণা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা জন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভেদ বিনাশ করা এ ঘোষণার অর্থও নহে, উদ্দেশ্যও নহে। চৈতন্যের স্ফূর্ত্তির যে তারতম্য নিবন্ধন সৃষ্টির সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট-ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই তারতম্য হইতেই ধর্ম্ম রাজ্যেও শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট ভেদ জন্মিয়াছে। যে যে ধর্ম্মে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি যত বেশী, সেই ধর্ম্ম তত শ্রেষ্ঠ। যে ধর্ম্মে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি যত অল্প, সেই ধর্ম্ম তত নিকৃষ্ট। অথবা আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে, যেখানে মানবের আত্মজ্ঞানের যত বেশী স্ফুরণ, সেই থানে তাহার ধর্ম্মও তত উন্নত, যেখানে আত্মজ্ঞানের যত অল্প স্ফুরণ, সেখানে তাহার ধর্ম্মও তত হীন। কারণ মানবের আত্মজ্ঞানের সমানুপাতে সর্ব্বত্রই তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। মানবের আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ সমানুপাতিক পরিস্ফূর্ত্তির একটা নিগূঢ় কারণও আছে। তাহাও চৈতন্যেরই অভিব্যক্তির প্রণালীর অন্তর্গত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মানবে, জীবে, ব্রহ্ম আপনাকে আপনি চিনিতে পারিয়া, আপনার রূপে আপনি মুগ্ধ হইয়া, আপনি আপনার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া নরলীলা বা প্রেমলীলাতে রত হয়েন। ব্রহ্মের অনন্ত চৈতন্যের আত্মোপলব্ধিই এই লীলার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন হইতেই জীব এবং ব্রহ্মের সমুদায় সম্বন্ধের সৃষ্টি। কিন্তু প্রেমিক যুগলের পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে, পরস্পরের আত্মোপলব্ধিতে ও আত্ম সম্ভোগেই প্রেমলীলার সার্থকতা। প্রকৃত প্রেমে প্রেমিকগণ, পরস্পরের সাহায্যে, পরস্পরের আত্মার শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ইহা প্রেমেরই ধর্ম্ম। এই প্রেম ধর্ম্মের বশীভূত হইয়াই, অনন্ত চৈতন্য যেমন মানবের মধ্যে, মানব রূপ দর্পণে আপনার মধুরিমা অবলোকন করিয়া, তাহা আস্বাদন করিবার জন্য লালায়িত হন, পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য মানবও, সেইরূপই, তাহার আত্মজ্ঞানে উদিত অনন্ত চৈতন্যের রূপে মুগ্ধ হইয়া, সেই রূপ আস্বাদন করিবার জন্য চঞ্চল হয়।

"অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল,
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল।
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে লোভ,
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ।"

ব্রহ্ম ও মানব এই প্রেমলীলাতে নিযুক্ত বলিয়াই মানবের মধ্যে অনন্ত চৈতন্য যে পরিমাণে আত্মোপলব্ধি করেন, মানবও সেই পরিমাণে আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে। এই জন্যই মানবের আত্মজ্ঞানের সমানুপাতে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়; এবং এই জন্য, এক অর্থে, আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনকে ধর্ম্মের একটা সার্ব্বভৌমিক সংজ্ঞারূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারা যায়। কেন না, সত্য সত্যই এই বিশ্বের সর্ব্বত্র কেবল আত্মা দ্বারাই পরমাত্মাকে দর্শন করা যায়। মানবের আত্মজ্ঞান যখন যে আকার ধারণ করে, সত্য সত্যই তাহার ব্রহ্মজ্ঞানও তখন সেইরূপ আকারই ধারণ করিয়া থাকে। মানবের আত্মজ্ঞান যত বিকশিত হয়, তাহার ব্যক্তিত্ব যত পরিস্ফুট হয়, তত তাহার আত্ম-

জ্ঞানে প্রকাশিত অনন্ত চৈতন্যও পরিস্ফুট হইতে থাকে। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পাদির উন্নতিতে মানব যত আপনার সর্ব্বতোমুখী সম্বন্ধ সমূহ আয়ত্ত ও উপলব্ধি করিতেছে, তাহার অন্তর্নিহিত চৈতন্যেরও ততই স্ফূর্ত্তি হইতেছে। তাহার জীবনের Realities যত বৃদ্ধি ও পরিপক্ক হইতেছে, তাহার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে প্রকাশিত Idealityও তত বিকশিত এবং পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এই Ideality-ই ব্রহ্ম; এই Ideal এর অনুসরণই ধর্ম্ম।

আত্মজ্ঞানের শৈশব অবস্থায় যখন জীবের আত্মোপলব্ধি অল্প, তখন তাহার ঈশ্বরোপলব্ধিও সেইরূপ হয়। তাহার আত্মাকে তখন সে যে ভাবে দেখে, ঈশ্বরকেও সেইরূপই ভাবে। তখন তাহার আত্মানাত্ম জ্ঞান জন্মায় নাই, সে যে ঠিক তাহার দেহ নহে, এ জ্ঞান হয় নাই, তখন এই আত্মানাত্ম বিবেকের অভাবে সে আপনাকে জগতের যাবতীয় বস্তুরই ন্যায়, এবং জগতের যাবতীয় বস্তুকে আপনারই মত ভাবে। সুতরাং তখন তাহার ঈশ্বরও সেইরূপ জগতের অপরাপর বস্তুর ন্যায়, একটা বস্তু রূপেই as an object among other objects, প্রকাশিত হন। তাহার নবজাত আত্মাতে এতদপেক্ষা স্ফুটতর, উজ্জ্বলতর, বিশুদ্ধতর ব্রহ্মজ্ঞান তখন জন্মায় নাই, জন্মাইতে পারে না। ইহাকে ধর্ম্মের অভিব্যক্তি-সোপানের নিম্নতম স্তর বলা যাইতে পারে। ইহারই সাধারণ নাম জড়পূজা বা পরিমিতের উপাসনা। প্রকৃত সরল, জড়োপাসকদিগের প্রাণে জড়ের-জ্ঞানও পরিস্ফুট হয় নাই; আত্মার জ্ঞানও পরিস্ফুট হয় নাই; তখন জড়ই আত্মা, আত্মাই জড়, সুতরাং ঈশ্বরও জড় আকারে পূজিত হইবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ইহার পরে আত্মানাত্ম বিবেকের বিকাশে যখন মানুষ আপনাকে জড়ের বিষয়ী ও জড়কে আপনার বিষয়রূপে জানিল; তাহার জ্ঞানেতে জড় এবং আত্মার মধ্যে যখন এই অলঙ্ঘ্য প্রাচীর উত্থিত হইল, তখন তাহার ঈশ্বরও তাহার আপনার ন্যায় একজন বিষয়ী আত্মা, একজন অতিপ্রাকৃত মানব হইলেন। তাহার আপনার যেমন ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, মিত্রতা আছে, ঈশ্বরেরও তখন সেইরূপ রিপু সকল আরোপিত হইল। তিনি তখন নিরাকার, নির্ব্বিকার, শুদ্ধ চেতন্য হইয়াও ক্রোধাদির বশীভূত। ইহাই সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদীর একেশ্বরবাদ। তৎপরে, সর্ব্বশেষে মানব যখন ক্রমে তাহার আপনার আত্মজ্ঞানেতে জড় এবং আত্মার মিলন সংঘটন করিল; জড়ের স্বাতন্ত্র্য নাই, জড় চৈতন্যেরই বিকাশ, চৈতন্যেরই অধীন, চৈতন্যেরই আকার, চৈতন্যেরই ঘনীভূত চিন্তা, এই জ্ঞান যখন প্রস্ফুটিত হইল, তাহার আপনার আত্মাতে যখন সে জড় এবং চেতনের বিরোধ ভঞ্জন করিতে পারিল, তখন তাহার ঈশ্বরও আর কেবল নিরাকার চৈতন্য, অথবা একজন অতি প্রাকৃত মনুষ্য রহিলেন না; কিন্তু পরমাত্মারূপে অন্তরে ও বিশ্বরূপাত্মকরূপে বাহিরে প্রকাশিত হইলেন। মানব তখন তাঁহার সেই বিরাট পুরুষরূপ দেখিয়া, বিকম্পমান ও কৃতাঞ্জলী হইয়া ভীত ভীত ভাবে, গদগদ স্বরে, ধনঞ্জয়ের কথায়, তাঁহার স্তুতি করিল—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়াততং বিশ্বমনন্তরূপং।
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥
নমঃ পুরস্তদাথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বতএব সর্ব্ব!
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্তং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান।
নত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যোলোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাব॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব। সোঢ়ুম্॥

তুমি আদিদেব, তুমি সেই পুরাতন পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় স্বরূপ, তুমি দ্রষ্টা, তুমি সেই জ্ঞাতব্য পরম ধন, হে অনন্ত রূপ। তোমা দ্বারাই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি শশাঙ্ক, তুমি প্রজাপতি, তুমি প্রপিতামহ, তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, তোমাকে পুনর্নমস্কার, ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার।

হে প্রভো। তোমার অগ্রে নমস্কার, তোমার পৃষ্ঠ ভাগে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, হে সর্ব্ব স্বরূপ। তোমার সকল দিকেই নমস্কার, হে অনন্ত বীর্য্য। তুমি অমিতক্রম, তুমি সমুদায় বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তুমিই সর্ব্বব।

হে অপ্রতিম প্রভাব। তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, তুমিই জগৎ গুরু, তুমিই পূজ্য, তুমিই শ্রেষ্ঠ, এই লোকত্রয়ে তোমার সমান মহিমাশালী কেহই নাই, অধিক তো সম্ভবেই না।

অতএব, আমি অবনত হইয়া, একমাত্র পূজ্য ঈশ্বর তুমি, তোমার প্রসন্নতা লাভের প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেরূপ পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, সখা যেরূপ সখার অপরাধ ক্ষমা করেন, প্রিয় ব্যক্তি যেরূপ প্রণয়পাত্রের অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তুমিও সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

—মানব তখন, আপনার তত্ত্বজ্ঞানের ভূমিতে, অভিব্যক্তির ভিত্তির উপরে, সাকার নিরাকারের অনন্ত মিলন সংঘটন করাইয়া ব্রহ্মের এই বিরাটপুরুষমূর্ত্তি সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দুসাধকের সঙ্গে করযোড়ে স্তুতি করে।

নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়!

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সাহিত্য ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (১)*

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "ডাক্তার" উপাধি ছিল। কিন্তু, আমরা তাঁহাকে সে উপাধিতে অভিহিত করিলাম না। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "ডক্টর অব লিটারেচর" উপাধির উপযুক্ত ছিলেন। অন্ততঃ লোকে বলে, কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির উচিত ছিল, তাঁহাকে এ উপাধি দেওয়া।† উপাধি-লিপ্সা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের না থাকিলেও, এ উপাধি সম্ভবতঃ তাঁহার অনাকাঙ্ক্ষণীয় ও অগ্রহণীয় ছিল না। কিন্তু, এ উপাধি, তাঁহাকে কখনও প্রদত্ত হয় নাই। তিনি যে প্রকৃতির "ডাক্তার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার যোগ্য ছিল না; তিনিও তাহার যোগ্য ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস-শাস্ত্রশালা-প্রদত্ত ডাক্তার উপাধি এক জন আজীবন সাহিত্য-উপাসক ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীর প্রাপ্য হইলেও শোভনীয় নহে।

স্বাভাবিক প্রবণতায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবল সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। শিক্ষায় এবং অনুশীলনে, সেই সাহিত্যানুরাগ সাহিত্য প্রেমে পরিণত হইয়া, তাঁহার মন ও জীবন পূর্ণ করিয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রকৃত প্রস্তাবেই সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-জীবী

* শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়;—জীবনী, পত্রাবলী ও Mr. F. H. Skrine, C.S. প্রণীত।

† রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী "ডক্টর" উপধি দিয়াছিলেন। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, এই য়ুনিভার্সিটী অগ্রাহ্য মুখোপাধ্যায়কে লিখেন;—"I accept as expression of kind friendship what you have written and with the greater self-satisfaction that it comes from one who is himself a *defacto* Doctor of Literature and a profound observer and judge of men and manners. A verdict from such a quarter is in itself of greater value than the certificate of a miscellaneous body however privileged by law."

ছিলেন। তাঁহার চিত্তের এবং চিন্তার অণু-পরমাণুটী পর্য্যন্ত, সাহিত্যানুরাগে, রঞ্জিত ও সাহিত্য-প্রীতিতে প্রভাবিত ছিল। তাহা সাহিত্যরসে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইত। সাহিত্য-সৌন্দর্য্য-উপভোগশক্তি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ পরিমাণে ছিল। তিনি সাহিত্যেই আরম্ভ করিয়া সাহিত্যেই জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন।

লিপি-চতুর ও লিপি চালনায় সুনিপুণ শম্ভুচন্দ্র,যাহা কিছু লিখিতেন, যেন চিত্র করিতেন। পাঁচ লাইন একটী "প্যারা" লিখিতেও রচনা-লালিত্য ও শব্দ ও শৃঙ্খলা-সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য থাকিত। চিত্রকরের বর্ণ-চিত্রবৎ শম্ভুচন্দ্রের রচনা বাক্যচিত্রে প্রতিভাত হইত।

রসোদ্ভাবনক্ষম ও রসিকতা চটুল শম্ভুচন্দ্রের লেখনী রচনা-লীলায় নৃত্য করিত। গভীর রচনায় প্রখর,—শ্লেষাত্মিকা রস-রচনায় শম্ভুচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বক্রোক্তি ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপের শক্তি, তাঁহার বার্দ্ধক্যেও, বিশিষ্ট রূপে বিদ্যমান ছিল।

আক্ষেপ,শম্ভুচন্দ্রের এই অসাধারণ লিপিশক্তি ও সাহিত্যের সর্ব্বদিক-স্পর্শিনী প্রতিভা কেবল মাত্র সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্র সম্পাদকত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সাময়িক সংবাদপত্রের ক্ষণ স্থায়ী ও মুহূর্ত্তের প্রীতিপদ রচনা ভিন্ন তাঁহার আর এমন কিছুই নাই, আর এমন কিছুতেই তিনি শক্তি প্রয়োগ করিবার অবসর গ্রহণ করেন নাই, যাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি,মনের গঠন ও লেখনীর সৌন্দর্য্য লোকে দেখিতে পাইবে!

তথাচ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালীর মধ্যে অসাধারণ ইংরেজী লেখক ছিলেন;—অনেক শিক্ষিত ইংরেজের মধ্যেও ছিলেন। ইংরেজ, মুখোপাধ্যায়ের রচনা আদর করিয়া উপভোগ করিতেন; উপভোগ করিয়া আপ্যায়িত হইতেন। মুখোপাধ্যায়ও ইংরেজের এই আদর মূল্যবান মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে, তাঁহার স্বদেশীয়ের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি আমলে আনিতেন না। বাঙ্গালীর ইংরেজী রচনা ইংরেজের নিকট আদৃত হইলেই অবশ্য তাহার গৌরব, বাঙ্গালীর বাঙ্গালা রচনায় ইংরেজের কোনও কথা গ্রাহ্যই হইতে পারে না। অতএব এ সম্বন্ধে, মুখোপাধ্যায় ইংরেজের মুখের দিকে তাকাইতেন, ইহা আশ্চর্য্যও নহে, অন্যায় বা অস্বাভাবিকও নহে।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংবাদপত্র-সম্পাদক ছিলেন। অতএব তিনি রাজনীতির অনুশীলন করিতেন; আলোচনা ও আন্দোলন করিতেন। কিন্তু, রাজনীতি তাঁহার মনের দ্বিতীয় উপলক্ষ্য ছিল; সাহিত্য ছিল প্রথম উপলক্ষ্য এবং উপাদান। সাহিত্যে তাঁহার স্বভাবের সর্ব্বাঙ্গীন গঠন বা সে গঠনের সম্প্রসারণ হইয়াছিল। সাহিত্যই ছিল তাঁহার স্বভাবের অনিবার্য্য অতি তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা। তিনি সাহিত্যে সন্তরণ দিতেন, নিমজ্জিত হইতেন, কার্য্য ও ক্রীড়া করিতেন;—সাহিত্যের সহিত স্বকীয় অস্তিত্বের একীকরণ করিতেন; শম্ভুচন্দ্র সাহিত্যের সেবায় ও সাহচর্য্যেই জীবিত থাকিতেন। পক্ষান্তরে, সাহিত্যের সৃষ্টি করিবার জন্যও তিনি অসামান্য শক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন; কিয়ৎ পরিমাণে তাহা করিয়াও ছিলেন।

কিন্তু, তথাচ, এই শক্তিশালী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ,—এই সাহিত্য-জীবী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,সাহিত্য ক্ষেত্রেই মহা পাপী ছিলেন। শক্তিশালী বাঙ্গালীর এবম্বিধ সাহিত্য-পাতক

বিরল নহে। কিন্তু, শম্ভুচন্দ্রের শক্তি অসাধারণ ছিল; তজ্জন্য তাঁহার পাপের পরিমাণ ও প্রবলতা অপেক্ষাকৃত অধিক।

লিপি-শক্তি সম্পন্ন, রচনা-নিপুণ বাঙ্গালীর আজীবন কেবল ইংরেজী লিখিয়া সে শক্তির ও সে নৈপুণ্যের ব্যয় বা অপব্যয় করিয়া যাওয়াকে আমরা মহা পাপ বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নিকট বাঙ্গালীর এই পাপ প্রায়শ্চিত্তের অতীত; এই প্রত্যবায়, আদৌ অমার্জ্জনীয়। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যজ্ঞ শক্তিশালী লেখক-সংখ্যা এতই অল্প এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অল্পাধিক উন্নতি সত্ত্বেও উহার অবস্থা অবয়ব অদ্যাবধি এতই অপরিপুষ্ট যে,সাহিত্যাধ্যায়ী লিপি-শক্তি-সম্পন্ন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ছাড়িয়া, অবিমিশ্র ইংরেজীর সেবা ও ইংরেজী ভাষায় রচনা করিবারজন্য অবসর গ্রহণের অধিকার নাই। জোর করিয়া ও যদৃচ্ছাচার করিয়া যাঁহারা সে অধিকার গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বজাতির পরম কল্যাণকামী হইলেও, মাতৃ-ভাষার ও পৈতৃক সাহিত্যের নিকট নিশ্চয়ই প্রত্যবায়-ভাগী।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বা হরিশ্চন্দ্র মুখোপধ্যায়, বা রাজেন্দ্র লাল মিত্র,বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বা কবি রামশর্ম্মা, বা লালবিহারী দে,বা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বা নগেন্দ্র নাথ ঘোষ, বা আরও কত কত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, প্রবীণ ও নবীন ইংরেজী লেখক বাঙ্গালী ইংরেজীতে না লিখিলে, ইংরেজী ভাষার ও ইংরেজী সাহিত্যের,বোধ হয়,কিছুই আসিয়া যাইত না। মহা সমুদ্রে বারিবিম্বের উত্থান পতন, অতি তুচ্ছ নগণ্য ঘটনা। সাগর-গর্ভে কলস পরিমাপে সলিল-সম্পাত হাস্য-জনক ও বিদ্রূপকর ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কিন্তু, ঐ সকল ব্যক্তি বা ঐ সকল ব্যক্তির মত ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় না লেখাতে বা লিখিতে না পারাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বৃহৎ ব্যাঘাত হইয়াছে। কথা হইতে পারে, এই সকল লোক বা ইঁহাদের কোন কোনও লোক ইংরেজী লেখাতে কি বঙ্গভূমির ও বাঙ্গালী জাতির কোন উপকার হয় নাই? উত্তর,—উপকার হইতে পারে,—হরিশ্চন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা কৃষ্ণদাস পাল বা কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতির ইংরেজী লেখায় কিছু উপকার হইয়াছিল; কিন্তু সে উপকারের তুলনাতেও অপকার অনেক অধিক হইয়াছে। তাহার আলোচনা কিছু পরে,শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিজের কৈফিয়ৎ কালেই, করা যাইবে।

রামমোহন রায় হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত যে সকল বিশিষ্ট ও শক্তিশালী বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অকাতরে ও স্বদেশীয়দিগের ঔদাসিন্য, অনুদারতা ও অকৃতজ্ঞতার অভ্যন্তরে, অবিরত শ্রম করিয়াছেন এবং সময়, সামর্থ্য, অর্থ ও মস্তিষ্ক ব্যয় করিয়া, ঐ সাহিত্যকে তাহার উপস্থিত অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় কেহই, অন্ততঃ অনেকেই, ইংরেজী রচনায় অনিপুণ ছিলেন না ও অনভিজ্ঞ নহেন। এবং ইংরেজীতে লিখিলে কোনও ইংরেজী লেখক বাঙ্গালী অপেক্ষা নিশ্চয়ই ন্যূন হইতেন না। কে বলিবে, মধুসূদন দত্ত বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র বা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু বা কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা নবীনচন্দ্র

সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইচ্ছা করিলে ইংরাজীতে, কেবল মাত্র ইংরেজীতেই স্বকীয় চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিতেন না? এবং কে বলিবে যে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র, ইংরেজীতে লিখিয়াও কিছু খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইতেন না? মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীতেই ত আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু, ইংরেজীতেই যদি তাঁহারা শেষ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বলুন দেখি, বাঙ্গালা সাহিত্য আজ কোন্ স্থানে থাকিত? আর তাঁরা নিজেই বা কোন্ স্থানে থাকিতেন?

উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের কেহ কেহ, বিশেষতঃ রমেশচন্দ্র দত্ত, বাঙ্গালার ন্যায় ইংরেজীকেও তদীয় রচনা লীলার রঙ্গস্থল করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজী গ্রন্থেই তাঁহার খ্যাতি অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; অতএব তিনি আদৌ বাঙ্গালা স্পর্শ না করিয়া কেবল ইংরেজী লইয়া থাকিলেও থাকিতে পারিতেন; থাকাই তাঁহার স্বার্থের ও সুখ্যাতির অধিকতর উপযোগী হইত। কিন্তু, তিনি অতুল সম্পদশালিনী ইংরেজীকে তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব না দিয়া, কাঙ্গালিনী বাঙ্গালাকেও তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছেন। ইহা উত্তম। কিন্তু, ইহাও প্রচুর বলা যায় না। তিনি ইংরেজীতে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাও বাঙ্গালার ভাগে পড়িলে বাঙ্গালার অধিকতর উপকার হইত। তাঁহার "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস" ও "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালারই প্রাপ্য; ইংরেজীর তাহাতে অধিকারও ছিল না; তাদৃশ উপকারও হইবে না। বাঙ্গালী যতই ভাল ইংরেজী লিখুন, তাঁদের ইংরেজী ইংরেজের ইংরেজীর নিকট কিছুই নয়; যেমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালার নিকট বিদেশীয় অতি বড় পণ্ডিতেরও বাঙ্গালা বিদ্রুপই উত্তেজিত করে। বাঙ্গালীর ইংরেজী, যতই উৎকৃষ্ট হউক, তাহাকে কেহই "বাবু-ইংলিশ" বই বৃটিশ ইংলিস বলিবে না।

ইংরেজী ভাষায় বই লিখিয়া, হিন্দু সভ্যতার বা বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব ঘোষণা করা মন্দ নহে, কিন্তু, তৎপূর্ব্বে আত্ম গৃহের গঠন করা অধিকতর আবশ্যক। "উড়িষ্যার প্রত্ন-তত্ত্ব" বাঙ্গালা, ইংরেজের ইংরেজীতে না লিখিয়া, বাঙ্গালীর বাঙ্গালাতে লিখিলেই কি অধিকতর স্বাভাবিক ও শোভনীয় হইত না? ইংরেজ ঐতিহাসিক সে তত্ত্ব কি ফরাসীতে লিখিয়াছেন, না, জর্ম্মণে লিখিয়াছেন?

বাঙ্গালার বক্তৃতা শক্তিও ইংরেজীমার্গে দ্রুত ধাইয়াছে। আমাদের নব্য সময়ে কেশবচন্দ্র সেন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। সেরূপ বাগ্-প্রতিভা ও উদ্দীপনা শক্তি, তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে কখনও কোন বাঙ্গালীর জন্মে নাই। কেশবচন্দ্র সেন ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট উপস্থিত বক্তা ছিলেন। কিন্তু, বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করার অবসর থাকিলে তিনি ক্বচিৎ ইংরেজীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কেশবচন্দ্র সেনের পর বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা প্রথা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। আমাদের এখনকার উৎকৃষ্ট বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালমোহন ঘোষ ইংরেজীতে আগুন ছুটাইতে পারেন; কিন্তু, বাঙ্গালা ভাষায় মুখ খুলিতে পারেন না; প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও তাঁহার সাময়িক বক্তৃতায় একমাত্র ইংরেজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তবে সাহেব ও ছাত্র সমাজেই তাঁর

বক্তৃতা ইদানীং হইয়া থাকে বটে। প্রতাপ বাবু ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক বক্তা। সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি রাজনৈতিক বক্তা। রাজনীতি-বিষয়ক বক্তৃতায় ইংরেজীর অত্যাবশ্যকতা আছে; কিন্তু, বাঙ্গালারও কোন্ না আছে? বঙ্গীয় কৃষক সমাজে কংগ্রেসকে পরিচিত করিবার জন্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর একান্ত যত্নবান্ হইয়াছেন। যত্ন কতটা সফল হইবে, বলা যায় না। কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে সচেষ্ট ও সমর্থ হইলে, এই সুকঠিন কার্য্যটী কি কিঞ্চিৎ সহজ হইত না? সুরেন্দ্রনাথ বাবুর অন্তঃসার-শূন্য ও ইতর ধামাধরারা যাহাই বলুক, তাঁহার প্রকৃত গুণগ্রাহী মাত্রেই উহা স্বীকার করেন। বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজ কৃষক সভায় তিন ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা করিতে সুসমর্থ; কিন্তু, বঙ্গীয় কৃষক মণ্ডলীর সম্মুখে কয়টী কথা একত্র করিয়া কহিতে সুপারগ! ইহা বিসদৃশ। ইহা বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য; ও বাঙ্গালার কলঙ্ক। কিন্তু, কোন্টী অধিক? বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কংগ্রেস-নীতি অধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছে, কিয়ৎ পরিমাণে কৃষক সমাজেরও অন্তর্ভেদ করিয়াছে, ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, পণ্ডিত অযোধ্যানাথের উর্দ্দু বক্তৃতা; এবং তাঁহার পর মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির তৎপদচিহ্নের অনুসরণ। বঙ্গদেশে কংগ্রেসের বাঙ্গালাভাষী বক্তা নাই।

অন্য কথা কি? গৈরিক চীরাবৃত দণ্ড-কমণ্ডলুধারী বাঙ্গালী সন্ন্যাসীও আজ কাল ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া স্বদেশীয়ের নিকট তাঁর সন্ন্যাস-ধর্ম্মের,—অদ্বৈত-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন! টিকি-তিলক-শোভিত বৈষ্ণব বাপাজীর বক্তৃতাতেও ইংরেজী বুলি! কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং! জানিতাম, কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস নিশ্বাসবৎ স্বভাবতঃই মাতৃ ভাষায় উত্থিত হয়। কিন্তু, বাঙ্গালী কবি ইংরেজীতেও কপ্চাইয়া থাকেন।

কথা হইতে পারে, ইংরেজী ভাষার শব্দ-সম্পদ ও ইংরেজী সাহিত্যের ভাব-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অসম্পূর্ণ, অপরিপক্ক ও অঙ্গহীন বাঙ্গালার ব্যবহার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। এখনকার দিনের সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ণ, ও খর মধুর ভাব-প্রবাহ; ঘন বৈজ্ঞানিক ও গাঢ় রাজনৈতিক চটুল, চিক্কণ চিন্তা রাশি বহন করিতে বাঙ্গালা আদপেই উপযোগী নয়। ইংরেজীতে যাহা এক মিনিটে ব্যক্ত করা যায়, সাত রাত্রি সাত দিন মাথা কুটিয়াও বাঙ্গালাতে তাহা বলা যায় না। অতএব ইংরেজীর আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায় কি? ইংরেজী রচনা-লীলার যেমনতর "রঙ পরম্" চলে, তোমার বাপ পিতামহের বাঙ্গালাতে কি, বাপু, তেমনতরটী ঘটিয়া উঠিতে পারে?

সত্য হইতে পারে এ কথা। কিন্তু, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় শক্তিমান বাঙ্গালাবগ যদি কখনও বাঙ্গালা ভাষার "ক" অক্ষরও স্পর্শ না করেন, তবে আপনা হইতেই কি উহা ধনে গৌরবে গঠিত হইয়া উঠিবে? ইংরেজীর ঐশ্বর্য্যরাশি কি স্বর্গ হইতে পড়িয়াছিল, অথবা শক্তিশালী ইংরেজ লেখকেরাই উহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ইংরেজী সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ ও ইতিহাস, এ সম্বন্ধে কি বলে?

পরন্তু, বাঙ্গালা ভাষার কি আজও এতই দুর্দ্দশা যে, তাহা আমাদের বাঙ্গালী ইংরেজী লেখকদের মস্তিষ্ক ভার বহন করিতে একবারেই পারে না। ব্যাকরণাভিমানী হস্তি-

মূর্খ উন্মাদের প্রলাপ ও ইন্দ্রনাথ বাবুর বিবিধ বিলাপ সত্বেও বাঙ্গালা বাঙ্গালাই আছে এবং তদ্দ্বারা একটী শম্ভুচন্দ্রের বসাল রচনায় বা একটী নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সমাজ সাহিত্যাদি আলোচনার সবিশেষ ব্যাঘাত হইত বা হয় বলিয়া বিবেচনা হয় না।

কিন্তু, বাঙ্গালা লিখিতে হইলে বাঙ্গালী হওয়াই প্রচুর নহে; ইংরেজী বা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাও প্রচুর নহে; ইংরেজী রচনা-নৈপুণ্যও প্রচুর নহে। বাঙ্গালা লিখিতে হইলে, বাঙ্গালা শিক্ষা,অভ্যাস ও আলোচনা আবশ্যক, বাঙ্গালা রচনা অনুশীলন করা আরও অধিক আবশ্যক। নতুবা বাঙ্গালী গৃহে জন্মিলেই, আর ইংরেজী কালেজে পড়িলেই যে বাঙ্গালাটাতে রাতা রাতি অধিকার জন্মিবে, এমন মনে করাই বাতুলতা; এমন হইতে পারে না, এমন কখনও হয় নাই, হইবেও না। অতি সামান্য ও নগণ্য বিষয় আয়ত্ত করিতেও যখন তাহার শিক্ষা ও অনুশীলন আবশ্যক, তখন কেবল বাঙ্গালাটাই বিনা শিক্ষায়, বিনা অভ্যাসে ও অনুশীলনে উদরস্থ হইবে, এরূপ মনে করেন ও মনে করিতে পাবেন, কেবল কলিকাতা য়ুনিভার্সিটীর মত অতি পাণ্ডিত্যা-মানী অজগর পদার্থ। ফলও হইয়াছে ও হইতেছে তদ্রূপ। তখনকার চৌপাড়ীর পণ্ডিতদের মত, এখনকার য়ুনিভার্সিটীর গ্রাজুয়েটেরাও বাঙ্গালা রচনায় একান্ত অপটু। তখনকার ইংরেজী নবিশদের বরং ইংরেজী রচনাটা আয়ত্ত হইত; এখনকার এঁদের, শুনিয়াছি নাকি সেটাও সুবিধামত হয় না; বাঙ্গালা ত হয়ই না।

বিনা শিক্ষায় বাঙ্গালার আয়ত্তই যদি হয়, তবে অধিকাংশ ইংরেজী-নবিশ বাঙ্গালী বাঙ্গালা লিখিতে অপারগ কেন? শতকরা দশ পনেরো জনেরও ত এবিষয়ে পারগ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, অপারগ;—ইচ্ছা সত্বেও অনেকে অপারগ। তথাচ আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় উচ্চতর অধ্যয়নে বাঙ্গালা শিক্ষার ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে অসম্মত! তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতাই স্বীকার করিতে "খুন কবুল"। অতএব বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সবই আছে; নাই কেবল বাঙ্গালা!! অতি উপাদেয় ব্যবস্থাই বটে!

কথা হইয়া থাকে যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, বাঙ্গলা বিহীনতা সত্বেও যখন বাঙ্গালা সাহিত্য বাড়িয়া চলিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র,রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি উত্থিত হইয়াছে, তখন আর বাঙ্গালার জন্য এত ব্যস্ত হওয়া কেন? বিনা শিক্ষায় ও বিনা শ্রমেই বাঙ্গালা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক মিলিবে। বাঙ্গালার জন্য বেশী কিছু করার আবশ্যকই নাই। ওটা বেওয়ারেশ বস্তু, আপনার পথ আপনিই দেখিবে।

তা বটে! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার বিনা অভ্যাসে ও বিনা অনুশীলনেই কি ঐ সকল লোক বিখ্যাত লেখক হইয়াছেন? বঙ্কিম বাবু জীবিত নাই; হেম বাবু, চন্দ্র বাবু প্রভৃতিকে ত জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালাটা যথার্থই কি তাঁদের দৈব-বিদ্যা; অথবা উহা কিঞ্চিৎ শ্রম করিয়া শিখিতে হইয়াছিল? বাঙ্গালা না শিখিয়াই যদি বাঙ্গালা লেখা যায় ও লিখিয়া বিশিষ্টত্ব লাভ করা যায়,তবে রমেশ বাবু ও রবি বাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা চালাইবার জন্য এত মাথা-কোটা-কুটি করেন কেন? তাঁরা নিজেই ত না পড়িয়া পণ্ডিত, তবে, অন্যকে পড়াইতে

চাহেন কেন? পরন্তু, তাঁদের পুস্তক রাশির পাঠকেরও ত অভাব হয় নাই, তাঁদের ব্যাঙ্কারও ত দেউলিয়া হয় নাই, জমিদারিও বিক্রয় হয় নাই, বিভাগীয় কমিসনরিও যায় নাই যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বই বিক্রয় বৃত্তি অবলম্বনের জন্য সবিশেষ ব্যগ্র হইয়া বাঙ্গালার পোষকতা করিতেছেন!!

বাঙ্গালার বিরুদ্ধে আরও আপত্তি এই যে, বাঙ্গালায় উচ্চ স্তর অধ্যয়নোপযোগী পুস্তকই নাই, পুস্তকই হয় নাই; অতএব "এফ, এ" "বি, এ" ক্লাসের বিদ্যালোকিত কক্ষে বাঙ্গালা প্রবেশ করিবে, কি লইয়া? অসার বাঙ্গালা ভাষায় এমন কি গ্রন্থ আছে, হইয়াছে বা হইতে পারে, যাহা গভীর জ্ঞানাধ্যায়ী গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েটদিগের পাঠোপযোগী হওয়ার সম্ভব? বা যাহা সেক্সপীয়র, শেলি, মিল্টন, মেকলে, বেকন, বার্ক, বায়রণ, টেনিসন প্রভৃতির "পাশাপাশি" পড়ান যাইতে পারে?

মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্য নেহাত নিস্বঃ, আমরা স্বীকারই করিয়াছি। কিন্তু, তথাচ, মনে করিবেন না যে, বাঙ্গলা ভাষায় এমন পুস্তক নাই, যাহা বি, এ, ক্লাস পর্য্যন্ত পঠিত না হইতে পারে। সেরূপ মনে করিলে বাঙ্গালা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদিগের প্রতি অন্যায় অশ্রদ্ধা ও এফ, এ, বি, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্র সাধারণের মানসিক উৎকর্ষের পরিমাণ সম্বন্ধে অকারণ বড় বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়।

পরন্তু, ইংরেজী সাহিত্যের অতুল ঐশ্বর্য্য। বাঙ্গালার সম্বল, নানা কারণেই সীমাবদ্ধ, তথাচ, বায়রণ, শেলি, মিল্টন, টেনিসনের তুল্য কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ, তল্লাস করিলে; উহাতে কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে। মিল, মেকলে, ম্যাথু আর্ণোল্ড বাঙ্গালা সাহিত্যে সশরীরে না জন্মিলেও এবং কার্লাইল, এমারসণ আদি তাহাতে কখনও আবির্ভূত না হইলেও, মৌলিক চিন্তা-চিহ্নিত, সারবান ও জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ গ্রন্থ, বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কিছু না জন্মিয়াছে ও জন্মিতে না পারে, এমন নয়।

কিন্তু, আশা কোথায়! বিশ্ব-বিদ্যালয় স্বয়ং বাঙ্গালার বিপক্ষ; শিক্ষিত বাঙ্গালীর পোণে ষোল আনা অংশ বিপক্ষ; শক্তিবান বাঙ্গালী ইংরেজী-লেখক বিপক্ষ। তারপর আর এক শ্রেণীর ক্ষমতাপন্ন ও প্রতিভাশালী বাঙ্গালা-বিদ্বেষী বাঙ্গালী আছেন, যাঁরা বাঙ্গালী নামটী পর্য্যন্ত সটান বর্জ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত। মাতৃ স্তন্যের সহিত ভ্রম বশতঃ, যতটুকু বাঙ্গালা তাঁদের উদরস্থ হইয়াছিল, সে টুকুও কোন ক্রমে ভুলিয়া যাওয়াকে তাঁরা পুরুষার্থ জ্ঞান করেন ও মনে থাকিলে লজ্জিত হন। অবস্থা এই। এ অবস্থায়,

* কয়েকমাস পূর্ব্বে য়ুনিভার্সিটী সিণ্ডিকেটের এক অধিবেশনে, এফ, এ, ক্লাসে, বাঙ্গালা প্রবর্ত্তিত করার জন্য বাবু রসিচরণ মিত্র প্রস্তাব করেন। পোষকতার অভাবে প্রস্তাবটীর অপমৃত্যু ঘটে। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গালার বন্ধু এমন একটী বাঙ্গালীও ছিলেন না, যিনি ঐ প্রস্তাবটীর পোষকতা করাও উচিত বোধ করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া পোষকতা করিবেন? করিলে যে পাপ স্পর্শিবে। সাহিত্য পরিষদ হইতে রমেশচন্দ্র দত্ত দুইটা প্রস্তাব প্রেরণ করেন, ঐ অধিবেশনে তাহার একটী মঞ্জুর, আর একটা না-মঞ্জুর হইয়াছে। এফ-এ, ও বি-এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা অনুবাদ ও রচনা বিষয়ক প্রশ্নের একখানা করিয়া কাগজ থাকিবে। বাঙ্গালার উপর এই অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু, চৌপাড়ীর বাঙ্গালার ন্যায়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ী বাঙ্গালায় বাহিরের লোকের জ্বর আসে, ইহা আক্ষেপ।

এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালা লেখার অবসর যদি অশিক্ষিত ও অৰ্দ্ধ-শিক্ষিত লোকে পাইয়া থাকে ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র চালান যদি অনেক স্থলে জ্ঞানহীনের বৃত্তি বা মূর্খ গোঁয়াড়ের ব্যবসা হইয়া থাকে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহা শিক্ষিতের অবহেলা ও অবজ্ঞারই ফল।

তা, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা লিখিতেন না বটে; বাঙ্গালা কখনও লিখেন নাই বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বাঙ্গালার বিদ্বেষী ছিলেন না; প্রত্যুত তাহার আন্তরিক বন্ধুই ছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ, বাঙ্গালা সাহিত্যকেও তদীয় প্রীতির বিষয়ীভূত করিয়াছিল। তিনি উহার গতি প্রকৃতি ও উন্নতি অবনতির প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতেন ও সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। সম্পাদকীয় আসন হইতে উহার সযত্ন সমালোচনা করিতেন ও সমস্ত সংবাদ রাখিতেন। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে (আমাদের স্মরণ হইতেছে) মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী "থিওরী" ছিল। তাহার মর্ম্ম কতকটা এইরূপ যে, আসল বাঙ্গালা, সরল, মধুর দেশজ খাঁটী বাঙ্গালা বিদ্যমান নাই; তাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া, তাহার স্থানে সংস্কৃত প্রধান যে বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা খাঁটি বাঙ্গালা নয়। খাঁটি বাঙ্গালার অতি অল্পই এখন অবশিষ্ট আছে। দেশজ সরল বাঙ্গালার বিলোপ হেতু তিনি আক্ষেপ করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই অভিমতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ আমরা কোথায়ও দেখি নাই। আলোচ্য জীবনী গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না।

বিলাতি "স্পেক্টেটর" পত্রের সম্পাদক একবার শম্ভু বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার সহযোগীগণ, বাঙ্গালা না লিখিয়া, ইংরেজী লিখেন কেন? স্বদেশীয় ভাষায় একটী নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি না করিয়া, পরন্তু ইংরেজীর উপাসনা ও ইংরেজীতে রচনা করেন কেন? শম্ভুচন্দ্র আত্ম পক্ষ সমর্থন কল্পে, বাঙ্গালার প্রতি বিশিষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বকই ইহার উত্তর দিয়াছিলেন।

স্পেক্টেটর পত্রের মেরিডিথ টাউন্সেণ্ড সাহেব শম্ভুচন্দ্র-সম্পাদিত "রাইচ ও রায়ত" পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লণ্ডন হইতে তাঁহাকে লিখেন;—

"I do not quite understand, I confess, why men, so able as yourself should prefer to publish in a foreign tongue, instead of making a literature of your own"

শম্ভুচন্দ্র ইহার উত্তরে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন।

"পৃথিবীতে আমরা একটী সুন্দরতম সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিতাম বটে; কিন্তু, তদ্দারা আমাদের চিত্তভাব আমাদের বৃটিশ শাসয়িতাদের শিবিরে আদৌ অঙ্কিত হইত না। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার, ও সামাজিক অবস্থারও বটে, উন্নতির সম্ভাবনা রহিত হইত। তা, আসল কথা এই যে, আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য সংগঠন করিয়াছি, সে সাহিত্য এখন সম্যক্ সম্ভ্রান্ত সাহিত্যই বটে। আপনি এখানে, আপনার সময়ে, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং দুই বৎসর কাল যাবৎ একটী বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু, আপনি এখনকার বাঙ্গালা ভাষা দেখিলে,—উহার শব্দ-সম্পদ ও সাহিত্য-ঐশ্বর্য্য দেখিলে বস্তুতই বিস্মিত হইবেন। তথাচ, বাঙ্গালা ভাষা উহার এতাধিক শ্রীবৃদ্ধি ও সাহিত্য-সম্পদ সত্ত্বেও, আমাদিগকে এক বিন্দুও সহায়তা করে নাই,—অবনত অবস্থা হইতে, আমাদিগকে উদ্ধার করিতে উহা সমর্থ হয় নাই। এই কারণেই, আমরা বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে ও সংবাদ পত্র সম্পাদন করিতে এবং যদি সম্ভব হয়, ইংরেজীকে স্বদেশীয় দ্বিতীয় ভাষা করিয়া

তুলিতে বাধ্য হই। ইহাতে যে আমাদের কত অধিক ব্যক্তিগত আত্ম ত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন না।"

"ইংরেজী রচনায় আমাদের ভবিষ্যত খ্যাতিও স্মৃতির আশা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালায় লিখেন ও বাঙ্গালার অনুশীলন করেন, তাঁহারাও, তহার পর স্বদেশীয়দিগের স্মৃতি-পথে থাকিবেন; এবং তাঁহাদের লেখা লোকে এখন অধিক পড়ে। কিন্তু, আমরা,—যাঁহারা ইংরেজীতে লিখি,—এই আত্মত্যাগ পিতৃ-ভূমির জন্যই করিয়াছি।"

নৈপুণ্য ও কারুণ্য, উভয়ই আমরা এ উত্তরে দেখিতে পাই। শম্ভুচন্দ্র, বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্টতায় বিশ্বাসবান; পরন্তু, উহা যে পৃথিবীর একটী সম্রান্ত ও অতি সুন্দর সাহিত্য হইতে পারে, ইহাও তাহার ধারণা। অপিচ, যাঁহারা বাঙ্গালা লেখক ও বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রষ্টা, তাঁহারাই বাঙ্গালী জগতে জীবিত থাকিবেন, ইংরেজী লেখক বাঙ্গালীর সে আশা আদৌ নাই, ইহাও শম্ভুচন্দ্র সম্যক রূপে অনুভব করিতেন। কিন্তু, তথাচ তিনি বাঙ্গালায় না লিখিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের বক্ষে আত্ম-শক্তি ও আত্ম ব্যক্তিত্ব চিরমুদ্রাঙ্কিত না করিয়া, পিতৃ ভূমির মঙ্গল কামনায়, ইংরেজী রচনায় আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহা করুন। শ্রদ্ধাস্পদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বদেশ-হিত-বাসনা এবং তদর্থে ইংরেজীতে আত্ম-বিসর্জ্জন অতীব পবিত্র পদার্থ বটে; কিন্তু, গঙ্গা-সাগরে সন্তান বিসর্জ্জনের ন্যায়, ইহার মধ্যে ভক্তি-মূলক করুণার ন্যায়, বিড়ম্বনাও বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান। বাঙ্গালা সাহিত্য যতই সম্রান্ত ও সমুন্নত হউক, তদ্দারা বাঙ্গালী জাতির দুঃখ ঘুচিবে না, অভাব ও অধনতির মোচন হইবে না, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন বিদূরিত হইয়া জাতীয় উদ্ধার সাধন হইবে না,—এ অভিমত শম্ভুবাবুর হউক আর যাঁহারই হউক,—এক কথায়,—আদৌ অযৌক্তিক; অতএব অগ্রাহ্য। এই মত যদি সত্য হয়, সাহিত্যে ও শতরঞ্চ ক্রীড়ায় বড় বেশী প্রভেদ থাকে না; সাহিত্য মাত্রেরই প্রায় কোন সাবযুক্ত প্রগাঢ় প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সাহিত্য কোন শক্তি মধ্যেই পরিগণিত হয় না। সাহিত্য যদি শক্তি না হয়, উহা কিছুই নয়। উহার

—"কবিত্ব কল্পনা
সৌন্দর্য্য সুরুচি রস সকলি জল্পনা
লিপ-বণিকের"

উহা "গ্রন্থ-কীট" দিগের "শব্দ মরীচিকা জাল" মাত্র,—

"আকাশের পরে
অকর্ম্ম আলস্য বেশে ভুলিবার তরে
দীর্ঘ রাত্রি দিন।"

সাহিত্য-প্রেমিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই সাহিত্যকে, প্রকৃত প্রস্তাবে "অপদার্থ" স্বরূপ অবলোকন ও গ্রহণ করেন নাই। এবং অপদার্থের পত্র পুষ্প বিমর্দ্দিত করিয়া আলস্যের উপাদান স্বরূপ সাহিত্যের-সৌন্দর্য্য রস উপভোগ করিতেন না। সাহিত্য-সৌন্দর্য্য অপার্থিব, অপরিমেয় পদার্থ হইতে পারে; কিন্তু, সাহিত্যের আদৌ যদি কোন পার্থিব অর্থ ও আবশ্যকতা থাকে, তাহা উহার শক্তি, অকৃত্রিম, অবিমিশ্র ও অপরাজেয় শক্তি। যাহা শক্তি নহে, যাহাতে শক্তি নাই, তাহা সাহিত্যই নহে;—শব্দাড়ম্বরের "মরীচিকা জাল" মাত্র; সর্ব্ব শক্তির সার শক্তি, মানসিক ও অধ্যাত্মিক শক্তি হইতে সাহিত্য সম্ভূত ও সেই শক্তির সহিত জীবন্ত ও সদা জাগ্রত। প্রতীচ্য বলেন, জ্ঞানই, শক্তি, প্রাচ্য বলেন, জ্ঞানই মুক্তি। অতএব যে পথেই যাও, জ্ঞানই পথ-প্রদর্শক। মুক্তি শক্তি-

রই উচ্চতম পরিণতি ও প্রকার ভেদ। মুক্তির মূলেও শক্তি অর্থাৎ জ্ঞান। এখন, সাহিত্য আর কিছুই নয়, জ্ঞান, বিজ্ঞানেরই সমবায় ও সমষ্টি;—কাব্য, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহার-শাস্ত্র, জ্ঞানেরই নামান্তর;—অতএব শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা। সর্ব্বাঙ্গীন ও সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন জাতীয় সাহিত্য, ঘনীভূত জাতীয় শক্তির মহা কেন্দ্রস্থল ও মূল প্রস্রবণ, অতএব জাতীয় সাহিত্যে যদি জাতীয় উদ্ধার সাধন না হয়, তবে, আর কিছুতেই হয় না; কিছুতেই হইবার নয়। স্বাধীন, শক্তিবান, অজেয় ইউরোপ;—ইউরোপের অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা,তাহার প্রত্যক্ষ, পারিদৃষ্টমান সাক্ষী। উহার স্বাধীনতা ও সৈনিক শক্তি,উহার জাতীয় ঐশ্বর্য্য ও ডেমোক্রেসী, সবই জাতীয় সাহিত্যের অব্যবহিত ফল। উহার বাহুবল, বারুদ ও বন্দুকের বল, বাহুতেও নহে,—বারুদে ও বন্দুকেও নহে,—সাহিত্যে। রুষোর সাহিত্য সৃষ্টি না হইলে, রোবেসপীয়ব জন্মিতেন না। ইংরেজী সাহিত্যের অন্তস্থল হইতে ওয়েলিঙ্গটন উদ্ভূত। ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্‌ডী, কসত, সকলেই স্ব স্ব জাতীয় সাহিত্য-সম্ভূত জীব। রণবীর ও রাজ্য-বীর "হিরো" ও "ষ্টেটস্‌ম্যান্" কবির ও দার্শনিকের নিভৃত কক্ষেই অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। সর্ব্ববিধ শক্তিরই বীজ সাহিত্যাভ্যন্তরে নিহিত। বিসমার্ক বা ডিসরেলি, গ্লাডষ্টোন বা সালসবারী, সাহিত্যেরই স্বহস্ত-নির্ম্মিত সৃষ্টি। ছত্রপতি শিবজী ও পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ, রামায়ণ ও মহাভারতীয় সাহিত্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য হইতে হন নাই; হইতে পারিতেন না। তাহা হইতে বরং রাজা শিব প্রসাদেরই অভ্যুত্থান হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর যদি কখনও পরিত্রাণ হয়, (হওয়া খুব কঠিন বটে) তাহা বাঙ্গালা-সাহিত্য হইতেই হইবে;—আর কিছুতে হইবে না, ইহা নিশ্চয়। ইংরেজ শাসনে, যথা সর্ব্বস্ব দিয়াও বাঙ্গালী যদি স্বাস্থ্যকর ও শক্তিবান বাঙ্গালা সাহিত্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ আর কিছুতেই হইবে না। তাহাতেই, রাজনৈতিক একজাতিত্ব জন্মিবে, এবং তাহা হইতেই, কেবল তাহা হইতেই রাজনৈতিক অধিকারই বল, আর উদ্ধারই বল,—উৎপন্ন হইবে। ফল প্রত্যক্ষ ও কাল-সাপেক্ষ। সময় ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত শক্তি জন্মে না; সাহিত্যও জন্মে না। বৃথা হট্টগোল বিড়ম্বনা মাত্র। শতাব্দের পর শতাব্দ যায়, তবে সাহিত্য সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া শক্তি সঞ্চালন করে। একটা জাতির, জাতীয় সাহিত্য—যাহার অপর নাম জাতীয় জীবন,—সংগঠন কল্পে এক শতাব্দ বা দুই শতাব্দ কাল কিছুই নহে। অতএব আড়াই দিন মধ্যে, বাঙ্গালা সাহিত্য, তাহার এই অপরিপুষ্ট ও অভুক্ত অবস্থায় বাঙ্গালাকে বিশ্ব-বিজয়ী বীর করিয়া তুলিতে পারে নাই বলিয়া, ইংরেজীর এ, বি, সি,র সহিত একীভূত হইতে যাওয়া,অসহিষ্ণুতা ও আত্ম বিড়ম্বনা বই আর কি হইতে পারে? তবে, বাঙ্গালীর ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের কি আবশ্যকতা ও উপযোগীতা নাই? নিশ্চয়ই আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সংগঠন কল্পে,জ্ঞান বিজ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য উহা যে পরিমাণে প্রয়োজন, সেই পরিমাণেই উহার অধিকতর ও শ্রেষ্ঠতর উপযোগিতা। সে হিসাবে, অন্যান্য য়ুরোপীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ফরাশী সাহিত্য ও জর্ম্মণ সাহিত্যানুশীলনের আবশ্যকতা আছে।

ফলতঃ জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি ব্যতীত জাতীয় শক্তি সৃষ্ট ও সঞ্চিত হইবে না। তাহা না হইলে জাতীয় উন্নতি আকাশ-কুসুম। পাঁচ রেজিমেণ্ট ফৌজ অপেক্ষা একটা জাতীয় সঙ্গীতের শক্তি শত গুণ অধিক। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, সাহিত্য পদার্থটী কিরূপ পরাক্রমশালী। যাঁহারা বলিবেন, নাটক, নবেল, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ন্যায় নীতির, পোলিটিকেল প্রিভিলেজের সহিত সম্বন্ধ কি, কংগ্রেস, কটন-টেক্স, ফ্যামিন রিলিফ, বা লোকাল সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট বা কাউন্সিল অ্যাক্টের সহিত সংশ্রব কি? তাঁহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা। তাঁহারা কৃতী ব্যক্তি হইলেও কৃপার পাত্র। তবে, এস্থলে কেবল এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, অনবরত ইংরেজীতে চিৎকার করিলেই যে ইংরেজ আমাদিগকে ইংরেজোচিত রাজনৈতিক সত্বাধিকার বা বৃটিস্ সিটিজেন সিপ, দিবেন, অথবা এদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া যাইবেন; এরূপ মনে করাই বাতুলতা। শৈশব বাঙ্গালা সাহিত্য ত আমাদিগকে রাজদ্বারে সফলকাম করিতে পারে নাই। কিন্তু এত কাল ত ইংরেজী চীৎকার চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেই বা কি তেমন সিদ্ধি লাভ হইয়াছে? অধিকারও বাড়ে নাই; অত্যাচরও যতটুকু হইবার, হইতেছে। তথাচ দেশের দুঃখ ইংরেজীতে লিখিয়া ইংরেজ শিবিরে পাঠাইবার যথেষ্ঠ প্রয়োজন আছে, ইহা শতবার স্বীকার করি। কিন্তু, তজ্জন্য স্বজাতীয় মানসিক শক্তির সবটুকু বা অধিকটুকু ব্যয় করা, অপব্যয় ও অপচয় বলিয়াই বিবেচনা করি। উহা, শিকি পয়সার পুঁই শাকের প্রলোভনে, ইহকাল পরকাল নষ্ট করারই মত। উহাতে পুণ্য অপেক্ষা প্রত্যশয়ই অধিক। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা তৎতুল্য ব্যক্তি আজীবন ইংরেজী সংবাদ পত্র লেখাতে যতটা না পুণ্য, তাহার বেশীর ভাগ পাপ। তদ্দ্বারা বৃটিশ রাজনীতির নিশ্চয়ই কিছু "নড় চড়" হয় না। কিন্তু, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত শক্তিশালী ও সাহিত্য-প্রেমিক লোক বাঙ্গালা সাহিত্যের সংগঠনে ব্রতী হইলে, সে সাহিত্য নিশ্চয়ই কিছু না কিছু অগ্রসর হয় এবং সেই পরিমাণে স্বদেশের ভবিষ্যত উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র বা শম্ভুচন্দ্র, নিত্য কোন জাতির মধ্যে জন্মেন না। শম্ভুচন্দ্রও যদি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বাঙ্গলা সাহিত্য ব্রত গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, কে বলিবে ঐ সাহিত্যের আজ আরও কিছু উন্নতি দেখা যাইত না? মুখোপাধ্যায়ের জীবনীকার, বেলজ্যাকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, প্রতিভাশালী যতই হউন, সংবাদপত্র সম্পাদকের রচনা বালুকার উপরেই লিখিত হয়। হায়! শম্ভুচন্দ্র বালুকা-রাশির উপরেই তাঁহার সরস লেখনা চালনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাও স্বদেশীয় বালুকা নহে, বিদেশীয় বালুকা।

পরন্তু, উপরোক্ত ইংরেজী-রাজনীতি ও বাঙ্গালা-সাহিত্য-প্রসঙ্গের আরও একটী অঙ্গ আছে। য়ুরোপীয় রাজনীতির অদ্যকার সর্ব্বোচ্চ শব্দ ও সর্ব্বময়ী-শক্তি ডেমোক্রেসী। রাজমুকুটও এখন তথায় ডেমোক্রেটিক উপাদানে নির্ম্মিত। পোলিটিক্যাল ডেমোক্রেসী ও সোস্যাল ডেমোক্রেসী উভয়ই এখন য়ুরোপের সাধনা; সাধনা শনৈঃ শনৈঃ সিদ্ধি-পথে ধাবিতা। কিন্তু, সোস্যাল ডেমোক্রেসী খাস য়ুরোপেই সচল নহে। উহা এদেশে আদৌ অসম্ভব। হিন্দুস্থান হিন্দু-বিবর্জ্জিত না হইলে, তথায় সামাজিক ডেমোক্রেসী কখনও টিকিবে

না। সে পরিণাম, হিন্দুজাতির বর্ণ-সঙ্করে ও জাতি-সঙ্করে অবনত হওয়ার পরিণাম, বোধ হয়, কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। সোস্তাল রিফর্ম্মার মহাশয়দেরও নহে,—আশা করি। তবে, ইংরেজ শাসনে, পোলিটিক্যাল ডেমোক্রেসী কিয়ৎপরিমাণে কখনও সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এঙ্গলো "ইণ্ডিয়ান বুরোক্রেসী"—যত বড়ই প্রবল হউক, ইংরেজ শাসনের মৌলিক প্রবণতা প্রধানতঃ ডেমোক্রেসীরই দিকে। আমরা কংগ্রেস করিয়া ও সংবাদপত্র লিখিয়া বোধ হয়, চাহিতেছিও তাই। ফলতঃ আমরা রাজনৈতিক উচ্চতর উদ্ধার ও অধিকার স্বরূপ কেবল তাহাই স্তায়ানুসারে চাহিতে পারি, এবং ইংরেজ শাসন তাহার সর্ব্বোচ্চ প্রসঙ্গ, তাহাই দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাহাই আমাদের political regeneration কিন্তু সমগ্র দেশ বা দেশের অধিকাংশ লোক ডেমোক্রেসীর জন্ত প্রস্তুত ও ডেমোক্রেসী গ্রহণের উপযুক্ত না হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাহা দিবেন না; দিতে পারেনই না। আমরা এখন ডেমোক্রেসীর নাম করিয়া চাহিতেছি, বাবুক্রেসী। ইংরেজ ডেমোক্রেসী দিবেন। কিন্তু বাবুক্রেসী দিবেন না। কথাটা কড়া হইল। কিন্তু সত্যগোপনের চেষ্টা করা বৃথা।

এখন কথা এই যে, জাতীয় সাহিত্যের শক্তি ব্যতীত কোনও জাতি ডেমোক্রেসীর যোগ্য হইতে পারে না। অতএব এ হিসাবেও দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ক্ষেত্র প্রস্তুত ও বীজ বপন না করিয়া শস্য ছেদন করিতে যাওয়া যেমন, আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনও হইতেছে প্রায় তদনুরূপ! আমরা ভোগের অগ্রেই প্রসাদের আকাঙ্ক্ষী হইয়াছি। সুতরাং তাহা প্রাপ্ত হইতেছি না।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মত সম্পূর্ণরূপে না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে ঐরূপ ছিল। অন্ততঃ পরিণত বয়সে ও পরিপক্ক বুদ্ধিতে কতকটা ঐরূপ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ডেমোক্রেসীর তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না।

সংবাদপত্র যে ভাষাতেই লিখিত হউক, জাতীয় জীবনের মূলে শক্তি সঞ্চিত না হইলে তাহার আন্দোলন আলোচনায় সবিশেষ ফল হয় না। এরূপ স্থলে ইংরেজী আওয়াজও ফাঁকা আওয়াজ, বাঙ্গালা আওয়াজও ফাঁকা আওয়াজ। কিন্তু সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-শক্তিতে জাতীয় জীবন জীবিত থাকিলে, সর্ব্বথা অন্য শক্তির আবশ্যক হয় না, ইংরেজী, ফারসীরও আবশ্যক হয় না, বাঙ্গালী নিরবচ্ছিন্ন বাঙ্গালা কথায় মনোভাব ব্যক্ত করিলেও ইংরেজ রাজা সাবধানে ও শ্রদ্ধা সহকারে তাহা শ্রবণ করিতে বাধ্য হন এবং আবশ্যক স্থলে বাঙ্গালাকে আপনারাই ইংরেজী করিয়া লন। তা, এখনও যদি একখানিও ইংরেজী পত্র আমাদের না থাকিত, সব পত্র গুলিই যদি বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত হইত, তাহা হইলে কি মনে কর, আমাদের স্বর ইংরেজ-শিবিরে আদৌ পৌঁছিত না? বোধ হয়, একটু বেশী বলের সঙ্গেই পৌঁছিত। তা একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখুন না, তাহাতে দেশ থাকে কিম্বা ডুবে। ইহা বোধ হয়, কাহারও অজ্ঞাত নহে যে, উপস্থিত ক্ষেত্রেও ইংরেজ রাজপুরুষ ইংরেজী অপেক্ষা ভার্ণকুলার পত্রের কথা অধিকতর সতর্কতার সহিত শ্রবণ করেন। কারণ এই যে, সে কথা জাতীয় তরুর জড় পর্য্যন্ত পৌঁছান সম্ভব। অতএব এদিক দিয়া দেখিলেও রাজনৈতিক আন্দোলন আলোচনায়, ইংরেজী অপেক্ষা আমাদের ভার্ণাকুলারেরই

উপযোগীতা অধিক। ইংরেজ আমাদের ইংরেজী দেখিতে ও আমাদের কথা ইংরেজীতে বুঝিতে চাহেন না; বুঝিতে চাহেন, যাহা বহুদূরস্পর্শী দেশের দিক্‌দিগন্তস্পর্শী; বুঝিতে চাহেন প্রজার প্রাণ; তাই ভার্নাকুলার ভাষায় তাহার নাড়ী টিপেন। ইহা ইংরেজ রাজনীতি তত্ত্বের আদ্য অক্ষর। আদ্য অক্ষরটাই আমরা অদ্যাবধি অনুধাবন করিলাম না; অথচ ইংরেজী লইয়া থাকিলাম; ইহা আরও আশ্চর্য্য।

শম্ভুচন্দ্র ইংরেজীকে বাঙ্গালীর "দ্বিতীয় ভার্নাকুলারে" পরিণত করাব কামনা করিতেন। বস্তুতই তিনি ইংরেজী সাহিত্য এমনি ভালবাসিতেন বটে। কোনও একটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ উপলক্ষে উপস্থিত প্রবন্ধের ক্ষুদ্র লেখক এক সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কিঞ্চিৎ মনোযোগ আকর্ষণ করে; এবং কোনও অনুরুদ্ধ বন্ধু (৺ অঘোরনাথ কুমার) কর্ত্তৃক সম্পাদক-সিংহের সমীপে নীত হন। সে ঘটনা, সে কথোপকথন মনোজ্ঞ হইলেও এ স্থলে বর্ণনীয় নয়। অনেক কথার পর লেখককে আদর ও অনুগ্রহ করিয়া শম্ভু বাবু বলিলেন; "তুমি কেন ইংরাজীতে লেখ না? বেশ হইবে তোমার; আমি স্বয়ং তোমাকে সহায়তা করিব।"

শম্ভু বাবু একবার লর্ড ডাফারিণকে লিখিয়াছিলেন;—

"আমার বন্ধুবা মনে করেন, য়ুরোপীয় সাহিত্য আমাকে "মাটী" করিয়াছে, কেন না, আমি ইহাতে বড় বিশ্বাস করি। তা আমার বন্ধুবর্গ ও পরিজনবর্গ, এই আত্মত্যাগের জন্য যতই অভিযোগ করুন,—এজন্য জীবনে আমি যতই অকৃতকার্য্য বা অযশ-ভাজন হই, আমি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট আছি।"

ইহা অপেক্ষা আন্তরিকতা ও অনুরাগ কি হইতে পারে? ইহা সরল প্রাণের সাধু উক্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

কলাশ্রী।

Fine Arts

হে দেবি,
　　তোমার মধুর হাসে
　　তুচ্ছ ম্লান ছিন্ন বাসে
চকিতে জাগিয়া উঠে নিদ্রিতা অপ্সরী!
　　আলুথালু কেশরাশ,
　　মুখে হাসি, চোখে ত্রাস,
লাজে টানে বক্ষবাস আজীবন ধরি।—
　　সেই চাঁদ আধ চায়,
　　সেই ফুল ঝরে গায়,
আলোকে আঁধারে সেই দূরে জড়াজড়ি।

　　তোমার কোমল স্পর্শে
　　পাষাণ মুঞ্জরে হর্ষে,
সহস্র চোখের পরে দাঁড়ায় রূপসী!
　　কিবা কম্বুকণ্ঠ-ঠাম,
　　কিবা উরু অভিরাম,
কি থর নিতম্বদাম—পড়ে বাস খসি।—
　　কোথা উষা চিরোজ্জ্বল,
　　কল্পতরু-ছায়াতল,
কোথা মন্দাকিনী-কূল-সলিল-আরসী!

　　তোমার করুণ শ্বাসে
　　কাঁদে প্রাণ কি উচ্ছ্বাসে!
বাঁচে স্নেহ মরে দেহ শুনে সে বাঁশরী।
　　সুর পায় কিবা সুর,
　　আশা ভাষা শতচূর,

মুগ্ধপ্রাণ দেবাসুর সুধাপান করি।—
ধরণী মমতা শিখে,
তারকা হৃদয়ে লিখে,
রমণী ত্বরিতে ছুটে ভরিতে গাগরী।

তোমার নয়ন-রাগে
কি নব বসন্ত জাগে,
মুঞ্জরিবা উঠে দেহ গুঞ্জরিয়া মন।
ক্ষুদ্র কথা তুচ্ছ মতি
লভে কি ত্বরিত গতি,
যেন মূলা পরাকৃতি বেড়ে ত্রিভুবন।
আপনি আপনে লিখে
চেয়ে থাকে অনিমিখে,
জগত চেতনা দিয়ে নিজে অচেতন।

২

তোমার প্রণয়-ছায়
মানবে ব্রহ্মত্ব পায়।
রাধা কাঁদে উভরায় না হেরে আমায়।
শকুন্তলা নিত্য আসি
হেরে মম রূপরাশি;
রত্নাবলী লতাফাঁসী গলে দিতে যায়।
মহাশ্বেতা আমা তরে
চির ব্রহ্মচর্য্য করে
সাবিত্রী আমায় ধরে যমেরে তাড়ায়।

তোমারি বিরহে কাঁদি
মেঘে আমি কত সাধি,
খুঁজি কত পদ্মবন ডাকি দেবগণে।
চাঁদে ফিরে ফিরে চাই,
মলয়ে নিশ্বাস পাই,
বাহুভ্রমে ছুটে যাই লতা-আলিঙ্গনে।
শক্রধনু হেরি ক্রোধে
ধরি ধনু দৈত্যবোধে,
অর্দ্ধবস্ত্র শনিগ্রস্ত ভ্রমি বনে বনে।

মূর্চ্ছান্তে চমকি চাই—
বায়ু বলে নাই নাই,
পতিনিন্দা শোকে সতী ত্যজেছে ভূতল!
স্কন্ধে ল'য়ে মৃতদেহে
বুকে ল'য়ে স্মৃতিস্নেহে
ভবেশ শ্মশানগেহে উন্মত্ত পাগল!
কালের কুটিল দিঠে
পড়ে অঙ্গ পীঠে পীঠে,
প্রিয়প্রেমে প্রিয়া তুমি দেবশীর্ষস্থল!

বিরচি সমাধিবাস—
সুধু অহেতুক আশ,
জীবন সর্ব্বস্ব-তীর্থে স্বপন সম্বল!
শ্বাসে অশ্রুজলে ভরা,
স্মৃতি-কারুকার্য্য-করা—
তোমারি প্রীত্যর্থে গড়া 'মমতা মহল!'
চারিদিক বেড়ি বেড়ি
ঘুরে তব ছায়া-চেড়ি,
জীবনে বিদ্রুপ করি মরণে উজ্জ্বল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সিরাজ ও ইংরাজ।

সিরাজের রক্তপাতে বাঙ্গালায় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা হয়। ইংরাজগণ বলিয়া থাকেন যে, সিরাজের অত্যাচারে সমস্ত বাঙ্গালা রাজ্য জর্জ্জরিত হইয়াছিল, সেইজন্য তাঁহারা তাহার হস্ত হইতে বঙ্গরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিলনা। সিরাজ যদি বঙ্গদেশ হইতে ইংরেজ-ক্ষমতা নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা না করি-

তেন, তাহা হইলে ইংরেজগণের উক্ত সাধু উদ্দেশ্য সাধারণের কতদূর বোধগম্য হইত, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ। আমরা জানি যে, ইংরাজ-বণিকের ক্ষমতা বৃদ্ধির ও রাজ্য-লালসার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মহা বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই রাজ্য লালসা অনেক দিন হইতে তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে, যৎকালে সাহানসাহ আরঙ্গজেব বাদসাহ ভারতের একছত্র অধীশ্বর, সেই সময়ে ইংরাজেরা একবার বাঙ্গলারাজ্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তখন হুগলীতে তাঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল; কলিকাতার স্থাপনাই হয় নাই। নবাব সায়েস্তাখাঁ তাঁহাদের ধৃষ্টতার কথা শুনিয়া ইংরাজ বণিকদিগকে অৰ্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিদায় করিতে হুগলীর ফৌজদারের প্রতি আদেশ দেন। হুগলীর ইংরাজ অধ্যক্ষ জব চার্ণক পলাইয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা করেন। সুতরাং অনেক দিন হইতে তাঁহাদের হৃদয়ে যে রাজ্যলালসার উদয় হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবাব আলিবর্দ্দিখাঁ তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে চিনিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি মৃত্যুকালে সিরাজকে উপদেশ দিয়া যান যে,—

"ইংরাজদিগের ক্ষমতার যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে প্রথমে দমন করা কর্ত্তব্য। ইংরাজদিগকে দমন করিতে পারিলে অন্যান্য ইউরোপীয়দিগকে দমন করিতে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। তাহাদিগকে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে বা সৈন্য রাখিতে দিবে না। একরূপ করিলে, তোমার রাজ্য থাকিবে না। ঈশ্বর আমাকে আরও কিছু দিন জীবিত রাখিলে, আমি তোমাকে নিরাপদ করিয়া যাইতাম, এক্ষণে সমস্তই তোমাকেই করিতে হইবে। ফলতঃ ইংরাজদিগকে দমন করিতে বিশেষ রূপ চেষ্টা করিবে। তাহাদের অভিসন্ধি দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তোমার রাজ্যে বিশেষ অনর্থ উপস্থিত হইবে। সম্প্রতি তাহারা নানা রাজ্য অধিকার করিয়া অনেক ধন সম্পত্তি লাভ করিয়াছে, এবং তোমার রাজ্যেও তাহাই করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তাহারা ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করে না, কিন্তু অর্থের জন্যই করিয়া থাকে, এবং তাহাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সমস্ত ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে বিপুল ধনের অধিকারী করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছে, এবং আপনাদিগের রাজাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ আছে, এই ছল করিয়া, ভারত সাম্রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক ভারতবাসিগণের অর্থ নিজেরাই বিভাগ করিয়া লইতেছে। রাজ্য ও অর্থ-লালসা খ্রীষ্টানদিগের অন্তরের সার পদার্থ, এবং তাহারা সমস্ত প্রাচ্যজগতে প্রকাশ করিতেছে যে, তাহারা ঈশ্বরের অনুশাসন আদৌ গ্রাহ্য করে না, প্রত্যাদেশ-জনিত অনন্ত জীবন ও আত্মার অমরত্বে তাহাদের বিশ্বাস নাই। তাহাদের সমস্ত কার্য্যই সাধু উদ্দেশ্যের বিপরীত। ইংরাজদিগকে দাসাধিদাসের ন্যায় করিয়া রাখিবে, এবং কদাচ তাহাদিগকে কুঠী করিতে বা সৈন্য রাখিতে দিবে না। যদি তুমি তাহাদিগকে সেরূপ অনুমতি দেও, তাহা হইলে তোমার রাজ্য তাহাদেরই হইবে। যাহারা আপনাদিগের কথিত ঐশী নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিদিন কেবলই কূটনীতি ও ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক দমন করাই কর্ত্তব্য।" *

আলিবর্দ্দির এইরূপ উপদেশ পাইয়াই সিরাজ ইংরেজদিগকে দমন করিতে কৃতসংকল্প

"* * * * Love of dominion, and gold, hath laid fast hold of the souls of the Christians, and their actions have proclaimed, over all the East, how little they regard the express precepts they have received from gold. They believe not that life and immortality which is brought to light by their revelation. They act in defiance of the good principles they would pretend to believe. My son, reduce the English to the condition of slaves, and suffer them not to have factories or soldiers; if you do, the country will be theirs, not yours. They who, we see, are every day using all their policy, and their power, against what they themselves say is law of the Most High, are only to be restrained by force." (An Enquiry into our National conduct to other countries.)

হন, এবং ইহাই তাঁহার ইংরাজ-বিদ্বেষের প্রধান কারণ। আলিবর্দ্দির উপদেশ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি ইংরাজদিগের রাজ্য-লালসা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কয়েকটী ঘটনা-লইয়া সিরাজের সহিত ইংরাজদিগের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। সিরাজের মাতৃস্বসা ও জ্যেষ্ঠতাত পত্নী ঘেসেটী বেগম বরাবরই সিরাজকে হিংসার চক্ষে দেখিতেন। সিরাজ যাহাতে সিংহাসনে বসিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের দ্বারা তিনি কাশীমবাজার ইংরাজ-কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স সাহেবের সহিত পরামর্শ আঁটিতে থাকেন। সিরাজ আলিবর্দ্দিকে সে কথা জানান। আলিবর্দ্দি মৃত্যুর পূর্ব্বে কাশীমবাজার কুঠীর সার্জ্জন ফোর্থ সাহেবকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু সিরাজ তাহার প্রমাণসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে আলিবর্দ্দির মৃত্যু হইল। সিরাজ মসনদে বসিয়া প্রথমে মতিঝিলের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া ঘেসেটী বেগমকে বন্দী করেন। ইহার পূর্ব্বেই রাজা রাজবল্লভ-পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে সপরিবারে কলিকাতায় ইংরাজদের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দেন। সিরাজ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণের জন্য এক্ষণে নারায়ণসিংহ নামে আপনার হরকরাকে কলিকাতায় পাঠান, এবং ইংরাজদিগকে নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ ও পুরাতন দুর্গের সংস্কার করিতে নিষেধ করেন। নারায়ণসিংহ ছদ্মবেশে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া, ইংরাজেরা তাঁহার নিকট হইতে নবাবের পরওয়ানা গ্রহণ করেন নাই, ও তাঁহাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন। *

ইংরাজদিগের এইরূপ ব্যবহারে সিরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি আলিবর্দ্দির উপদেশ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলেন। তিনি একদল সৈন্যকে কাশীমবাজার অবরোধ করিতে পাঠাইলেন, ও ওয়াট্‌স প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। তাহার পর নিজে কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা অবরোধ করেন। তাঁহার কর্ম্মচারীগণের অনবধানতায় অন্ধকূপ হত্যার ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হইল। কিন্তু ইহাতে সিরাজের কিছুমাত্র দোষ ছিল না। তবে তিনি সেই কর্ম্মচারীদিগকে তজ্জন্য দণ্ডিত করেন নাই বলিয়া যদি দোষ করিয়া থাকেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা। সভ্যজগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে সকল সিবিলিয়ান লোকের প্রতি অত্যাচার করে, তাহাদের পদোন্নতি ব্যতীত কখনও অবনতি দেখিতে পাইলাম না। কলিকাতা আক্রমণে গবর্ণর ড্রেক ঊর্দ্ধপুচ্ছে পলায়ন করিলেন। হলওয়েল অন্ধকূপ হইতে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি পাইয়া বন্দীভাবে মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। পথে সৈদাবাদ-ফরাসডাঙ্গার অধ্যক্ষ ল সাহেব ভদ্র ব্যবহারের সহিত তাঁহাদিগকে খাবার ও পোষাকাদি দিলেন। কিন্তু অবশেষে এই ল সাহেবকে বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত করিয়া ইংরেজেরা তাঁহার প্রতিও কৃতজ্ঞতা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। মুর্শিদাবাদে কয়েকদিন অবস্থান করার পর, সিরাজের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা সিরাজকে তাঁহাদের দুরবস্থার কথা জানাইলেন। সিরাজ তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন, এবং তাঁহাদিগকে যথেচ্ছ গমন করিতেও অনুমতি দেন। হলওয়েল নিজেই একথা

* Holwell's India Tracts P. 185

লিখিয়া গিয়াছেন। * কলিকাতা আক্রমণের সময় সিরাজ কৃষ্ণবল্লভকেও নাকি খেলাত প্রদান করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা কলিকাতা হইতে পলাইয়া ফল্‌তায় অবস্থিতি করিতে থাকেন, এবং নবাবের ক্রোধ শান্তির জন্য আমীন চাঁদের (উমিচাঁদ) দ্বারা জগৎ শেঠের নিকট পত্রাদি প্রেরণ করেন। ওলন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় কুঠীর অধ্যক্ষদিগের জামিনে কাশীমবাজারের ইংরাজদিগের অনেকে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার দুরবস্থার কথা মান্দ্রাজে পৌঁছিলে কর্ণেল ক্লাইব ও আডমিরাল ওয়াটসন ইংরাজদিগের উদ্ধার সাধনে তথা হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বর ফল্‌তায় আসিয়া পলায়িত ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হন। ফল্‌তা হইতে ওয়াটসন নবাবের সহিত পত্র চালাইতে লাগিলেন। প্রথম পত্র তিনি এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠাইলেন ;—

"ইংলণ্ডাধিপ, যাঁহাকে জগতের যাবতীয় ভূপতিবৃন্দ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আমাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ও স্বত্বাধিকার রক্ষার জন্য এতদঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন। ইংরেজদিগের বাণিজ্য হইতে মোগল সাম্রাজ্যে কিরূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনি উক্ত কোম্পানীর কুঠীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে বিতাড়িত ও অনেক ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছেন, এবং ইংলণ্ডাধিপের অনেক প্রজাকে নিহত করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদিগের আপনাপন কুঠীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। এবং আশা করি আপনি তাহাদিগের পূর্ব্ব সত্ত্ব ও স্বাধীনতা প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হইবেন না। ইংরেজেরা বঙ্গদেশে অবস্থান করায় আপনার রাজ্যের কিরূপ উপকার হইতেছে, তাহা আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন। সুতরাং আপনার আক্রমণে তাহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, আশা করি, আপনি সে সমুদায়ের পূরণ করিয়া, সমস্ত গোলযোগের অবসান ও ইংলণ্ডাধিপের বন্ধুত্ব লাভ করিবেন। ইংলণ্ডেশ্বর শান্তির পক্ষপাতী। তিনি ন্যায়কার্য্যেই আনন্দ লাভ করেন। ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বলিতে পারি।' *

* "When the Soubah came in sight, we made him the usual salam ; and when he came abreast of us, he ordered his litter to stop, and us to be called to him. We advanced ; and I addressed him in a short speech, setting forth our sufferings, and petitioned for our liberty. The wretched spectacle we made must, I think have made an impression on a breast the most brutal ; and, if he was capable of pity or contrition, his heart felt it then. I think it appeared, in spite of him, in his countenance. He gave me no reply, but ordered a sutapudar and chabdar immediately to see our irons cut off, and to conduct us wherever we chose to go, and to take care, we received no trouble nor insult ; and having repeated this order distinctly, directed his retinue to go on." (Hollwell's India Tracts)

*"Admiral Charles Watson, the great commander of the fleet belonging to the puissant king of Great Britain, irresistible in battle, to Munserool Mulk Serajah Dowlah, Subahdar of the provinces of Bengal, Behar and Orissa.

The king my master (whose name is revered among the monarchs of the world) sent me to these parts with a great fleet to protect the East India company's trade, rights and privileges, the advantages resulting to the Mogul's dominions from the extensive commerce carried on by my master's subjects, are too apparent to need enumerating how great was my surprise therefore to hear that you had marched against the said company's factories with a large army, and forcibly expelled their servants, seized and plundered their effects, amounting to a large sum of money, and killed great numbers of the king my master's subjects.

I am come down to Bengal to re-establish the said company's servants in their former factories and houses, and hope to find you willing to restore to them their ancient rights and immunities. As you must be sensible of the benefit of having the English settled in your country, I

ক্লাইব সাহেবও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—

"আডমিরাল ওয়াটসন ও আমি বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছি। আমার দাক্ষিণাত্যের বিজয়বার্ত্তা বোধ করি আপনার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। আপনি ইংরাজদিগের যে সমস্ত ক্ষতি করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধের জন্য আমাদের এখানে উপস্থিতি। যদি আপনি ন্যায় প্রীতি দেখাইতে চান, তাহা হইলে ইংরাজদিগের ক্ষতির যথোপযুক্ত পূরণ করিয়া আপনার রাজ্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা হইতে রক্ষা করিবেন।"

ইংরেজেরা বলেন যে, নবাব আডমিরালের প্রথম পত্রের উত্তর দেন নাই, নবাব বলেন যে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইংরেজেরা তাহা পান নাই। কিন্তু নবাবের পত্রের জন্য তাঁহারা অপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ওয়াটসনের পত্র পাঠাইবার ১০দিন পরে তাঁহারা ফল্‌তা হইতে কলিকাতাভিমুখে রওনা হন। ফল্‌তা হইতে মুর্শিদাবাদে সেকালে রাজনীতি সংক্রান্ত পত্র পঁহুছিয়া তাহার উত্তর আসার পক্ষে ১০ দিন যথেষ্ট সময় কিনা, তাহা সাধারণে বিবেচনা করিবেন। কলিকাতার দিকে যাত্রা করিয়া, পথিমধ্যে বজবজে নবাবের একটা দুর্গ ছিল, ইংরাজেরা তাহার উপর গোলাগুলি চালাইতে লাগিলেন। একটা গুলি নাকি মাণিকর্চাঁদের উষ্ণীষের নিকট দিয়া যাওয়ায় তিনি যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করেন, ও দুর্গ ইংরাজদিগের অধিকারে আইসে। কলিকাতার কিছুদূর হইতে ক্লাইব স্থলপথে ও ওয়াটসন জলপথে কেণ্ট ও টাইগার নামে দুইখানি জাহাজ লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২রা জানুয়ারি ২ঘণ্টা ক্রমাগত গোলাবর্ষণের পর কলিকাতা পুনরধিকৃত হইল। তাহার পর তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় তাঁহারা হুগলী অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। ১০ই জানুয়ারি হুগলী অধিকৃত হয়। হুগলীর নিকট যে সমস্ত শস্যের গোলা ছিল, সে সকলে অগ্নি প্রদান করিয়া ইংরাজেরা উদারতার পরিচয় দেখাইলেন! ইহার পর নবাব ২৩এ জানুয়ারি আডমিরালকে এইরূপ সর্ত্তে এক পত্র লিখিলেন :—

"আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনার প্রভু ইংলণ্ডাধিপ কোম্পানীর বাণিজ্য ও সত্ত্বাধিকারের জন্য আপনাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন। আমি আপনার পত্র পাইবা মাত্র তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে বোধ হইতেছে, আপনি সে পত্র প্রাপ্ত হন নাই। সেই জন্য আমি পুনর্ব্বার লিখিতেছি। আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, কোম্পানীর বাঙ্গলার অধ্যক্ষ রজার ড্রেক আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ ও আমার ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে। রাজ্যের যে সমস্ত প্রজারা দরবারে উপস্থিত না হইয়া পলায়ন করিয়াছে, ড্রেক তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, এবং আমার নিষেধ গ্রাহ্য করে নাই। সেই জন্য আমি তাহাকে শাস্তি দিতে মনঃস্থ করিয়াছিলাম, ও আমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি। যদি কোম্পানী ড্রেক ভিন্ন আর কাহাকে অধ্যক্ষ স্বরূপ প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমি ইংরাজদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিতে পারি। এই সকল প্রদেশের অধিবাসিগণের মঙ্গলের জন্য আমি এই পত্র পাঠাইতেছি। যদি আপনারা কোম্পানীর বাণিজ্য পুনঃ প্রচলনের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অন্য একজন অধ্যক্ষ পাঠাইবেন, ও পূর্ব্বসর্ত্তানুযায়ী বাণিজ্য চালাইতে স্বীকৃত হইবেন।

---

doubt not you will consent to make them a reasonable satisfaction for the losses and injuries they have suffered, and by that means put an amicable end to the troubles, and secure the friendship of my king, who is a lover of peace, and delights in acts of equity. What can I say more?"

From on board his Britanic Majesty's ship-kent at Falta, the 17th Dec. 1756. (Ives's Voyage P. 98.)

যদি ইংরেজেরা বণিকের ন্যায় ব্যবহার করে ও আমার আদেশ প্রতিপালন করে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় রক্ষা ও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। যদি আপনারা মনে করেন, আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমার রাজ্যে কোম্পানীর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহা হইলে আপনাদিগের যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহা করিতে পারেন।" *

২৭শে জানুয়ারি ওয়াটসন এইরূপ উত্তর পাঠান যে, "অদ্য আপনার ২৩এ তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি পূর্ব্বে পত্র লিখিয়াছিলেন শুনিয়া সুখী হইলাম, আমাদিগের পত্রের উত্তর না দিলে আমাদিগের একপ অপমান করা হইত যে, তাহাতে আমার প্রভু ইংলণ্ডাধিপের ক্রোধ হইতে পারিত। আপনি লিখিয়াছেন যে, রজার ড্রেকের জন্যই আপনি ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। কিন্তু নৃপতিগণ নিজের চক্ষে না দেখায় ও নিজের কর্ণে না শুনায়, বঞ্চক ও দুষ্ট লোকের দ্বারা অনেক সময়ে মিথ্যা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। একজনের জন্য বহু সংখ্যক লোকের দুর্দ্দশা করা কি কোন ন্যায়পর ভূপতির কার্য্য? যাহারা বাদসাহের ফারমানানুযায়ী আপনাকে তাহাদিগের ও তাহাদিগের সম্পত্তির রক্ষক স্বরূপ বিবেচনা করিয়াছিল, সেই ইংরাজদিগের প্রতি একপ অত্যাচার করা কি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে? এই সমস্ত কাণ্ড কতকগুলি হিংসাপর লোকের মতলব সিদ্ধির জন্য আপনি মিথ্যা রূপে জ্ঞাত হইয়া সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি আপনি ন্যায়পর ভূপতির ন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত দুষ্ট লোকদিগকে শাস্তি দেন ও কোম্পানীর ক্ষতিপূরণ করন। ড্রেকের প্রতি যদি আপনার কোন বিদ্বেষের কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রভু কোম্পানীকে সে কথা লিখিয়া পাঠান।' ইত্যাদি

এই পত্রের লিখনভঙ্গিতে এবং হুগলী অধিকারে নবাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজদিগের অভিসন্ধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, ও ওয়াটসনকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন,—

'আপনারা হুগলী অধিকার ও লুণ্ঠন করিয়াছেন, এবং আমার প্রজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, ইহা কদাচ বণিকদিগের উপযুক্ত কার্য্য নহে। আমি সেই জন্য মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া হুগলীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আমি সসৈন্যে নদী পার হইতে চেষ্টা করিতেছি, আমার সৈন্যের একাংশ আপনাদিগের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। যদি আপনাদিগের পূর্ব্বের ন্যায় কোম্পানির বাণিজ্য প্রচলনের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, আপনাদিগের বিশ্বাসী কোন লোককে আপনাদিগের প্রস্তাব জ্ঞাত করাইয়া আমার নিকট পাঠাইবেন। আমি কোম্পানির কুঠি

---

* "You write me, that the king your master sent you into India to protect the company's settlements, trade, rights, and privileges the instant I received that letter, I sent you an answer, but it appears to me that my reply never reached you, for which reason I write again I must inform you that Roger Drake, the company's chief in Bengal, acted contrary to the orders I sent him, and encroached upon my authority He gave protection to the king's subjects, who absented themselves from the inspection of the Durbar, which practice I did forbid, but to no purpose On this account I was determined to punish him, and accordingly expelled him from my country But it was my inclination to have given the English company permission to have carried of their trade as formerly, had another chief been sent here For the good therefore of these provinces, and the inhabitants, I send you this letter, and if you are inclined to re-establish the company, only appoint a chief, and you may depend upon my giving currency to their commerce, upon the same terms they heretofore enjoyed: If the English behave themselves like merchants, and follow my orders, they may rest assured of my favour, protection and assistance.

If you imagine that by carrying on a war against me, you can establish a trade in these dominions, you may do as you think fit (শেষ প্যারাগ্রাফ নবাব নিজ হস্তে লিখিয়াছিলেন)।

The slave of Allam gaeer, king of Industan, the mighty Conqueror, the Lamp of Riches, Shatkuly Khan, the most valiant among warriors"

সকলের পুনঃস্থাপনা, এবং তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিতে ইতস্ততঃ করিব না। যদি ইংরেজেরা এদেশে অবস্থান করিয়া বণিকের ন্যায় ব্যবহার করে, আমার আদেশ মান্য করে ও আমাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়, তাহা হইলে আমি, তাহাদিগের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারি। আপনারা জ্ঞাত আছেন যে, সৈন্যদিগকে লুণ্ঠন-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করা কষ্টকর। সেইজন্য আপনারা আপনাদিগের ক্ষতির কতকাংশ যদি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি সে বিষয়ে বিশেষরূপ চেষ্টা করিব। আমি আপনাদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিতে ও ভবিষ্যতে সদ্ভাবে কাটাইতেই ইচ্ছা করি। আপনারা খ্রীষ্টান, আপনারা অবগত আছেন যে, বিবাদ প্রজ্বলিত রাখা অপেক্ষা নির্ব্বাপিত করাই মঙ্গল। তবে যদি আপনারা যুদ্ধের ইচ্ছা করিয়া কোম্পানীর সমস্ত সুবিধা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, ও অন্যান্য বণিকদিগের কল্যাণ নষ্ট করিতে চান, তাহা হইলে সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। আমি সেই সর্ব্ব ধ্বংসকর যুদ্ধের ভয়াবহ ফল নিবারণের জন্য এই পত্র লিখিতেছি।"

নবাবের সসৈন্যে আগমন শুনিয়া ইংরেজেরা প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন। ক্লাইব সেই সময়ে কাশীপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করেন। ইংরাজেরা নবাবের পত্রানুসারে ওয়াল্‌শ ও স্ক্রাফটন সাহেবকে নবাবের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহারা নবাবগঞ্জ নামক স্থানে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রেরিত হন। কিন্তু তাহারা তথায় পঁহুছিতে না পঁহুছিতে,নবাব সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ৩রা ফেব্রুয়ারি কলিকাতার মাইট্টা-খাদের নিকট আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তথায় নবাবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে দেওয়ানের তাম্বুতে যাইতে বলেন। দেওয়ানের তাম্বুতে যাইবার সময় আমীনচাঁদ নাকি তাঁহাদিগকে বলিয়া দেয় যে, পলায়ন কর,নতুবা বন্দী হইবে। তাঁহারা সেই কথা শুনিয়াই প্রস্থান করিলেন। * কিন্তু একথার সত্যমিথ্যা কে বলিতে পারে? এই আমীনচাঁদকে ইংরেজেরা এককালে লাঞ্ছনার চূড়ান্ত করিয়াছিলেন, তিনি আবার তাঁহাদের পরমহিতৈষী হইয়া দাঁড়াইলেন, ও নবাবের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইলেন। এইখান হইতে সিরাজের বিরুদ্ধের ষড়যন্ত্রের একরূপ সূত্রপাত হইল। ওয়ালশ্‌ ও স্ক্রাফটন পলায়ন করিলে, ক্লাইব সহসা নবাবের শিবির আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়া, রাত্রিযোগে সৈন্য লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হওয়ায়, ক্লাইবকে কিছু কষ্ট পাইতে হয়, তিনি সেই কুজ্ঝটিকার মধ্যে সহসা নবাবের শিবির আক্রমণ করিয়া বসিলেন। নবাব এই অকস্মাৎ আক্রমণে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। নিকটে ষড়যন্ত্রকারীরা সুযোগ অন্বেষণ করিয়াছিল, অমনি তাঁহাকে আরও ভয় দেখাইয়া শেষে সন্ধি করিতে প্রবৃত্তি প্রদান করিল। ৯ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজদিগের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি হইল :—

(১) দিল্লীর বাদসহ ইংরাজ কোম্পানীকে যে সমস্ত অধিকার দিয়াছেন, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং তাঁহারা বাদসাহের ফার্ম্মানানুযায়ী যে সমস্ত গ্রাম পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদেরই রহিবে।

(২) ইংরাজদিগের দস্তক লইয়া বাঙ্গালা, বিহার,উড়িষ্যার সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে মালামাল যাতায়াত করিতে পারিবে।

(৩) নবাবের অধিকৃত কোম্পানীর কুঠী সকল ফেরত দিতে হইবে ও কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের যে সকল মালামাল বাজে-

* Orme's Industan. (Madras Reprint) vol II P. 131

প্রাপ্ত করা হইয়াছে, তাহাও ফেরত দিতে হইবে এবং তাহাদের লোকের যে সকল সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, সে সমস্ত বিবেচনা মত দিতে হইবে।

(৪) দুর্গাদি নির্ম্মাণের দ্বারা কলিকাতা সুদৃঢ় করায়, নবাব কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিবেন না।

(৫) মুর্শিদাবাদের টাঁকশালের মুদ্রার ন্যায় ইংরাজেরা কলিকাতায় মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন, সেই সকল মুদ্রা প্রচলনের জন্য তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বাটা দিতে হইবে না।

(৬) নবাব ঈশ্বর ও মহম্মদের নামে ইহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী-দিগকেও করিতে হইবে।

(৭) আডমিরাল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইব ইংরেজ জাতির ও কোম্পানীর পক্ষ হইয়া নবাবকে সমস্ত উৎপাত হইতে অব্যাহতি দিবেন, ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিবেন।

কলিকাতার গবর্ণর ও কাউন্সিলও এক স্বীকারপত্রী লিখিয়া দিলেন, তাহাতে এই রূপ লিখিত হইল যে, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসায় চালাইবেন, নবাবকে বিরক্ত করিবেন না, তাঁহার বিরুদ্ধের কোন লোক বা চোর ডাকাতদিগকে স্থান দিবেন না ও সন্ধি-পত্রানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিবেন।

১২ই ফেব্রুয়ারি ক্লাইব নিজেও এই মর্ম্মে এক স্বীকারপত্রী লিখিয়াছিলেন।

"আমি কর্ণেল ক্লাইব, সাবৎজঙ্গ বাহাদুর বাঙ্গালার ইংরেজ স্থল সৈন্যগণের অধ্যক্ষ, ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের সমক্ষে এইরূপ গুরু প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা ও ইংরাজদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। নবাবের সহিত সন্ধির যে সমস্ত সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইংরেজেরা তাহা অলঙ্ঘনীয়ভাবে প্রতিপালন করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ সন্ধির বন্দোবস্ত থাকিবে, ইংরেজেরা ততদিন নবাবের শত্রুদিগকে আপনাদিগের শত্রুর ন্যায় বিবেচনা করিবে, এবং যখনই আবশ্যক হইবে, তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে।'

এইরূপে সন্ধির বিষয়ে সমস্ত স্থিরীকৃত হইলে, নবাব আডমিরাল, গবর্ণর ও কর্ণেলকে এক একটী হস্তী, খেলাত ও শিরস্ত্রানের মণি প্রভৃতি উপহার পাঠাইলেন। ওয়াটসন ইংলণ্ডাধিপের প্রতিনিধি হওয়ায়, সে উপহার প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর নবাব মুর্সিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হন।

নবাবের সহিত সন্ধি করিয়া নীরবে অবস্থিতি করিতে ক্লাইবের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি নানা কারণে সিরাজউদ্দৌলার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে নবাবের সর্ব্বনাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসী উভয়ের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতেছিল। উভয়েই ভারতীয় নৃপতিবর্গকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া আপনাদিগের রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা করিতেছিল। উভয়েই আবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্লাইব দাক্ষিণাত্যে অনেকবার ফরাসীদিগের উপর বিজয় লাভ করেন। তিনি অবগত হইলেন যে, ফরাসীগণ নবাবের কৃপার প্রার্থী হওয়ায়, নবাব তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন ও সময়ে সময়ে তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেইজন্য তিনি বাঙ্গালার ফরাসীদিগকে প্রথমে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইউরোপে উভয় জাতির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এই ছল করিয়া তিনি চন্দননগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। ইংরেজদিগের মনোভাব অবগত হইয়া ফরাসীরাও সতর্ক হইতে আরম্ভ করে এবং দাক্ষিণাত্য হইতে

তাহাদিগের সাহায্যের জন্য একদল সৈন্য যুদ্ধ-জাহাজে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়। আডমিরাল ওয়াটসন নবাবকে চতুরতা পূর্ব্বক লিখিলেন যে, বুসীর অধীন ফরাসী সৈন্যেরা আমাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য এদেশে আসিতেছে, সুতরাং আমাদিগকে তাহার বাধা প্রদান করিতে হইবে! ক্রমে তাঁহারা চন্দননগর আক্রমণের আয়োজন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নবাবের রাজ্যেও উৎপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবাব তাঁহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আডমিরালকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

"আমার রাজ্যের সমুদায় বিবাদ বিসম্বাদ নিবৃত্তির জন্য আমি আপনাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছি, আপনারা স্বাক্ষর ও মোহর সহিত স্বীকার পত্র লিখিয়া দিয়াছেন যে, আমার রাজ্যের শান্তি নষ্ট করিবেন না। কিন্তু এক্ষণে শুনিতেছি, আপনারা হুগলীর নিকটস্থ ফরাসী কুঠী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনারা আমার রাজ্য মধ্যে যে পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ করিবেন,ইহা নিয়ম ও আচার বিরুদ্ধ। তৈমুরের সময় হইতে মোগলসাম্রাজ্যে ইউরোপীয়গণের এক জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। যদি আপনারা ফরাসীদিগকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে রাজ্যের শান্তি রক্ষার জন্য আমাকে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি যে,আমাদিগের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপনা হইয়াছে, আপনারা তাহা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা অনেকবার বঙ্গরাজ্যে উৎপাত করে। কিন্তু তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনার পর তাহারা রাজ্যমধ্যে আর কোন রূপ গোলযোগ করে নাই। আমি ঈশ্বরাদেশে সন্ধি পত্রের সত্ত্ব রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি, এবং আশা করি আপনারাও সে সমস্ত পালন করিতে ন্যায় মনে করিবেন ও আমার রাজ্যমধ্যে কোন ইউরোপীয় জাতির সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিবেন না।"

ইংরাজেরা নবাবের কথায় তাদৃশ মনোযোগ করিলেন না। তাঁহারা নানারূপ চতুরতা করিতে লাগিলেন। ওয়াটসন লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ফরাসীরা যদি আমাদিগের সহিত কোনরূপ বিবাদ না করে ও স্থিরভাবে অবস্থান করিতে স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দেয় এবং আপনি বাঙ্গালার সুবেদার স্বরূপ জামিন হন, তাহা হইলে আমরা চন্দন নগর আক্রমণে বিরত হইতে পারি। নবাব বারবার লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আপনারা আমার রাজ্য মধ্যে ফরাসীদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না, তাহা হইলে আমার রাজ্যের শান্তি নষ্ট হইবে এবং আমাদিগের সন্ধির সত্ত্বও ভঙ্গ করা হইবে। কিন্তু ইংরাজেরা নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও চন্দন নগর অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। নবাব অগত্যা ফরাসীদিগের জন্য স্থানীয় ফৌজদার নন্দকুমারকে সসৈন্যে সাহায্য করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন,এবং রায় দুর্লভকে একদল সৈন্যের সহিত হুগলার দিকে প্রেরণ করিলেন। ইংরেজেরা আমীনচাঁদকে পাঠাইয়া নন্দকুমারকে হাত করিয়া ফেলিলেন। নন্দকুমার নিজের সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন, এবং রায় দুর্লভকেও ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরেজেরা যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিতে যাইতেছে, আমরা তাহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিব না, অধিকন্তু আমাদিগকে অপমানিত হইতে হইবে। ইংরেজেরা অবাধে চন্দননগর অধিকার করিয়া বসিলেন। ২৩শে মার্চ্চ চন্দন নগর অধিকৃত হয়। ফরাসীদিগের মধ্যে অনেকে সৈদাবাদ-ফরাসডাঙ্গায় উপস্থিত হইল। এই সময়ে ল সাহেব নামে একজন কার্য্যদক্ষ ফরাসী সৈদাবাদের ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বিতাড়িত ফরাসী-

দিগকে লইয়া সিরাজউদ্দৌলার অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইংরাজদিগের তাহাও সহ্য হইল না। তাঁহারা ল সাহেবকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিবার জন্য বার-ম্বার লিখিয়া পাঠাইলেন। সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগের চন্দননগর আক্রমণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়াছিলেন। আবার এই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্ম চারীগণ এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিতে ছিলেন। তাহার মধ্যে জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ ও মীরজাফর প্রভৃতি প্রধান। নবাব একদিকে ইংরাজদিগের প্রবঞ্চনা ও অপর দিকে ষড়-যন্ত্রকারীদিগের মন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া, ইং-রাজদিগের কথানুসারে ল সাহেব ও তাঁহার ফরাসী অনুচরদিগকে মুর্শিদাবাদে দরবার হইতে বিদায় দিলেন। তাঁহারা ভাগলপুরে গমন করিলেন। ল সাহেব যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, নবাব আপনার সহিত এই আমার শেষ দেখা, আপনি আমার কথা মনে রাখিবেন। ইহার পর আমাদের পর-স্পরের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব। * ল সাহেবকে বিদায় দিয়াই সিরাজের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তাঁহার ন্যায় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি নবাব দরবারে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে সিরাজউদ্দৌলার দুর্দ্দশার এক-শেষ হইত না। চারিদিকে বিভিষীকা দেখিয়া সিরাজ এক প্রকার বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা আপনাদিগের অভীষ্ট পূরণের জন্য ইংরাজদিগের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল। ইংরাজেরাও আপনাদিগের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে-ছিল। একটী কারণে আবার নবাবের সহিত ইংরাজদিগের গোলযোগ উপস্থিত হইল। নন্দকুমারের কথায় রায় দুর্লভ হুগলী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, নবাব ইংরাজ-দিগের কুঅভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে পলা-শিতে থকিতে অনুমতি দেন, ও মীরজা-ফরকে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আদেশ প্রদান করেন। ইংরেজেরা তাহা লইয়া মহা আপত্তি তুলিলেন। বলিলেন যে, নবাব পলাশিতে সৈন্য রাখিলে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইবে। নবাব লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরেজেরা যদি সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি পলাশী হইতে সৈন্য ফিরাইয়া আনিতে প্রস্তুত আছেন। ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরাজদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। প্রথমে ইয়ারলতিব খাঁ নামে নবা-বের একজন সেনাপতি সুবেদারী প্রাপ্তির আশায়, ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয়। পরে মীরজাফরও সেইরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ইংরেজেরা মীরজাফরকেই সুবেদারী দিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু ইয়ার-লতিবকেও হস্তচ্যুত করেন নাই। ক্লাইব কপটতা পূর্ব্বক নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি করিতে চাই, এইজন্য মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। নবাবের দরবার কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেব যে জামিনরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহাকেও মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিবার সংবাদ দিলেন। ওয়াট্‌স প্রভৃতি পলায়ন করিলে নবাব পরিষ্কার রূপে ইংরাজদিগের মনোভাব বুঝিতে পারি-লেন। এবং নিজে সসৈন্যে পলাশী অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। পলাশী যাত্রা করি-

* Seir Mutuqherin Trans. Vol I. P 762.

বার পূর্ব্বে ওয়াটসনকে এইরূপ পত্র লিখিলেন —

"আমার প্রতিজ্ঞানুসারে, ও পরস্পরের অঙ্গীকার অনুযায়ী অতি সামান্য অংশ ব্যতীত আমি ওয়াটসের সহিত সমস্ত দাবী দাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছি, এবং মানিকচাঁদের বিষয়ও একরূপ স্থির করা হইয়াছে। এই সকল সত্ত্বেও ওয়াটস ও কাশীমবাজার কুঠার অন্যান্য ইংরাজেরা বাগানে বায়ুসেবন ছলে রজনীযোগে এখান হইতে পলায়ন করিয়াছে। ইহাতে প্রবঞ্চনার স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে এবং সন্ধি ভঙ্গের ইচ্ছাও বুঝা যাইতেছে। আমার বিশ্বাস হইতেছে ইহা আপনাদের অজ্ঞাতে বা বিনা উপদেশে ঘটে নাই। আমি অনেকদিন হইতে এইরূপ কিছু মনে করিতেছিলাম। এক্ষণে বিশ্বাসঘাতকতার কোন কার্য্য হইবে [illegible] না করিয়া পলাশী হইতে আমার সৈন্যদিগকে পুনরাহ্বান করিতেছি না। আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, আমার দ্বারা সন্ধিভঙ্গ হয় নাই। ঈশ্বর ও মহম্মদ আমাদিগের সন্ধির বিষয় অবগত আছেন, এবং যাহারা প্রথমে সন্ধি ভঙ্গ করিবে, তাহারা তাহাদের কার্য্যানুযায়ী শাস্তি ভোগ করিবে। ২৫শে রমজান হিজরী ১১৭০।* ইহাই নবাবের শেষ পত্র।

নবাবের পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, ক্লাইব মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই জুন চন্দননগর হইতে যাত্রা করিয়া ১৬ই পাটলীতে উপস্থিত হইলেন। ১৭ই ক্লাইব মেজর কুটের অধীন একদল সৈন্য দিয়া, কাটোয়া দুর্গ অধিকার করিতে পাঠাইলেন। কুট অনায়াসেই কাটোয়া হস্তগত করিলেন। তাহার পর ক্লাইব ও অন্যান্য ইংরেজ সৈন্য তথায় উপস্থিত হয়। ক্লাইব মীরজাফরের নিকট হইতে বরাবরই পত্রের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ১৭ই এক পত্র আইসে, তাহাতে মীরজাফর লেখেন যে, নবাবের সহিত তাঁহার এক বাহ্যিক মিলন হইয়াছে, তাহাতে তিনি নবাবকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে ইংরাজদিগের মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহার পর তাঁহারা মীরজাফরের নিকট হইতে আরও পত্র পান, তাহাতে তিনি কোথায় কিরূপ ভাবে অবস্থান করিবেন, এই সমস্ত লেখা থাকে, কিন্তু তিনি ইংরাজদিগকে কি ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করিবেন, তাহার কোনই উল্লেখ ছিল না। ইংরেজেরা বিষম সন্দেহে পতিত হওয়ায়, ক্লাইব এক সমর সভা আহ্বান করিলেন। তাহাতে এইরূপ কথা উঠিল যে, নবাবকে এক্ষণেই আক্রমণ করা উচিত, কি বর্ষাবসানে অন্য কোন স্থান হইতে সাহায্য পাইলে আক্রমণ করা যাইবে। ক্লাইব নবাবকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু শেষে স্থির হইল যে, নবাবকে এক্ষণেই আক্রমণ করাই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ স্থির হইলে, ইংরেজ-সৈন্য ২২শে জুন প্রাতঃকালে কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া, বৈকালে পরপারে উপস্থিত হয়। রাত্রি

---

* "25th Ramazan (13th of June) 1757 According to my promise, and the agreement made between us I have duly rendered every thing to Mr Watts except a very small remainder, and had almost settled Manickchand's affair. Notwithstanding all this Mr Watts and the rest of the council of the factory at Cassimbazar, under pretence of going to take the air in their gardens, fled away in the night. This is an evident mark of deceit, and of an intention to break the treaty. I am convinced it could not have happened without your knowledge nor without your advice. I all along expected something of this kind, and for that reason I would not recall my forces from Plassey, expecting some treachery.

I praise God, that the breach of the treaty has not been on my part. God and his Prophet have been witnesses to the contract made between us, and whoever first deviates from it will bring upon themselves the punishment due to their actions."

প্রায় ১টার সময় তাহারা পলাশী আম্রকুঞ্জে সমবেত হইল। নবাব তাহার পূর্ব্বে পলাশীতে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। ২৩শে জুন প্রাতঃকালে নবাব-সৈন্য শিবির হইতে বহির্গত হইয়া আম্রকুঞ্জের দিকে ধাবিত হইল। ইংরাজেরা প্রথমে আম্রকুঞ্জ হইতে কতক পরিমাণে বহির্গত হইয়াছিল, ক্লাইব সাগর তরঙ্গবৎ নবাব-সৈন্য দেখিয়া ভীত হইলেন, ও ইংরাজ সৈন্য দিগকে পিছু হটিয়া আম্রকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, নবাবকে রাত্রিযোগে সহসা আক্রমণ করিবেন। সৈন্যদিগকে আদেশ দিয়া ক্লাইব আম্রকুঞ্জস্থ নবাবের একটী শিকার মঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাগত হইয়া পড়িলেন। এদিকে ইংরাজ সৈন্য দিগকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া, নবাবের সেনাপতি মীরমদন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইংরেজদিগের একটী কামানের গোলা লাগিয়া মীরমদন আহত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পশ্চাতে মোহনলাল অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া পলায়নোন্মুখ নবাব সৈন্যগণকে লইয়া ইংরাজদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। ইংরেজেরা মহা বিপদ দেখিয়া ক্রমাগত কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মীরমদনের মৃত্যু শ্রবণে নবাব ভীত হইয়া মীরজাফরকে আহ্বান করায়, মীরজাফর তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। নবাব মোহনলালকে সে কথা বলিয়া পাঠান, মোহনলাল প্রথমে সে কথা শুনেন নাই। পরে মীরজাফরের পরামর্শ ক্রমে নবাবের পুনঃপুনঃ আদেশে প্রতিপালন করিতে বাধ্য হন। * মোহনলালকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া ইংরেজেরা আম্রকুঞ্জ হইতে পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। এই সময়ে জনৈক ইংরাজ সৈন্য গিয়া ক্লাইবের নিদ্রাভঙ্গ করে। নবাবের সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল দেখিয়া ইংরাজেরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন। সিন্‌ফ্রে বা সেণ্ট ফ্রায়াস নামে নবাব পক্ষীয় একজন ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ ইংরাজদিগের গতিরোধ করিল, কিন্তু অবশেষে সেও ইংরেজ হস্তে পরাজিত হয়। পলাশী যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া, ইংরেজেরা দাদপুর নামক স্থানে ২৩শে রাত্রি আসিয়া শিবির গাড়িলেন। তথায় মীর জাফর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, ক্লাইব তাঁহাকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা মীরজাফরকে, আপনাদিগের যাইবার কিছু পূর্ব্বেই, মুর্শিদাবাদে পাঠাইলেন। এদিকে সিরাজউদ্দৌলা পলাশী প্রান্তর হইতে পলায়ন করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া নগর রক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারিগণের পরামর্শে, আপনার বেগম লুৎফ উন্নিসার সহিত কতক কতক ধন সম্পত্তি লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে ভগবানগোলা ও পরে তথা হইতে রাজমহালাভিমুখে পলায়ন করেন। ইংরেজেরা মুর্শিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরকে সিরাজউদ্দৌলার হীরাঝিল বা মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে মসনদে বসাইলেন ও হীরাঝিলের প্রাসাদস্থিত ধনসম্পত্তি লুটিয়া লইলেন। কিছুদিন পরে সিরাজ-উদ্দৌলা রাজমহালের নিকট হইতে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আসিলেন, ও মীরণের আদেশে মহম্মদীবেগের তরবারি আঘাতে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। কোন দেশীয় গ্রন্থকার বলিয়া থাকেন যে, জগৎশেঠও ইংরাজ

* Seir Mutaqherin Trans. Vol I. P 769.

সন্দ্বার সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করিবার জন্য মীরজাফরকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।* ইহার সত্য মিথ্যা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

এইরূপে সিরাজ উদ্দৌলার অবসান হইল। আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি যে, সিরাজ ইংরাজদিগের প্রতি বা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং ইংরাজেরাই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার দেখাইয়াছেন। ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াও তাঁহার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন নাই। সিরাজের অত্যাচার হইতে বঙ্গরাজ্য উদ্ধার করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আপনাদিগের রাজ্য-লালসা-বৃত্তি চরিতার্থ করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সিরাজ উদ্দৌলা ইংরাজদিগের সহিত কোনরূপ প্রবঞ্চনা করেন নাই, বিশেষতঃ ৯ই ফেব্রুয়ারির সন্ধির পর হইতে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার ব্যবহার বরাবরই ভাল ছিল। কিন্তু ইংরাজেরা কপটতা পূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকগণের সাহায্যে সিরাজের রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন। একজন বর্ত্তমান ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, সিরাজের যত কেন দোষ থাকুক না, তিনি স্বীয় প্রভুকে শত্রু হস্তে অর্পণ বা আপনার দেশ বিক্রয় করেন নাই। অধিকন্তু কোন নিরপেক্ষ ইংরাজ বিচার করিতে বসিয়া এ কথা অস্বীকার করিবেন না যে, ৯ই ফেব্রুয়ারি হইতে ২৩শে জুন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনায় ক্লাইবের নামাপেক্ষা সিরাজউদ্দৌলার নাম অধিকতর সম্মাননীয়। তিনি সেই বিয়োগান্ত অভিনয়ের একমাত্র অপ্রবঞ্চক অভিনেতা। আমরা তাঁহার উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।ঃ—

"Whatever may have been his faults, Sirajuddaulah had neither betrayed his master nor sold his country. Nay more, no unbiassed Englishman, sitting in judgment on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Sirajuddaulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive."†

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

শ্রীভগবদ্‌গীতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধ্যানযোগ।

'চিত্তশুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাস মাত্রতঃ।
মুক্তিং স্যাদিতি যস্তেঽস্মিন ধ্যানযোগো বিতন্যতে॥
আত্মযোগমবোচৎ যো ভক্তিযোগ শিরোমণিং।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিং॥"

শ্রীভগবান—
ত্যজিস্পৃহা কর্ম্মফলে, কর্ত্তব্য করম
করে যেই—সেই যোগী, সেই ত সন্ন্যাসী
নহে সে—যে অগ্নিহীন কিম্বা ক্রিয়াহীন।১

১ ত্যজিস্পৃহা—(মূলে আছে "অনাশ্রিত")কর্ম্ম ফলে অপেক্ষা বিরহিত বা স্পৃহা হীন হইয়া।

কর্ত্তব্য করম—(মূলে আছে কার্য্যং,কর্ম্মকর্ত্তব্য যেমন কর্ম্ম, অমুনয় কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্র

* Riyazu-s-Salatin P 373

† Malleson

বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম (শঙ্কর, মধু, বলদেব)। পরম পুরুষের আরাধনা রূপ কর্ম্ম (রামানুজ)।

সন্ন্যাসী—পরিত্যাগী (শঙ্কর, মধু)। জ্ঞাননিষ্ঠ (রামানুজ)।

যোগী—সমাহিতচিত্ত (শঙ্কর, মধু, বলদেব)। কর্ম্মযোগী (রামানুজ)।

অগ্নিহীন—অগ্নিসাধ্য ইষ্টাখ্য কর্ম্মত্যাগী(স্বামী)। বা শ্রৌত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগী (মধু, বলদেব)। অগ্নি সাধনাবিহীন,—যাহা হইতে কর্ম্মাঙ্গভূত অগ্নি-নির্গত হইয়াছে (শঙ্কর)। অর্থাৎ গার্হপত্য, আহবনীয় অন্বাহার্য্য ও পচন প্রভৃতি অগ্নি যে ত্যাগ করিয়াছে, (গিরি)। সকলকর্ম্মত্যাগী (মধু)। শাস্ত্রমতে যাহারা সন্ন্যাসী তাহারাই অগ্নিহীন।

ক্রিয়াহীন—পূর্ত্তাখ্য অগ্নিসাধ্য স্মার্ত্ত ক্রিয়া ত্যাগী (গিরি, মধু)। তপ দানাদি ক্রিয়াত্যাগী (শঙ্কর)। শারীরিক কর্ম্মত্যাগী (বলদেব),নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি (মধু)।

ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণ এই শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেন। রামানুজ বলেন, আত্মাবলোকনরূপ ধ্যান যোগ, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয় সাধ্য। তবে এ উভয় মধ্যে জ্ঞানাকার (নিষ্কাম) কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ, কেন না, তাহা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ উভয় নিষ্ঠ। আর ক্রিয়াহীন ও অগ্নিহীন যে সন্ন্যাস, তাহা কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ। বলদেব বলেন, ধ্যানযোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম-যোগ তাহার উপায়। এই জন্য এই অধ্যায়ের প্রথম দুই শ্লোকে কর্ম্মযোগের প্রশংসা করা হইয়াছে। বল দেব বলেন, সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই কেবল সন্ন্যাসী হয় না, আর শুধু চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া বসিলেই যোগী হয় না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। স্বামী বলেন, কেবল চিত্তশুদ্ধি হইলেই মুক্তি হয় না, কেবল সন্ন্যাসের দ্বারাও মুক্তি হয় না। মুক্তির জন্য ধ্যান যোগের প্রয়োজন। কর্ম্মযোগ হইতেই ধ্যানযোগ লাভ হয়। আর কর্ম্মযোগ সুকর বলিয়া তাহা সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এজন্য এস্থলে প্রথমেই কর্ম্মযোগের প্রশংসা করা হইয়াছে। এই সকল দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব টীকাকারদিগের একই অভিপ্রায়। ইঁহাদের মতে কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ সন্ন্যাসী টীকাকারদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভগবান কখন সর্ব্ব-শাস্ত্র বিহিত চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দা করেন নাই। তবে গৃহীর যাহা অনুষ্ঠেয়, কেবল তাহাই এই শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন। গৃহী ধ্যানযোগে আরোহণে অধিকারী হইবার জন্য, নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রথমে আচরণ করিবে। তবে যাবজ্জীবন তাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে না। কেন না, এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যোগারূঢ় হইলে শম বা কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। আর যোগ সাধনার যে বহিরঙ্গ কর্ম্ম, তাহা এই অধ্যায় শেষে "কল্যাণকারী যোগ-ভ্রষ্টের সদ্গতির বিবরণ যাহা আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

এই জন্য শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের অর্থ করেন যে, নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয় যাহারা, কেবল তাহারাই যে সন্ন্যাসী বা যোগী, তাহা নহে। যিনি কর্ম্মযোগী, কর্ম্ম ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান দ্বারা, পরিণামে সত্ত্ব শুদ্ধি হেতু সন্ন্যাসী বা যোগী হইতে পারেন। অর্থাৎ অগ্নি ও ক্রিয়াত্যাগী যেমন সন্ন্যাসী বা যোগী, নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্মকারীও সেইরূপ সন্ন্যাসী ও যোগী হইয়া, কর্ম্মত্যাগ না করিয়া সন্ন্যাসী বা যোগী। শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন, সাত্ত্বিক নিষ্কাম কর্ম্মী ও নিরগ্নি সন্ন্যাসী, কর্ম্মফল সঙ্কল্পসন্ন্যাস হেতু উভয়ের সাদৃশ্য বা এই সাধর্ম্ম জন্য উভয়ের একত্ব। সেইরূপ নিষ্ক্রিয় যোগী ও সক্রিয় কর্ম্মযোগী উভয়ের চিত্ত বিক্ষেপের হেতু পরিত্যাগ জন্য উভয়ের সদৃশ্য বা একত্ব—এইরূপ বুঝিতে হইবে। মধুসূদনও প্রায় এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

[এ স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, কোন কোন বাঙ্গালা ব্যাখ্যাকার এই শ্লোকের মর্ম্ম করিয়াছেন—"নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা"নিরগ্নিক হউন অথবানিষ্ক্রিয় হউন, তথাপি তিনি সন্ন্যাসী, তিনি যোগী"। বলা বাহুল্য এ অর্থ সঙ্গত নহে।)

যাহা হউক, উল্লিখিত বিভিন্ন অর্থের মধ্যে বৈষ্ণব টীকাকারদিগের অর্থ অধিক সঙ্গত মনে হয়। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্লোক এই শ্লোকের সহিত মিলাইয়া দেখিলে একথা প্রতিপন্ন হইবে। ইহা ব্যতীত অষ্টাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় হইতে একাদশ শ্লোক বুঝিয়া দেখিলেও এই কথা বুঝা যাইবে। ভগবান সর্ব্বত্রই কর্ম্মত্যাগীকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি

যাহাকে সন্ন্যাস কহে যোগও তাহাই
জানিও পাণ্ডব তুমি, কভু নাহি হয়
যোগী সেই—সংকল্প যে নাহি করে ত্যাগ।২

সর্ব্বত্রই বলিয়াছেন, যিনি কর্ম্মফলত্যাগী কর্ত্তব্য কর্ম্ম কারী—তিনিই সন্ন্যাসী।

এই শ্লোকের আরও একরূপ অর্থ হইতে পারে। "যিনি কর্ম্মফলে অভিলাষ না করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আচরণ করেন—তিনিই যোগী, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনি অগ্নি সাধ্য কর্ম্ম ত্যাগ করেন না—তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন না।'—কিন্তু কোন ভাষ্য বা টীকাকার এই অর্থ করেন নাই।

(২) যাহাকে সন্ন্যাস কহে যোগও তাহাই—শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন বলেন, এস্থলে গৌণার্থে সন্ন্যাস ও যোগশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কেন না, মুখ্যভাবে দেখিলে, কর্ম্মযোগ প্রবৃত্তি লক্ষণযুক্ত, আর সন্ন্যাস নিবৃত্তি লক্ষণযুক্ত, সুতরাং এই দুই বিপরীত লক্ষণযুক্ত সংজ্ঞার একত্ব ধারণা হয় না। এই শ্লোকেও একরূপ একত্ব বুঝান হয় নাই—গৌণ ভাবে উভয়ের সাদৃশ্য বুঝান হইয়াছে মাত্র। যাহা সন্ন্যাস, তাহার লক্ষণ—সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ ও সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগ। সন্ন্যাসী সকল কর্ম্মত্যাগ দ্বারা, তাহার ফল বিষয়ে সংকল্পও ত্যাগ করেন। এই সঙ্কল্পই প্রবৃত্তি হেতু, চিত্ত বিক্ষেপ হেতু, কর্ত্তৃত্বাভিমানের মূল, কামনার কারণ। আর যিনি কর্ম্মযোগী তিনিও চিত্তবিক্ষেপ কারণ কর্ম্মফল সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। এই জন্য যোগ ও সন্ন্যাস উভয়েই—কর্ম্মফল ত্যাগ হয় ফল তৃষ্ণা রূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। এই অর্থে এই কর্ম্মফল ত্যাগ সম্বন্ধে সাদৃশ্য হেতু যোগ ও সন্ন্যাসকে গৌণভাবে এক, অথবা পরস্পর পরস্পরের সদৃশ বলা যায়।

মধুসূদন বলেন, পাঁচরূপ চিত্তবৃত্তি যে যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে বিপর্য্যয় বৃত্তির একাংশকে রাগ বলে। ইহাই কর্ম্মফলে সংকল্পের হেতু। সুতরাং এই সংকল্পাত্মক রাগ ত্যাগে চিত্ত বৃত্তির একাংশ সংযত করা হয় মাত্র। ধ্যানযোগে সকল চিত্তবৃত্তিরই নিরোধ করিতে হয়।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, কর্ম্মযোগের প্রশংসা জন্য, এস্থলে তাহাকে সন্ন্যাস বা সন্ন্যাস তুল্য বলা হইয়াছে।

যোগে আরোহণ আশা করে যেই মুনি,
কর্ম্মই কারণ তার, যোগরূঢ় যেই
নিবৃত্তি কারণ তার—কহে ইহা লোকে।৩

স্বামী বলেন, এস্থলে কর্ম্মযোগেরই সন্ন্যাসত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। রামানুজ বলেন, কর্ম্মযোগের ফল জ্ঞান বলিয়া—তাহার সন্ন্যাসিত্ব দেখান হইয়াছে।

বলদেব ভিন্ন অর্থ করেন। তিনি বলেন, যে কর্ম্মযোগকে প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসারে সন্ন্যাস বা সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তি বিরতিরূপ জ্ঞান নিষ্ঠা বলা যায়, সেই কর্ম্মযোগকেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ অষ্টাঙ্গ যোগ বলিয়া জানিও।

সংকল্প-ত্যাগ—যে ফল বিষয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পারে নাই তাহার চিত্তবিক্ষেপ কারণ বর্ত্তমান থাকায়, সে যোগী হইতে পারে না। কেননা সংকল্পই কামনার কারণ ও চিত্তবিক্ষেপ হেতু (শঙ্কর)। যে ফল সংকল্প ত্যাগ করে নাই, সে কর্ম্ম নিষ্ঠ হউক, আর জ্ঞান নিষ্ঠই হউক—সে যোগী নহে (স্বামী)। অনাত্ম প্রকৃতিতে যে আত্ম সংকল্প পরিত্যাগ করে নাই, সে কখন কর্ম্মযোগী হইতে পারে না (রামানুজ)। (পরবর্ত্তী ২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

(৩) যোগে—ধ্যানযোগে (শঙ্কর)। আত্মাবলোকন (রামানুজ)। জ্ঞানযোগে (স্বামী)। অন্তঃকরণ শুদ্ধিরূপ বৈরাগ্যে (মধু)।

মুনি—কর্ম্মফল সন্ন্যাসী (শঙ্কর, মধু)। যোগ-অভ্যাসী (বলদেব)।

কর্ম্ম—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ (শঙ্কর)।

কারণ—সাধন (শঙ্কর, মধু)।

নিবৃত্তি—(মূলে আছে 'শম') উপশম বা সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তি বা সন্ন্যাস (শঙ্কর, রামানুজ)। বিক্ষেপক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি (স্বামী, বলদেব)। জ্ঞান পরিপাক সাধন জন্য সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস (মধু)। মুক্তিগত সুখাতিশয় লাভ জন্য সর্ব্ব কর্ম্মে নিবৃত্তি (রাঘবেন্দ্রযতি)।

এই তৃতীয় শ্লোক সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, ফল নিরপেক্ষ কর্ম্মযোগ ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন, আর সেই কর্ম্মযোগ সন্ন্যাসের তুল্য, এই বলিয়া কর্ম্ম-যোগের প্রশংসা করিয়া, পরে ধ্যানযোগের সাধক যে কর্ম্মযোগ, এ স্থলে তাহাই দেখান হইয়াছে। মূলের

ইন্দ্রিয় বিষয়ে—আর কর্ম্মেতে যখন
না থাকে আসক্তি, ত্যজে সংকল্প সকল,—
যোগারূঢ় হয় তবে আছয়ে কথিত।৪

অর্থ এই যে, ধ্যানযোগ সাধনের পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। কর্ম্মযোগ দ্বারাই সেই চিত্তশুদ্ধি হয়। এজন্য ধ্যানযোগ সাধনা করিতে হইলে, প্রথমে কর্ম্মযোগ সাধনা কর্ত্তব্য। তাহার পর যে যে সময় কর্ম্ম হইতে উপরতি হয়—সেই সেই সময় চিত্ত সমাহিত হইতে পারে। ব্যাস বলিয়াছেন—

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং
যথৈকতা সমতা সত্যতা চ
শীলং স্থিতি দণ্ডনিধান মার্জবং
ততস্ততশ্চোপরম ক্রিয়াভ্যঃ॥

রামানুজ বলেন—এই তৃতীয় শ্লোক অনুসারে—যাবৎ আত্মাবলোকন রূপ মোক্ষপ্রাপ্তি না হয়, তাবৎ কর্ম্মযোগ কর্ত্তব্য। স্বামী, মধুসূদন ও বলদেব বলেন কর্ম্ম যাবজ্জীবন অনুষ্ঠেয় নহে। ধ্যানযোগারূঢ় হইতে পারিলে আর কর্ম্মযোগের প্রয়োজন নাই। ইহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

ধ্যানযোগ যে একরূপ যজ্ঞ, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোন কোন বিদেশী টীকাকার বলেন যে, এই শ্লোকে পাতঞ্জল ও সাংখ্যদর্শনের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। উভয় দর্শন মতেই "জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ"। সাংখ্য মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিলে ও প্রকৃতির স্বরূপ জানিলে মুক্তি হয়। পাতঞ্জল মতে সেই জ্ঞান সমাধির দ্বারা লাভ করিতে হয়।

এই শ্লোকে কর্ম্ম অর্থে নিষ্কাম কর্ম্ম না করিয়া যোগশাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম, এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ধ্যানযোগ সাধন জন্য প্রাণায়াম প্রত্যাহার আদি যোগবিহিত কর্ম্ম করিতে হয়। পরে যোগ সিদ্ধ হইলে আর সে সকল কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তখনও (ব্যুত্থান কালে) নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে বাধা নাই। কেন না, তাহাতে চিত্তবিক্ষেপ হয় না। পর শ্লোকের সহিত এই অর্থ সঙ্গত হয়।

(৪) **ইন্দ্রিয় বিষয়ে আর কর্ম্মেতে**—শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয়ে ও নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য লৌকিক প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মে (শঙ্কর, মধু)। আত্মব্যতিরিক্ত প্রাকৃত বিষয়ে ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মে (রামানুজ)। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ও তৎসাধন কর্ম্মে (স্বামী, বলদেব)।

আসক্তি না থাকে—প্রয়োজন নাই এইরূপ বুঝিয়া, কর্ম্মে ও বিষয়ে অনুষঙ্গ বা কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি ত্যাগ করে (শঙ্কর)। কর্ম্ম ও বিষয় মিথ্যা, আত্মা অকর্ত্তা আনন্দস্বরূপ আত্মদর্শন লাভ করিলে সে সকল প্রয়োজন নাই, এইরূপ বুদ্ধিতে আসক্তি ত্যাগ করে (মধু)। সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাসী বলিয়া এরূপ আসক্তি ত্যাগ করে (স্বামী, বলদেব)।

ত্যজে সংকল্প সকল—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"যিনি সর্ব্বকামনা ও কামাত্মক সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনিই সর্ব্ব সংকল্প-সন্ন্যাসী। কামনা সকল সংকল্প-মূলক। সেই জন্য পরবর্ত্তী ২৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "সংকল্প প্রভবান্ কামান্।" স্মৃতিতে,—

"সংকল্প মূল কামোবৈ, যজ্ঞাঃ সংকল্প সম্ভবাঃ।
কামং জানামি তে মূলং সংকল্পাত্বং হি জায়সে॥
ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি।"

সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগে সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। শ্রুতিতে আছে—

স যথাকামোভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি
তৎ কর্ম্ম কুরুতে।"

স্মৃতিতে আছে—"যদ্যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতং।"

মধুসূদন বলেন "ইহা আমার কর্ত্তব্য, এই ফল ভোক্তব্য—এইরূপ মনোবৃত্তি বিশেষ ও তদ্বিষয়ক কাম বা কামনা, ও তৎসাধক কর্ম্ম—এই সকল যে ত্যাগশীল, সেই সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাসী। সংকল্পই শব্দাদি বিষয়ে ও কর্ম্মে আসক্তির হেতু। এইজন্য সংকল্প যোগারোহণের প্রতিবন্ধক।

রামানুজ বলেন—কর্ম্মযোগ সাধনার দ্বারা বিষয়ের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবার অভ্যাস হয়। এই জন্য ধ্যানযোগ সাধনার পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ সাধনার প্রয়োজন।

আত্মবলে আত্মাকেই করিও উদ্ধার,
নাহি কভু অবসন্ন করিও আত্মারে,
আত্মাই আত্মার বন্ধু—আত্মা আত্মরিপু।৫

(৫) **আত্মবলে**—বিবেকযুক্ত মন দ্বারা (স্বামী, মধু)। বিষয়াসক্তি রহিত মন দ্বারা (রামানুজ, বলদেব)

আত্মা তার আত্মবন্ধু—আত্মবলে যেই
করে আত্মজয়, নহে আত্মজয়ী যেই—
শত্রু সম আত্মা করে শত্রুতা তাহার।৬

আত্মাকেই—সংসার সাগরে নিমগ্ন আপনাকে জীবকে (শঙ্কর, মধু)।

করহ উদ্ধার—(উর্দ্ধে লইয়া যাও)। যোগারূঢ় হইলে সংসার জাল হইতে আত্মার উদ্ধার হয়—অত এব ধ্যানযোগ দ্বারা আত্মার উদ্ধার কর (শঙ্কর)। বিষয়াশক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগারূঢ় হইয়া আত্মাকে সংসার প্রবাহের বাহিরে লইয়া যাও (মধু)।

অবসন্ন—অধোগতি করা (শঙ্কর, স্বামী)। সংসার মগ্ন করা (মধু, বলদেব)। যোগ প্রাপ্তির উপায় চেষ্টা না করিলে যোগাভাবে সংসার পরিত্যাগ অসম্ভব হইবে, ও তাহা হইলে আত্মার অধোগতি হইবে (গিরি)।

আত্মা—মন (স্বামী, বলদেব)।

বন্ধু—সংসার মুক্তির কারণ (শঙ্কর)। যাহাদের সচরাচর বন্ধু বলে, তাহারা মোক্ষের প্রতিকূল, স্নেহাদি বন্ধন কারণ—তাহারা প্রকৃত বন্ধু নহে (শঙ্কর)। হিত কারী, উপকারক (স্বামী, মধু)।

রিপু—অপকারী (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। বিষয় বন্ধন কারণ (মধু)। স্মৃতিতে আছে—

মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়া সঙ্গো মুক্তৈনির্বিষয়ং মনঃ॥ (পরাশর)

এই শ্লোক সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, যোগারূঢ় হইলেই আত্মার দ্বারা আত্মোদ্ধার হয়, নতুবা আত্মা অধোগামী হয়। অর্থাৎ সংসার মগ্ন হয়। স্বামী বলেন, বিষয়াসক্তি ত্যাগই মোক্ষ, আর আসক্তিই বন্ধন। এই এই জন্য আত্মোদ্ধার কারণ বুদ্ধি বলে—বিবেকযুক্ত হইয়া বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে হয়।

(৬) আত্মজয়ী—আত্মা অর্থাৎ কার্য্য কারণ সংঘাত শরীর (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। আত্মা=মন (বলদেব, রামানুজ)। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া (বা সংঘাতকে) বশ করিলে চিত্ত-বিক্ষেপ দূর হয়, তাহার ফলে চিত্ত সমাধির উপযুক্ত হয়। এরূপ লোকের আত্মা তাহার বন্ধু (গিরি)। রাঘবেন্দ্র যতি বলেন, যে জীব বুদ্ধিপূর্ব্বক বা বুদ্ধিকে (বিজ্ঞানাত্মাকে) আশ্রয় করিয়া মন বশীভূত করিয়াছে, সেই জীবের মন ভগবদারাধনার উপযোগী হওয়ায় বন্ধুর ন্যায় উপকারী।

যে প্রশান্ত আত্মজয়ী,—পরম আত্মায়
রহে সেই সমাহিত, শীত গ্রীষ্মে আর
সুখে দুঃখে, সেই রূপ মান অপমানে।৭
আত্মা যার তৃপ্ত—জ্ঞান বিজ্ঞান লভিয়া,

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রবৃত্তিজ কোষে বা শরীরে আত্মা আবদ্ধ। বিজ্ঞানাত্মা স্বশক্তি বলে স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণ শরীরকে বশে আনিয়া যে চিত্তকে অন্তর্ম্মুখী করিতে পারে, আত্মার নিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে—তাহারই কার্য্যকারণ সংঘাত আত্মা আত্মার বন্ধু। নতুবা যাহার চিত্ত বহির্ম্মুখী, সে বিক্ষেপ শক্তির বৃদ্ধি হেতু, বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত, তাহার চিত্ত প্রকৃত পক্ষে তাহার শত্রু। কেননা, তাহা মুক্তি-পথের অন্তরায়। পূর্ব্ব শ্লোকে যে বলা হইয়াছে, আত্মা আত্মার বন্ধু ও আত্মা আত্মার শত্রু—এই শ্লোকে তাহার অর্থ বুঝান হইয়াছে।

(৭) প্রশান্ত—রাগাদি রহিত (স্বামী)। সর্ব্বত্র সম বুদ্ধি (মধু)।

পরম আত্মায়—সাক্ষাৎ আত্মভাবে (শঙ্কর), কেবল আত্মাতে (স্বামী, মধু), অথবা স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বভাব আত্মাতে (মধু)।

সমাহিত—সাক্ষাৎ আত্মভাবে স্থিত (শঙ্কর) সমাধি বিষয়ে যোগারূঢ় (মধু)।

এই শ্লোকে ও পরের দুই শ্লোকে যোগারূঢ়যোগী অবস্থার কথা বলা হইয়াছে (বলদেব, রামানুজ)। আত্মজয়ীর আত্মা কিরূপে তাহার বন্ধু হয়, তাহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে (স্বামী, মধু)।

(৮) জ্ঞান—শাস্ত্রোক্ত বিষয় পরিজ্ঞান, বিজ্ঞান—শাস্ত্র হইতে যাহা জানা যায় তাহাই নিজে অনুভব করণ (শঙ্কর)। জ্ঞান=ঔপদেশিক; বিজ্ঞান=অপরোক্ষানুভূত (স্বামি)। জ্ঞান—পরোক্ষ, আর বিজ্ঞান—অপরোক্ষ (গিরি)। শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বে ঔপদেশিক অর্থাৎ উপদেশ প্রভৃতিতে লব্ধ জ্ঞান অপ্রামাণ্য এইরূপ আশঙ্কা হইলে বিচার দ্বারা সেই আশঙ্কা নিরাকরণ করা, আর সেই সকল তত্ত্ব নিজে অনুভব দ্বারা অপরোক্ষ করাই বিজ্ঞান (মধু)। ধ্যানের দ্বারাই বিজ্ঞান লাভ হয় (রাঘবেন্দ্র যতি)। পূর্ব্বে ৩। ৪১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

কূটস্থ—অপ্রকম্প (শঙ্কর), নির্ব্বিকার (স্বামী)

যে কূটস্থ জিতেন্দ্রিয়, সম যার শীলা
লোষ্ট্র বা কাঞ্চন—সেই যোগী যোগরত।৮
সুহৃদ কি মিত্র, কিম্বা অরি উদাসীন,
মধ্যস্থ অপ্রিয় বন্ধু—সাধু পাপকারী
সবা প্রতি সমবুদ্ধি হয় শ্রেষ্ঠ অতি।৯

যোগী সদা যোগরত করিবে আত্মারে
একাকী নির্জ্জনে রহি, করিয়া সংযত
চিত্ত আত্মা, করি ত্যাগ আশা পরিগ্রহ।১০

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

একস্বভাব হেতু সর্ব্বকালে স্থিত (বলদেব), দেবাদি অবস্থা যুক্ত সর্ব্ব জীবে বর্ত্তমান জ্ঞানের দ্বারা একাকার সর্ব্ব সাধারণ আত্মাতে অবস্থিত (রামানুজ)।

সম যার শীলা মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতি বস্তুতে হেয় বা উপাদেয় এইরূপ বুদ্ধিশূন্য (স্বামী, মধু)। প্রাকৃত লোষ্ট্রাদি বস্তুতে সর্ব্বত্র তুল্য দৃষ্টি (বলদেব)। প্রাকৃত বস্তুর স্বরূপ জানিয়া যে সকল বস্তুতে ভোগ্যভাব দূর হওয়া। সকলই যাহার নিকট সমান প্রয়োজন বোধ হয় (রামানুজ)।

সেই যোগী যোগরত—যে এইরূপে যোগরত বা সমাহিত, সেই যোগী (শঙ্কর)। সেই যোগীই অর্থাৎ সেই অনিয়, আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন, পরাবৈরাগ্য যুক্ত হর্ষ, কাম, ক্রোধাদি বিরহিত যোগীই আত্মাবলোকনরূপ যোগাভ্যাসের উপযুক্ত (রামানুজ বলদেব)।

(৯) সুহৃদ্—যে প্রত্যুপকার অপেক্ষা না করিয়াও উপকার করে (শঙ্কর)। পূর্ব্ব স্নেহ বা সম্বন্ধ বিনাও যে উপকার করে (মধু)। যে স্বভাবতঃই হিতকারী (স্বামী)।

মিত্র—স্নেহবান উপকারী।

উদাসীন—পরস্পর বিবাদকারীদের মধ্যে যে কোন পক্ষ অবলম্বন না করে (শঙ্কর, স্বামী)।

মধ্যস্থ—যে ঐরূপ উভয় পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী।

অপ্রিয়—(মূলে আছে "দ্বেষ"—যে আপনার অপ্রিয়, (শঙ্কর) যে দ্বেষের বিষয় (স্বামী)। যে আপনার প্রতি কৃত অপকার অপেক্ষা না করিয়া, উপকার করে (মধু) অরি, পরবাক্ষে অপকারক, আর প্রত্যক্ষে অপ্রিয়ই দ্বেষ্য (গিরি)।

সমবুদ্ধি—কে, কি কর্ম্ম ইহাতে—অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষে বা কার্য্য বিশেষে অব্যাপৃত বুদ্ধি (শঙ্কর)। জাতি গোত্রাদি বিষয়ে ও ব্যাপার বিষয়ে উক্তরূপে যে বুদ্ধি ব্যাপৃত নহে (গিরি)। রাগ দ্বেষ শূন্য বুদ্ধি (স্বামী)।

হয় শ্রেষ্ঠ অতি—মূলে আছে—"বিশিষ্যতে"। ইহার আর এক পাঠ আছে, "বিমুচ্যতে" বা মুক্ত হয় যোগারূঢদিগের মধ্যে এইরূপ সমত্ব বুদ্ধি যাহাদের-তাহারাই শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর)।

(১০) এই শোক হইতে আরম্ভ করিয়া ২৩টী শ্লোক ধ্যানযোগের অঙ্গ প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে।

যোগী—ধ্যানযোগী (শঙ্কর), যোগারূঢ (স্বামী, মধু)। কর্ম্মযোগী (রামানুজ, বলদেব)।

সদা—দীর্ঘকাল (গিরি)। নিরন্তর (শঙ্কর, গিরি)।

আত্মারে—অন্তঃকরণকে চিত্তকে বা মনকে (শঙ্কর, স্বামী)।

যোগরত—চিত্তের ক্ষিপ্ত মূঢ বিক্ষিপ্ত অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে একাগ্র ও নিরোধ অবস্থায় সমাহিত করিবে। (মধু)।

নির্জ্জনে—একান্ত গিরিগুহাদি স্থানে (শঙ্কর)। যোগ প্রতিবন্ধক দুর্জ্জনাদি বর্জ্জিত স্থানে (মধু)। নিঃশব্দ দেশে (বলদেব, রামানুজ)।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যোগের এই অষ্ট অঙ্গ। ইহার মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, ইহাই 'যম'। শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান—ইহাই 'নিয়ম।' গৃহে থাকিয়া যম নিয়ম অভ্যাস চলিতে পারে। তাহার পর, কর্ম্মযোগ দ্বারা শরীর ও মন নির্ম্মল হইলে, গৃহত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়া, যোগের অন্যান্য অঙ্গ অভ্যাস করিতে হয়।

আত্মা—দেহ (শঙ্কর, স্বামী, মধু), মন (রামানুজ)

আশা—তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা (শঙ্কর, স্বামী)। অপেক্ষা (রামানুজ)।

পরিগ্রহ—(৪। ৪১ টীকা দ্রষ্টব্য)। ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "অপরিগ্রহ স্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ" (২। ২৯ সূত্র) অর্থাৎ অপরিগ্রহে স্থির হইলে জন্মান্তর বৃত্তান্ত জানা যায়।

অনাত্ম বিষয়ে মমতা রহিত (রামানুজ)।

বাঙ্গালা ভাষা।

(নানারূপ ও নানামূর্ত্তি।)

যে সুবিস্তৃত রাজ্য কলিকাতার ছোট লাট সাহেবের শাসন ও অধিকার ভুক্ত, তাহার যে অংশে বাঙ্গালা ভাষা "মাতৃভাষা" বলিয়া প্রচলিত, তাহারই নাম "খাস বাঙ্গালা দেশ" অথবা বেঙ্গল প্রপার (Bengal proper.) ইহাই প্রকৃত বাঙ্গালীর বাসস্থান। এই খাস বাঙ্গালায় প্রায় ২৫টি জেলা আছে। সমগ্র ভারতের তুলনায় ইহা অতি সামান্য স্থান; ৪০ কোটি অধিবাসী পূর্ণা সুবিশালা ভারত ভূমির সঙ্গে তুলনা করিলে ইহা নগণ্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। ইংরাজী, উর্দ্দু, হিন্দী, পারস্য প্রভৃতি নানা স্থানে প্রচলিত, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের বাহিরে কোথাও অন্য জাতির মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিতা হয় নাই, কেননা বাঙ্গালী চিরকালই 'গোলামের জাতি।' আমাদের মাতৃভাষার উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু বিস্তৃতি হয় নাই। দুঃখের বিষয়, এই নগণ্য স্বল্প স্থানেও—এই খাস বাঙ্গালা দেশেও—সর্ব্বত্র বাঙ্গালা ভাষা এক মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান নাই। নানাস্থানে নানারূপ ও নানামূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা অবশেষে 'খিচ্‌ড়ি' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উচ্চদরের পুস্তক, সম্বাদ বা সাময়িক পত্রের ভাষা অথবা শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের বাঙ্গালা সর্ব্বথা এক বটে, কিন্তু পুস্তকী ভাষা ছাড়িয়া দিয়া যদি কথোপকথনের ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে এক জেলার গ্রাম্য লোকের কথা অন্য জেলার গ্রাম্য বা শিক্ষিত লোকে বুঝিতে পারে কি না সন্দেহ। মণিপুরে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিতা, তথাকার মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভাষা। তথাকার গ্রাম্য লোকে বলে—

"নাথের কণে ফুক্ করে তা লইছ্‌লাম ডুটা"।

বলুন দেখি, নবদ্বীপের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুরা কথাটা বুঝিলেন কি না? কৃষ্ণনগরের বাঙ্গালা, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিয়া পরিচিতা, কিন্তু মণিপুরের বাঙ্গালার কৃষ্ণনগরকে হারি মানিতে হইবে। বাঁকুড়া জিলার কৃষক কবি গাহিতেছে—

"টুটু ফটু সাঁজের বড়ে, উড়ে গেল খানী।
সোলা মেয়ে কুলে বলে, চশ্‌মে ভোলা ছানী॥"

কলিকাতার সাহিত্যবিশারদ বাবুদিগের ইহাতে বুদ্ধি প্রবেশ হয় কি? সাহিত্যচতুর দীনবন্ধু মিত্রও বোধ হয় ইহার অর্থ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন। বাখরগঞ্জের সেখ সমীরুদ্দীন, পদ্মায় নৌকা চড়িয়া তুফানে নাচিতে নাচিতে আরোহী যাত্রীকে বলিতেছে—

"কর্দ্দাজী! দরিয়ার পাঁচ পীর বদর বদর। চিনহালাম, চেহলাম, হুপানে পাণী কদরাইচে। ডাহা জিলার রামরত্নো সাচু বেহানেছে, হালে পানি পালাম না। ফাল দিয়া উগুর লবো, ডব্ ক্যান্; হুপানে হজর কল্লাম, ফরিদপুরের তন্ সেয়া বোলী, আঁশেতো খায়া হালোনা?"

কিছু বুঝিলেন কি? বলি, সমীরুদ্দীনের বক্তৃতা টা লাগ্‌লো কেমন?

এবারে আরও শুনুন। দীনবন্ধু বাবু "সুরধনী" কাব্যে লিখিয়াছেন—

"কাটোয়ার কাষ্ঠ ভাষা কণ্টকের ধার।
মেয়ে বলে বণিতার ওকারে আকার॥"

সেই কাটোয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের ভাষা শুনাইয়া পাঠকের কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছি।

১। আঠে কাঠে পাঁঠা বাঁধা, ভোলায় মেয়ে মাসী।
চাল বেগুণে চপোড় মারি, তিন তিল্লে খাসী॥
২। আগুণ বেগুণ, হাটে বাটে, হাঁড়ী কোণে লোই।
চপ্‌ড়ু থুয়ে নপড়্ মাগি, সাপ্‌ড়ো বঁঠে রোই॥
৩। গাঁও কোল্লো, মাও কল্লো, কড়ে রাঁড়ী আনা।
ভাতার সালে গোপড়্ বাঁচে, বরের নাহি জানা॥
ঘর জামায়ের তিনটা পা, শালার কাণে টুই।
শ্বশুর খাশুড়ী বিন্দে পেয়ে, ননদ ঝুঁই মুই॥
মাকড়ী লবঙ্গ বালা, পুঁটি, তাবিজ, বাজু কাণ।
মার্‌বো খাংগরা, চটজুতো, পড়্‌বে থান থান॥
ইত্যাদি।

"গোবিন্দ সামন্ত" প্রণেতা, বেঙ্গল ম্যাগাজীন-সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজীলেখক মৃত রেভরেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয়ের যেখানে জন্মভূমি ছিল, সেই গ্রামের কবিতা শুনাইতে ইচ্ছা করি।

(ক) "আয় রৌদ্র হেনে, ছাগল দিব টেনে,
বকৃরীর মা বুড়ী, কাঠ কুড়ুতে গেলি।" ইত্যাদি।
(খ) "কলাপাতা, কলাপাতা, কবল্লা।
অম্‌নী শোম্‌নী পেযে থেযে থেমে যা।" ইত্যাদি।
(গ) "আমার কথাটি ফুর্‌লো, নটে শাকটি মুড়্‌লো,
ক্যান্‌রে নটে মুড়্‌শ ক্যাণে:" ইত্যাদি।
(ঘ) "উবু থুলো বাগ্‌না পাড়া, বরের মাণী রোগ্‌না।
কোণের ছায়া পাতে লাগি, খড়ের টেঁশো টোষণা॥
ছাঁদন তলে, লোড়া মুড়ে, জামাই শালা বোদে।
নাপিত এলো চেলীর রংগে, সাবল দিদি খোদে॥
ঝুণু ঝুণু, লাট্টু শট্টু, মাকড়ীর ঝিনে ঝি।
পান্তাভাতে বেগুণ পোড়া, গরম ভাতে ঘি॥ ইত্যাদি।

সুবিখ্যাত বঙ্কিম বাবু নৈহাটীর নিকটস্থ কাঁটালপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। অনেক দিন হইল একবার কাঁটালপাড়ায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। গ্রীষ্মকাল, জ্যৈষ্ঠ মাস। দুই জনে পথে বেড়াইতে বেড়াইতে একটী কুমারী কন্যাকে এক কলস জল লইয়া আসিতে দেখিলাম। বঙ্কিম বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'গোলাপী, কাল মধ্যাহ্নে আমাদের বাড়ীতে আহার করিতে এলে না কেন?" গোলাপী উত্তর করিল "পাটুখানা সঙ্কুতে বেদে গেল।" শুনিয়াই আমার চক্ষু স্থির হইল, ভাবিলাম বাঙ্গালাভাষার অপার মহিমা!! বঙ্কিম বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন, "Our language needs a regular vi l-lage slang dictionary" পাঠক মহাশয়! এখন বুঝিলেন কি, এক জেলার বাঙ্গালা অন্য জেলার বাঙ্গলা নহে। হুগলীর গ্রাম্য বাঙ্গালা ফরিদপুরের গ্রাম্য বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র; ময়মনসিংহের গ্রাম্য বাঙ্গালা চৈবাসা বা বীরভূমের গ্রাম্য বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শিক্ষিত সমাজেও উচ্চারণ দোষে উচ্চদরের বাঙ্গালাও বুঝা যায় না। ঢাকা জিলার শিক্ষিত বাবু যখন শীঘ্র শীঘ্র বাঙ্গালা বলেন, কলিকাতার বাবু তাহা বুঝিতে পারেন না; পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ পদ্ধতিও জঘন্য। ইঁহারা কর্ত্তা স্থলে কর্দ্দা, ঢ় স্থলে ড়, ঠ স্থলে ট, গর্দ্দভ স্থলে গর্‌ধভ্, বদ্ধ স্থলে বদ্দ অথবা বধ্য উচ্চারণ করেন। দিনাজপুরের সংস্কৃতজ্ঞ অথচ শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের টুলো বিদ্যার্থী যুবার বাঙ্গালা ভাষার এক নমুনা দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে করিতে, যুবা পণ্ডিত কহিতেছেন—(কথাগুলি অবিকল দেওয়া যাইতেছে।)

"সেই যে মুর্ত্তি হোয়েছে শ্যামবর্ণ আর ময়ূরের প্যাখম্ যুক্ত হোয়েছে যে চূড়া (বষ্ঠিতৎপুরুষ হোচ্ছে), এমন যে হোচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার পতি, অঙ্গুলীর উপরে ধোরে রাখ্‌তে সক্ষম হোলেন গিরি গোবর্দ্ধনকে এমন যে গিরিধারী (বষ্টিতৎপুরুষ হোচ্চে) আর যমুনার তটে গোধন চরায়েও চরাতে চরাতে গোপিনীদিগের মন হরণ কর্‌তে পেরেছেন মোহন বাঁশীতে—আহা! সে বাঁশীর ধ্বনির কথা বোল্‌তে নারি গো (সুর করিয়া)—অপ্সরা, গন্ধর্ব্বা, যক্ষ, রক্ষ,

নাগিনীও মোহণ হোচ্ছেন -মানুষের কথাতো সামান্য। সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান (সুর করিয়া) দ্বারকা হতে আস্‌তেছেন, আর রুণু ঝুণু বাজিতেছে নপুর পায়ে—সে পায় পায় কে? সেতো হোচ্ছে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদযুগল। হেথা শ্রীমতী রুক্মিণীর কি দশা বল্‌বো, তাহাতো বল্‌তে নারি গো। একবার শুন্‌তে আজ্ঞা হয়। ভাল ভাল, সেই বর্ষার কাল মেঘের বরণ যে শ্যাম রূপ, তাহাই কৃষ্ণপ্রাপ্ত হোচ্ছেন ঘন ঘন তরে আর বেধে যাচ্চে তাঁহার মনরথ খানি শ্রীমতী রুক্মিণী সতীর প্রণয় জালে গো। অমনি বাজিয়া উঠিল দগড়া, দমামা, জয়ঢাক, নানা বাদ্য। নাচ্‌তে সুরু হোলো স্বর্গের কন্যারা, পুষ্পবৃষ্টি হোলো আকাশ হোতে আর কি বল্‌বো গো। সে শ্যামরূপের (সুর করিয়া) কেবা বর্ণন কবিতে পাবে গো।" ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয়! বোধ হয় এতক্ষণে ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ক্ষমা করিবেন; যশোহর জিলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত কোনও গ্রামের এক ব্যক্তির একখানি পত্র আপনাকে শুনাইতে চাই—*

"আজ্ঞাকারি পতিপাল্য শ্রীভবনাথ গুঁই বহুৎ বহুৎ নমস্কার জানিবা। পরে ৺ কালীমাতার পদ কিরপায় এজনাব ও ওজনার সমস্ত মঙ্গল হয় বিশেশ। পরে তোঁহার খৎখানি মানি কেটা লিখন কোরেছিল ও কেটা রশান কোরেছে, মালুম হোলোনা। কাবাশ আর ধান তুঁই তুঁই হোতেছে, মেগের জল পেলে না। পুষ্কন্নীর জল কবিব শুকনো হোলো। খরচ পাঠানের তন্ বহুৎ বহুৎ লিখন করা গেছে, টাকা আইল না। করুনার দিদির টাকা হোধার বাকী আছে, দিক্ লাগাইয়াছে, সমাহ কেটে গেল।

কছু তামাকু পাঠাইবা। ভবাণীর মেয়ের মাণির বেয়ে শুক্কব শীগর ইচ্ছা আছে জানিবা। ডাক টীকষ কিছু পাঠাইবা। হরনারান দে আয়েন্দা মাহিনায় সুরুতে যশোর তন্ আসবা, হুনার হাতে তামাকু দিবা, কিশম্ ভাল কর্ব্বা। রাজাদের খাজনা বাকী পড়লো, গোমস্তা আনাগোনো ও আরীন্দা আনা গোনো। দিগর মজুষ যশোর যাইবেক, পরে লিখিব। হেথাকার এ বাটীর সমস্ত কুশল জানিবা, হোথাকার কুল খবর হামেশা পরণ কোর্ত্তে গাফীল না হোবা মানী। ইতি তারীক ২৬ পৌশ। ১২৭৯ সাল। ভবনাথ গুঁই।"

পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে পারস্য ও উর্দ্দূ ভাষা আদালতের ভাষা ছিল। ইং ১৮৩৬ অব্দে যবন ভাষা উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা দেশের আদালতের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সময়ের পূর্ব্বেকার দুইখানি পত্র বঙ্গভাষার হিতৈষী মৃত মহাত্মা লং সাহেব সংগ্রহ করিয়া আপনার পুস্তকালয়ে রাখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, লেখকের হাতের অক্ষরগুলির প্রতিকৃতি দেখাইতে পারিলাম না। লিথোগ্রাফ না হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরের মূর্ত্তি দেখাইতে পারিব না। এই পত্র দ্বয়ের লেখক মুসলমান এবং আদালতের মোক্তার। উর্দ্দূ, পারস্য এবং আরবী ভাষা যেমন দক্ষিণ হইতে বামে লেখা যায়, মোক্তার মহাশয় দ্বিতীয় পত্রখানি ঠিক তাহাই লিখিয়াছেন। পত্রখানি অবিকল এই—

(প্রথম পত্র)।

"হজুরে আলা॥ বাদ জনাব কো বহুৎ বহুৎ কোর্নীশহায় বন্দার এই আরজ্ হ্যায় কে বহুৎ রোজ হোতে বন্দা পুকারে আসছে, হজুরে আলায় নেক নজর চাই বেঁওকে তবাহিমে বন্দার মোয়াক্কেল গীরবো ২ হোয়ে উঠ্‌ছে। কেদার শরকার যে ওজর পেশ করিতেছে তাহা না কাবেল মন্‌জুরকা হ্যায় হেতুবাদ উহা শহী আওর শালীমনাহি হোইতেছে আওর কানুনে খেলাপ হইতেছে॥ এ বাবৎ ওমদা হেতুবাদ পেশী না হইবার আরজবন্দ করবা না মাটে হকুম কোরমানা বিষেবী না মনজুর ইহাই আইন বিধি জানিবেক। সেলাম শনে নীবেদন জানিবা॥"

(দস্তখত)।

(দ্বিতীয় পত্র)।

খাঁ। জনাবহায় দরপেশে ওকীল শরকারকা কেয়ার বেহেতু

সাগীম মাকুল সহী মাটে হইবা না মঞ্জুর

* পত্রখানির ব্যাকরণশুদ্ধি প্রভৃতি যেমন ছিল তেমনি রাখিয়াছি। লেখক।

আস্সালোস্তান
অকারণ না হওনে পেশ কছুই ওজর
মক্‌বুল আওব
এত্তাবৎ এই যে নীবেদন সদ্দাব পৌছি-
বার দের * "॥
ছে লায়েক হইবানে মিমাঙ্গসা এক-
তরফা মোকদমা ॥

পাঠক দেখিলেন, উর্দ্দু, আরব্য ও পারস্য ভাষা অজস্রভাবে কেমনে বাঙ্গালা ভাষায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ১৮৮১ অব্দের সুপ্রসিদ্ধ কলিকাতা মহামেলার উপলক্ষে খ্যাতনামা রূপচাঁদ পক্ষী মহাশয় গাহিয়া ছিলেন—

"ক্যালকাটাব একজিবিশন,
নো আড্‌মীশন,
টীকীট বিনে।
ফাটক কোবেছে আটক,
পুলীশ প্রহরী সার্জ্জনে॥"

এখানে সমুদয় শব্দগুলিই ইংরাজী ও উর্দ্দু। এইরূপে হিন্দী, উর্দ্দু, পারস্য, আরব্য, সংস্কৃত গ্রাম্য শব্দ, ইংরাজী, অধিক কি লাটীন, হিব্রু পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়া ভাষাটাকে যেন পঞ্জাবের মুসলমান সম্প্রদায়ের "ইদের খিঁচুড়ী" করিয়া তুলিয়াছে।

এখন বিশুদ্ধ মূল বাঙ্গালা শুনুন—

১। পূর্ব্বদিকে নানা রঙ্গে করিয়া রঞ্জিত।
উজ্জ্বল প্রভায় রবি হোয়েছে উদিত॥

ইহাঁতে 'করিয়া' এবং 'হোয়েছে' ব্যতীত সমস্ত শব্দ সংস্কৃত।

২। শশাঙ্কের উশার্ব্বুদে মারা গেল মার॥
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥

এখানেও 'মারা' 'গেল' 'নাকেতে' এবং 'করে' ভিন্ন সকল শব্দ মৌলিক সংস্কৃত। এবারে খাঁটি ও অকৃত্রিম বাঙ্গালার দৃষ্টান্ত দিতেছি—

১। "কি করি, কোথা যাই; গাছে কি চড়িব?
পীরিতের জ্বালায়, ভাই, মরমে কি মরিব?"

২। নীল বাঁদরে সোণার লংকা কোল্লে ছারখার।
অসময়ে হরিশ মোলো, লংএর হোলো কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার॥"

৩। "ওরাধে, কি সাধে, বালির বাঁধে, পীবিতি কোল্লু।
কালিয়া বঁধুয়া সনে পীবিতি করিয়ে, সব খোয়াইলি।

৪। "পর্ব্বত দুয়ার হোতে যবে বাহিরায়
নদী, কে রোধিবে গতি তার?"

উপরিউক্ত কবিতাগুলি খাঁটি বাঙ্গালা। ইহারই নাম পাকা ও খাঁটি বাঙ্গালা, ইহা বাঙ্গালীর নিজের ধন।

এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সকল উদাহরণ * দেওয়া হইয়াছে, পাঠক মহাশয় তাহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালা ভাষা নানা স্থানে ও নানা সময়ে নানা আকার ও নানা মূর্ত্তি এবং নানা ভাব ধারণ করিয়াছে। কে জানে আরও কত মূর্ত্তি ভবিষ্যতে ধারণ করিবে? কথকের মুখে, যাত্রার দলে, বক্তার বক্তৃতায়, কবির দলে, কথোপকথনে, ইয়ংবেঙ্গলের সম্প্রদায়ে, থিয়েটরে, নাটকে, সংবাদ ও সাময়িক পত্রে, উপন্যাসে, উচ্চ অঙ্গের পুস্তকাবলীতে, বটতলার গ্রন্থে, বাঙ্গালা ভাষার নানা মূর্ত্তি। গ্রাম্য সম্প্রদায়ে বাঙ্গালা ভাষা বিশেষ রূপান্তরিত হইয়াছে।

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালার বর্ণমালা ও অক্ষর এক নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লিথোগ্রাফ না হইলে অক্ষরের রূপ ও মূর্ত্তি দেখাইতে পারিব না। ১২০৩ সালের অক্ষর দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন। তখন 'ল' ছিল না, যেমন ব অক্ষরের নীচে শূন্য দিলে র হয়, তেমনি ন অক্ষরের নীচে শূন্য দিয়া ল হইত। ক্ষ প্রায় ব্যবহৃত হইত না, ঙ অক্ষরের ব্যব-

---

* এই পত্র দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে পড়িতে হইবে।

* অবশ্য "Billingsgate Bengalee"র কথা বলা হইল না। তাহা যেমন বাঙ্গালায় আছে, অন্য ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। সভ্যতামতে তাহা প্রকাশ করা সুরুচি ও সুনীতির বিরুদ্ধ।—লেখক।

হার নাই; চ, ৯, খ, উ, এ প্রভৃতির আকার এখনকার বর্ণমালা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দীর্ঘ উ অক্ষরের কোথাও ব্যবহার দেখি নাই। কোনও শব্দ দুইবার ব্যবহার হইলে, শব্দটী একবার লিখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কযোগ হইত, যথা "কখনও কখনও" শব্দের পরিবর্ত্তে 'কখনো ২', তিনবার ব্যবহার হইলে ৩ দেওয়া হইত, যথা 'ভাল ভাল ভাল' স্থলে 'ভাল ৩' লেখা যাইত।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

রাজা রামমোহন রায়। (২)

রাজা রামমোহন রায়-সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যারত্ন এম-এ, সি-এস্ মহাশয়ের লিপির আলোচনা করিয়াছি; সম্প্রতি যে যে বিষয়ের অব তারণা করিতেছি, পাঠকগণ তাহাতে ক্রমে ক্রমে অনেক সংবাদ জ্ঞাত হইবেন।

প্রথম বিষয়, রাজা রামমোহন রায়ের বংশ-তালিকাদি।—তিনি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন, ইহা যাঁহারা অবগত, তাঁহারা এই বিষয়ের সংবাদ রাখেন না যে, তিনি কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ রাঢ়ীয় শ্রেণী, কি বারেন্দ্র শ্রেণী, বৈদিক শ্রেণী, কি উৎকল শ্রেণী, কি মধ্যশ্রেণী ইত্যাদির মধ্যে তিনি কোন্ নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত, ইহা গোলযোগে পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে নানা কথা, নানা লোকে স্বেচ্ছামত কহিয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত রাজা রামমোহনের কোন জীবন-বৃত্তান্তেই তাঁহার সম্পূর্ণ বংশতালিকা মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের (রাধাপ্রসাদ বাবুর) কনিষ্ঠ দৌহিত্র বাবু নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ও ভ্রান্তি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কেন না, তিনিও লিখিয়াছেন,—

"তাঁহার (রামমোহনের) পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় বিষ্ণু-পরায়ণ।" (১)

"ব্রজবিনোদের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিবাস মুরসিদাবাদের অন্তঃপাতী শাঁকাসাগ্রাম।" (২)

এখানে দুই ভ্রম। প্রথম ভ্রম, কৃষ্ণচন্দ্রের "রায়" উপাধি না লেখা। কৃষ্ণচন্দ্রের উর্দ্ধতন দুই পুরুষ অর্থাৎ তদীয় পিতামহ পরশুরাম প্রথম "রায়" উপাধি পাইয়াছিলেন। নন্দ বাবু কৃষ্ণচন্দ্রকে "বন্দ্যোপাধ্যায়" বলিয়াছেন; কিন্তু তৎপ্রদত্ত অসম্পূর্ণ বংশ-তালিকায় কৃষ্ণচন্দ্রের উপাধি "রায়"! অধিক কি, কৃষ্ণচন্দ্রের পিতারও সেই তালিকাতে "রায়" উপাধি! দ্বিতীয় ভ্রম, রাজার পূর্ব্ব পুরুষগণের শাঁকসায় বাস নয়। তাহার বিচার পরে হইবে।

বিস্তৃত অথচ বিশ্বাস্ত বংশ-তালিকা দিয়া, ঐ ভ্রান্তির মীমাংসার চেষ্টা করিতে হইতেছে। বংশতালিকা মুদ্রিত করিবার আমাদের অপরাপর উদ্দেশ্যও আছে। এই সন্দর্ভে প্রসঙ্গ-বশতঃ তাঁহাদের বৃত্তান্ত উত্থাপিত হইবে, যাঁহাদের সহিত রাজা রামমোহনের কি সম্পর্ক, তাহার পরিজ্ঞান, নিতান্তই আবশ্যক। তদ্ভিন্ন এই প্রবন্ধ-লেখক, শাণিত ক্ষুরাঘাতে যে যে ভ্রম-জঞ্জাল বিনাশ করিয়া যাইবেন, প্রবল যুক্তি, সুতীক্ষ্ণ বিচার, অখণ্ডনীয় প্রমাণ ব্যতিরেকে তাঁহার কি আভ্যন্তরিক এমন স্বত্ব বা সম্বন্ধ আছে, যদ্দ্বারা তিনি

(১) শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়" পুস্তক, ২য় সংস্করণ, ১ পৃষ্ঠা।

(২) "রাজা রামমোহন রায়" ১ পৃষ্ঠা।

উক্ত মত খণ্ডিত করিতে অধিকারী,পাঠকের তাহা বোধগম্য হইবার পক্ষেও বংশ-তালিকা যথেষ্ট আনুকূল্য করিবে।

রাজা. রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার পর কথা,—তিনি কাহার সন্তান? এতদুত্তরে এই মাত্র নির্দ্দেশ করাই পর্য্যাপ্ত যে, তিনি নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান। তিনি সুরাই মেলের কুলীন। এ বিষয়ে তাঁহার নামে যে এক গান প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার একাংশ এই,—"সুরাই মেলের কুল,
বাড়ী খানাকূল,
ওঁ তৎ সৎ ব'লে এক
বানিয়েছে ইস্কুল।
ও সে জেতের দফা
কুলের রফা" * * * ইত্যাদি।

এখানে বলিয়া রাখি—ব্রাহ্ম-সমাজের ইংরেজি-ইতিহাস-লেখক লিওনার্ড সাহেব(৩) ভ্রম-ক্রমে তাঁহাকে "নরোত্তম ঠাকুরের" সন্তান বলিয়া ফেলিয়াছেন! সাহেবের ভ্রান্তি হইবার কারণ বলিতেছি। নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিত্যানন্দ গোস্বামী, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, কেহ কেহ মনে করিতেন। নিত্যানন্দ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্যের সহচর। আর, নরোত্তম ঠাকুরও চৈতন্যদেবের অন্ত-সহচর। এই ভ্রমমূলক সাদৃশ্য ধরিয়া সাহেব ভ্রমে নিপতিত। ফলতঃ নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিত্যানন্দ গোস্বামী দুই স্বতন্ত্র লোক। কেবল নাম-সাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া কেহ কেহ ঐরূপ করিয়া থাকেন। প্রকৃত বিষয় এই,—

"চৈতন্যের এক সহচর নিত্যানন্দও অত্যন্ত মহিমান্বিত ব্যক্তি। তিনিও ভট্টনারায়ণের অন্বয়ে উৎপন্ন; সুতরাং শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়। তিনি অবধূত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, জননীর নাম পদ্মাবতী। * * সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরি (বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁহার পিতামহ (৪)। আমাদের উক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ এই—(ক) "ভট্টনারায়ণ-বংশ গুণে অনুপম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈল নিত্যানন্দ-রাম॥
অবধূত, নাহি ছিল জাতির ভ্রূকুটী।
হরি ব'লে নেয় কোল এই পরিপাটী।" (৫)

(খ) "ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্তধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈ'ল নিত্যানন্দ-রাম॥
মাঘ মাস শুক্ল ত্রয়োদশী দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম, শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা, তাঁরে করি' ব্যাজ॥
রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যথা অবতীর্ণ হৈল নিত্যানন্দ রাম॥" (৬)

তাঁহার পিতৃপুরুষেরা কোন্ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, ইহা লইয়া অনেকে অতিমাত্র প্রবল পরাক্রান্ত নানা ভ্রান্ত মত চালাইতেছেন। রাজা রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ বাবুর কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহনের পূর্ব্ব পুরুষকে মুরসিদাবাদের অন্তর্গত শাঁকাশা-নিবাসী বলেন। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তদ্বর্ণনার নিতান্তই অননুকূল। মুরসিদাবাদের অন্তর্গত 'বেণীপুরে' (৭) তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ বাস করিতেন; কিন্তু "শাঁকাশায়" নয়। বংশ-তালিকা দেখিলেই, বাসস্থান-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

রামমোহন রায়, শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় এবং ভট্টনারায়ণের অন্বয়ে সঞ্জাত। এই বংশীয়েরা কত বার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন,তাহা যাঁহাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য নয়, তাঁহারাই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। বাস-স্থান-পরিবর্ত্তনের তালিকা দেখুন।

(ক) ১ম, ভট্টনারায়ণ—কনোজ হইতে পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সমাগত। ১২বার পুরুষ একাদিক্রমে এখানে তদ্বংশীয়দের বসতি ছিল।

(খ)১৩শ,সঙ্কেত—পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্তর্গত বৃহৎ-বাঙ্গালপাস-বাসী। এখানে ৫ পাঁচ পুরুষের বাস।

(গ) ১৮শ, গোবিন্দ—মুরসিদাবাদের অন্তর্গত বেণীপুর-নিবাসী।

(ঘ) ২৪শ,কৃষ্ণচন্দ্র—খানাকুল-কৃষ্ণনগর-মধ্যবর্ত্তী রাধানগর-নিবাসী।

প্রত্যেক নামের পূর্ব্বে যে যে অঙ্ক দেওয়া গেল, তাহাতে উহাদের পরস্পর কত পুরুষের ব্যবধান,তাহারই সূচনা করিয়া দিতেছে।

(৩) "The ancestors of Ram Mohun Roy on the paternal side were descended from Narottama Thakur, a follower of Chaitanya.—Cf. Sir Leonard's History of the Brahma Samaj," pp 8—9.

(৪) মৎ-সঙ্কলিত বংশাবলী, ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫) কুলবিষয়ক পুস্তকের কারিকা।

(৬) চৈতন্য-ভাগবত।

(৭) এখনও বেণীপুরে রামমোহনের পূর্ব্বপুরুষ পরশুরামের পরিত্যক্ত 'ভিটা' অদৃশ্যমান হয় নাই।

৪ চারি জন, ৪ চারি বার বাসভূমি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, জানা গেল।

পাঠকগণ এখন সম্পূর্ণ বংশ-তালিকা সন্দর্শন করিয়া মনঃপ্রাণ পরিতৃপ্ত করিয়া লউন। আমরা বহুদিনের শ্রমে ও যত্নে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, পাঠকগণ তাহাতে নিমেষ-মাত্র দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলেই, অতি সুগম উপায়ে অতি দুর্গম বিষয়, তাঁহাদের আয়ত্তীকৃত হইবে।

বংশ-তালিকা—শাণ্ডিল্য-গোত্র।

ক্ষিতীশ (ইঁহার ২ পুত্র)
|
১। ভট্টনারায়ণ (কনোজ হইতে বঙ্গে আনীত)
|
২। আদিবরাহ
|
৩। বৈনতেয়
|
৪। সুবুদ্ধি
|
৫। বিবুধেশ (৫ পুত্র)
|
৬। গুঁই (গুহ, গাঁউ [দ্বিতীয় পুত্র] ইঁহার ৭ পুত্র।
|
৭। শঙ্খাধর (ইনি সপ্তম পুত্র। ইঁহার ৭ পুত্র)
|
৮। গহন্দো, বহুল, পশুপতি বা সুহাস (ইনি ৭ম পুত্র। ইঁহার ৩ পুত্র)
|
৯। শকুনি (ইনি ১ম পুত্র)

আহলন | ১০ মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (কুলীন)
|
১১। মহাদেব (৩ পুত্র)
|
১২। দুর্ব্বলি (ইনি ৩য় পুত্র। ইঁহার ৫ পুত্র)
|
১৩। সঙ্কেত (বৃহৎ-বাঙ্গালপাশ)

১৪। উৎসাহ (১০ পুত্র) | বৎস
|
১৫। মধু
|
১৬। নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
|
১৭। বরদানন্দ (বরাই) (৫ পুত্র)
|
১৮। গোবিন্দ (২য় পুত্র) (সম্ভবতঃ বেণীপুর-নিবাসী)
|
১৯। কমল মিশ্র (৬ পুত্র)
|
২০। রামনাথ (১ম পুত্র) (৩ পুত্র)
|
২১। সুন্দরাচার্য্য (২য় পুত্র) (৩ পুত্র)
|
২২। পরশুরাম রায় (২য় পুত্র) (৮ পুত্র)
|
২৩। শ্রীবল্লভ (৬ষ্ঠ পুত্র) (৮ পুত্র)
|
২৪। কৃষ্ণচন্দ্র (৭ম পুত্র) (৩ পুত্র) (থানাকুল-কৃষ্ণনগরে আগত, তদন্তর্গত রাধানগর-নিবাসী)
|
২৫। ব্রজবিনোদ (৭ পুত্র)
|
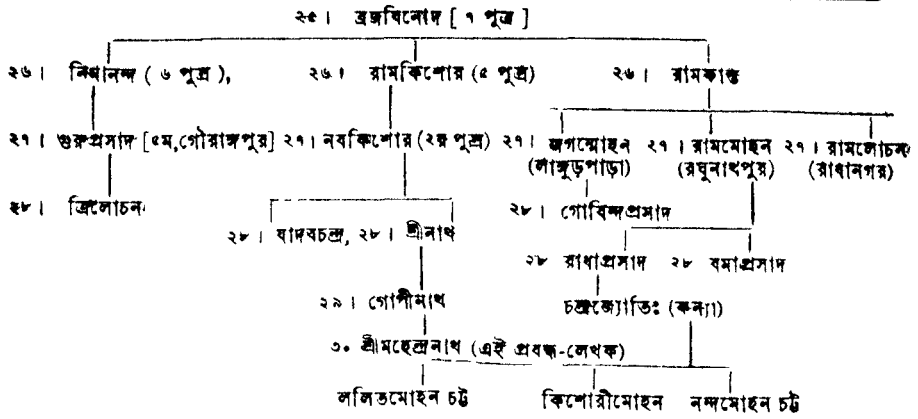
দ্বিতীয় বিষয়।—নব্যভারতের পাঠকদিগকে রাজা রামমোহনের জন্মাব্দ, জন্ম-মাস-সম্বন্ধে অজ্ঞ বা অন্ধীভূত অবস্থায় রাখা অনুচিত। সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি-এস মহাশয়ের নব-প্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণেও আমাদের প্রদর্শিত ভ্রম শোধিত হয় নাই (৮)। ইহা ক্ষোভের বিষয়। 'জন্মভূমি' পত্রে ইহার বিশেষ বিচার হইয়াছে। তিনটি মত, এতৎসম্পর্কে প্রচলিত ছিল,—

১। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ।
২। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।
৩। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

১১৭৯ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহার উদ্ভব হয়। বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা রমাপ্রসাদ বাবুর পত্নীর নিকট রামমোহন রায়ের কোষ্ঠীর অনুসন্ধান করি। যে বৎসর অশ্বিন মাসে তল্লাস করি, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাদ্র মাসে (৯) উহা গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

রাজার জন্মাব্দ-ঘটনা, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারির ইণ্ডিয়ান্ মিরারে পাদরি ডল্ সাহেব নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাদরি ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচার করেন, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল; অতএব বর্ত্তমান বর্ষে (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে) রামমোহনের জন্মের শতাব্দী অতীত হইল। ডল্ সাহেব, এত কাল উহা প্রচার করিবার অবসর পান নাই। তিনি যে সুযোগ, অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সে সুযোগ, ম্যাক্‌ডোনাল্ডের ঐ লেখা।

তৃতীয় বিষয়—রামমোহন রায়ের বাঙ্গাল হস্তাক্ষর। তাঁহার ইংরেজী হস্তাক্ষর সক-

(৮) পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে", বাবু কালীময় ঘটক "চরিতাষ্টক" প্রথম ভাগে, বাবু দ্বারকনাথ বসুর সঙ্কলিত "জীবনীকোষ" প্রভৃতিতে রামমোহনের জন্মাব্দ ভুল হইয়াছে।

(৯) বাঙ্গালা পুরাতন কাগজে লিখিত দলিল-দস্তাবেজ, ভাদ্র মাসে রৌদ্রে দেওয়ার পদ্ধতি এ প্রদেশে রহিয়াছে। তদনুসারে দলিলের সঙ্গে ঐ কোষ্ঠী-খানিও প্রতি বর্ষ সূর্য্যোত্তাপ লাগাইতে রৌদ্রে দেওয়া হইত। ঐ বৎসর ভাদ্রে রৌদ্রে দেওয়ার সময়েই উহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়।

এই মর্ম্মবিদারণ ঘটনার পর অস্মৎ-প্রদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গৃহে রামমোহন রায়ের কোষ্ঠীর রাশি-চক্র অন্বেষণ করিয়াছিলাম। সেখানে উহার অস্তিত্ব ছিল। এই মাত্র সন্ধান পাইলাম যে, ঝটিকা বার বার হওয়ায় উহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। জন্ম-দিন-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে সুতরাং হতাশ হইলাম। এতদর্থে আমাদের অনুসন্ধিৎসার ও শ্রমের পণ্ড্য। এই খানেই সমাপ্তি হইল।

লেই না হউন, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাহা মুদ্রিতও হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার বাঙ্গালা হস্তাক্ষর প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রকাশ করা তো দূরের কথা। অল্প লোকের ভাগ্যেই তাঁহার হস্তলিপি দেখা ঘটিয়াছে। "শ্রীসহী" এই অংশটুকু দেবনাগর অক্ষরে তিনি লিখিতেন। সুপ্রাচীন সময়েও রামমোহন, সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষার বর্ণমালার লিখনে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহার সুব্যক্ত নিদর্শন আমরা দেখিতেছি। তাঁহার হস্তাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিলাম। একটী নয়, তাঁহার হস্তাক্ষর আমরা বহুক্লেশে ৬ ছয়টী সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে তিনটীর পরিচয় ও বৃত্তান্ত মাত্র এস্থলে পাঠকের নেত্র পথের পথিক হইবে। ঐ সকলের ভাষার জন্য রামমোহনের কৃতিত্ব বা দায়িত্ব নাই। তাঁহার কর্ম্মচারীদের মূর্ত্তিমতী ভাষাদেবী এখানে সুশোভমানা। এই সূত্রে তৎকালে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা—বিশেষতঃ জমিদারি-সেরেস্তার কেতা ও কায়দার পরিচয়, পাঠকগণ বিদিত হইয়া কৌতুক ও কোতৃ-হল যুগপৎ অনুভব করিতে থাকুন। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি সু-ভূম্যধিকারীই ছিলেন; কিন্তু উৎপীড়ন বা অত্যাচার যে তাঁহার ছিল না, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে।

যে লিপিগুলি প্রদর্শিত হইতেছে, সেগুলি জরা-জীর্ণ—কীট দষ্ট। অতএব তাহাদের সাত্ত্বিকতায় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদি কাহারও আমাদের উক্তিকে সংশয়াপন্ন জ্ঞান হয়, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় অথবা আমাদের নিকট সমাগত হইয়া হইয়া মূল বস্তু পর্য্যব-লোকন করিয়া যেন তৃপ্তিলাভ করিতে কুণ্ঠিত না হন।

"শ্রীশ্রীহরি।
সন ১২০২।

শ্রীরামমোহন রায়।

১। "মৌজে সাহানপুরের কটকিনার মোকর্দ্দম কর্ম্মচারী সুচরিতেষে। লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে। রাধানগরের শ্রীনবকিশোর রায়ের জমাই জমী জে আছে ফষল আটক রাখিয়াছ জানাইলেন। খাজনা লইয়া ফষল ছাড়িয়া দিবে। ইতি। সন ১২০২ সাল তারিক ১২ চৈত্রী।"

"শ্রীশ্রীরাম।
সন ১২০৫।
সং ভুরসিট্ট।

শ্রীরামমোহন রায়। ৺বিশ্বাসে জমিদার কাসিদেব" (১০)।

২। "সুপ্রতিষ্ঠিত শীঅভয়চরণ দত্ত সুচরিতেষু।

লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে শীযুত মধ্যম জেঠা মহাশয় এখান হইতে ফষল্ছাড়ি চিঠি লইয়া যাইতেছেন। মাফিক চিঠি ফষল ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে কোন ওজর না আইসে। ইতি। সন ১২০৫ সাল তাং ১৯ ফাল্গুন।"

যে গ্রামের জমি খালাস দেওয়া হয়, পর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা এইরূপ আছে,—

"মহল জায়—

কাবিলপুরে	১
কেদারপুরে	১
ধামলা	১
চিঙ্গড়াদীং	১
	৪ চারি মহল"।

(১০) এইটুকু রাজা রামমোহনের হস্ত-লিখিত নয়। ইহার দুই কারণ। প্রথম কারণ "বিশ্বাসে" শব্দে বানান ভুল। দ্বিতীয় কারণ, নাম-[illegible] লেখায় ও এই অংশের লেখায় বিলক্ষণ পার্থক্য।

"শ্রীশ্রীহরি।"

সন ১২০৪।

পং ভুরসুট।

৩। "মৌজে কাবিলপুবদিগরের কটকিনাব মোকর্দ্দম ও কম্মচাবী সুচবিতেষু।
লিখনং কাযানঞ্চাগে। সাং বাধানগরের শ্রীরামকিশোর রায় ও শ্রীকার্ত্তিচন্দ্র রায়দিগর ইহাদের শ্রীশ্রী৺ সেবার দেবত্তর ও ব্রহ্মত্তর জমি নিজ দরুণ ও খরিদকী দরুণ মৌজে হায়ে যে আছে বাজে জমির সরওয়া মতে হজুর ইস্তাহারের হুকুম মাফিক গুজস্তা পয়স্তা ভোগ প্রমাণ এ সকল জমির ফসল বৃত্তিভোগীর জিম্মা করিয়া দিবে। জলধরচাদিগর বেমামুল তলব না করিবে। ইতি তাং ১২ই ফাল্গুন।

জায় মৌজা		জের—	১১	রায়বাড়	১
কাবিলপুর	১	খড়িগেড়া	১	আটঘরা	১
কেদারপুর	১	জুগীকুণ্ড	১	সুদামচক	১
ধাওলা	১	সোলা	১	অযোধ্যা	১
শ্রীরামপুর	১	আস্তা	১	কলাহার	১
কাট্যাদল	১				
চক … …	(*)	… … …	(*)		২৩
দীঘচক	১	রঞ্জিতবাটী		তেইশ মৌজা ইতি।"	
চক্‌জয়রাম	১	জগীকুণ্ড	১		
গৌরাঙ্গপুর	১	বাসুচক			
চিঙ্গড়া দীং	১	দং খরিদকি	১		
লাউসর	১	মড়াপালি	১		

এই ক্ষেত্রে একাধিক লিপি—তিন খানি জমিদারি ছাড়্ চিঠি উদ্ধৃত করিয়াছি। ১২০২ সাল, ১২০৪ সাল ও ১২০৫ সালের রামমোহন রায়ের হস্তাক্ষর উহাতে রহিয়াছে।

প্রথম খানিতে নবকিশোর রায়ের নাম আছে। তিনিই রামমোহন রায় মহোদয়ের জেঠতুতো ভাই। তিনি রামমোহনের বয়োজ্যেষ্ঠও বটেন। এই লিপি-খানির বয়ঃক্রম অধুনা শতাধিক বর্ষ। এখন ১৩০৩ সাল চলিতেছে। উহা ১২০২ সালের; সুতরাং উহার বয়স ১০২ বৎসর হইতেছে।

তৃতীয় লিপিতে রামকিশোর ও কীর্ত্তিচন্দ্র রায় এই দুই জনের নাম ও প্রসঙ্গ বিদ্যমান।

(*) এ স্থলটী খণ্ডিত—পোকায় কাটিয়া দিয়াছে।

প্রথম ব্যক্তি, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত। দ্বিতীয় ব্যক্তি, এই জ্যেষ্ঠতাতেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই লিপিতে দেখা গেল, যে ২৩ তেইশ খানি গ্রামের ভূমি, রামমোহনের কর্ম্মচারীরা আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ২৩ তেইশ খানি হইতেই আবেদন কারি-দ্বয় অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ইতিপূর্ব্বোল্লিখিত নবকিশোর রায়, এই রামকিশোর রায়ের মধ্যম তনয়।

দ্বিতীয় লিপি খানি, জমিদার-সুলভ ভাষায় লিখিত নয়। কারণ, এখানে "মধ্যম জেঠা মহাশয়" বলিয়া নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইতেছে। "মধ্যম জেঠা" রামকিশোর রায় মহাশয় কি না, পাঠকগণ, বংশ-তালিকা তজ্জন্য দেখুন। এ-খানিতে ৪ চারি খানি গ্রামের জমির কথা আছে। এখানে তাঁহার এক কর্ম্মচারীর নামও অবগত হওয়া গেল। তাঁহার নাম "শ্রীঅভয়চরণ দত্ত"।

এই সকল লিপিতে বর্ণাশুদ্ধি যথাবৎ রাখিয়া দেওয়া গিয়াছে।

আগামী বারে অন্যান্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

ভারত, মিসর ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। (৪)

ইতিহাস-রসিক ইংরাজগণ ভারতে আসিয়া এখানকার প্রত্নতত্ত্ব সমুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতের স্থানে স্থানে যে সকল বৌদ্ধ কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল, তৎপ্রতি তাহাদের দৃষ্টি কাজেই আকৃষ্ট হইল। অশোকের শাসন সমুদায় একে একে সমুদ্ধৃত এবং তাহাদের অর্থ সংগৃহীত হইলে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা ইতিহাসে যে আলোকপাত হইয়াছে, সেই আলোকে এখন দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে খ্রীষ্টধর্ম্ম-অভ্যুদয়ের অনেকাংশে সহায়তা হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ইউরোপে যখন ফাইলোর দার্শনিক মতামতের আলোচনা হইয়াছিল, তখন এক প্রকার স্থিরীকৃত হয় যে, ফাইলো-প্রচারিত ঐশ্বরিক ত্রিবৃৎতত্ত্ব হইতে যীশুর ত্রিবৃৎতত্ত্ব গৃহীত। এই সিদ্ধান্ত শুনিবা মাত্র যীশুর অবতারবাদী খ্রীষ্টানেরা একবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহারা রাগে বলিয়া উঠিলেন, কি, এলেকস্যাণ্ড্রিয়ান স্কুলই যীশুর ত্রিবাদ হইতে নিজ মত সংগ্রহ করিয়াছেন। কথাটা ফেরত দিয়া তাহারা নিবস্ত হইলেন। লুইস বলিতেছেন :—

"Some maintain that the Trinity of the Christians was but an imitation of that of the Alexandrians; others accuse the Alexandrians of being the imitators The dispute has been angrily conducted on both sides"

এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মালোচনায় জানা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মেও তদ্রূপ ত্রিবৃৎতত্ত্ব বিদ্যমান আছে। সুতরাং থ্যারাপিউটগণ মিসরে যে এই মত প্রচার না করিয়াছে, এমত নহে। Arthut Lillie বৌদ্ধ ত্রিবাদের সহিত খ্রীষ্টীয় ত্রিবাদের সৌসাদৃশ্য দেখাইয়া স্বীকার করিলেন যে, খ্রীষ্টীয় ত্রিবাদ অবশ্য বৌদ্ধ ত্রিবাদ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে লোকে বলিয়াছিল, তাহা ফাইলো হইতে সংগৃহীত। বৌদ্ধমত তখন যদি জানা থাকিত এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকেরা যে মিসরেও গিয়া নিজ ধর্ম্মমত সকল প্রচার করিয়াছিলেন, একথাও যদি বিদিত থাকিত, তাহা হইলে

খ্রীষ্টানেরা এত নির্ভয়ে অপরাধটা ফিরাইয়া দিতে সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধ ত্রিবাদ কি, তাহা আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে ব্যক্ত করিয়াছি, এক্ষণে ফাইলোর ত্রিবাদ লুইসের কথায় বলিতেছি :—

"There is first God the Father, second ly the Son of God, i.e the Logos, thirdly the Son of the Logos, i.e. the World"

তবেই ফাইলো বলিতেছেন, পরমেশ্বরই সকলের আদি, তাঁহা হইতেই সমস্ত ভূত প্রসূত হইয়াছে। সুতরাং তিনি একমাত্র জগতের কারণ এবং সর্ব্বজীবের পিতৃস্বরূপ। পিতৃপ্রেমে সর্ব্বজীবের শুধু বিধাতা নহেন, তাহাদের পালনকর্ত্তাও তিনি। সর্ব্বজীব তাঁহার পিতৃ-অঙ্কে অবস্থিত। সেই এক মাত্র সৎ হইতে যাহা উৎপন্ন,—তাহা চিৎThought,--Word Logos—জ্ঞান, জ্ঞানময় শব্দ। এই জ্ঞানময় সৎ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া তাহা সতেরই পুত্রস্বরূপ এবং ঐ শব্দই ব্রহ্ম-প্রকাশক আপ্তবাক্য। খ্রীষ্টানেরা বলেন, যীশু এই পুত্রস্বরূপ আপ্তবাক্য। ফাইলো বলেন, সেই সূক্ষ্ম চৈতন্য-স্বরূপের স্থূলদেহ এই অনন্ত প্রকৃতি—প্রধানা—বা, জগৎ। তাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈঃ আঃ ব্র ৮।অং ১ম।

প্রাচীন মিসর-ধর্ম্মালোচনায়ও জানা যায় যে, সেই ধর্ম্মেও ত্রিবাদ বিদ্যমান ছিল। উচ্চ মিসরীয় ধর্ম্মান্তর্গত থিবের ত্রিবাদ এই :—

First—Amun-Ra, the hidden Creator
Second—His Consort Mat, the Mother.
Third—Chonsu, his Son.

"আমনরা" বা অব্যক্ত আদি কারণই এই জগতের পিতৃস্বরূপ। তাঁহারই জায়া জগৎ জননী "মাত"। এই পুরুষ প্রকৃতি হইতেই অনন্তদেব "চনসু" সমুৎপন্ন।

থিবের বিখ্যাত ত্রিবাদ এই। সিলসিলিস (Silsilis) নামক স্থানে এই ত্রিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রহ্মের এই পিতৃভাব, মাতৃভাব ও পুত্রত্ব শুধু যে উক্ত মিসর-ধর্ম্মান্তর্গত ছিল, এমত নহে, তাহা গ্রীক ত্রিবাদেও বিদ্যমান ছিল। গ্রীক ত্রিবাদ এই :—

"High above all the other Gods stands Zeus, whose power is unlimited, who is not bound by any recognised restraint, and is alone not subject to the will of the majority * * * Most closely connected with him are Athena and Apollo, who constitute with him a supreme triad"—Dr. C P Tiele

"গ্রীকদিগের সর্ব্ব প্রধান দেবতাই Zeus অসীম তাঁহার শক্তি—যে শক্তি অবিরোধী ও অননুশাসনীয় এবং তিনিই কেবল অপরাপর দেবতার অধীন নহেন। তাঁহারই সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ Athena এবং Apollo দেবতা। এই ত্রিদেবই গ্রীকদিগের ত্রিবৃৎতত্ত্ব।

এথিনা এবং এপলো কে, তাহা মহোদয় টীল বুঝাইতেছেন :—

"Athena is the personified Metis, the "Reason" the wisdom of the Divine Father Apollo, no less beloved of Zeus is his mouth, the revealer of his counsel, the Son, who, ever and in all things, is of one will with Him."

এথিনাই সাক্ষাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব (Metis) বা পরম পিতার চৈতন্য ও জ্ঞান-স্বরূপ; তদ্রূপ তদাত্ম এপলো Zeus এর আত্মজ, তাঁহার মুখ এবং বাণী স্বরূপ।

ডেলফায়ের (Delphi) বিখ্যাত মন্দিরে এই এপলোর বাণী প্রচারিত হইত। এই বাণী শুনিবার জন্য কত লোক মন্দিরে আসিয়া হত্যা দিত। ফাইলোর ত্রিবৃৎতত্ত্বে যাহা পরম পিতার আত্মজ রূপে উক্ত হইয়া দ্বিতীয় তত্ত্ব হইয়াছে, সেই তত্ত্বের সহিত এপলোর সাদৃশ্য কেমন ঘনিষ্ট দেখুন। এই এপলো-দেব সম্বন্ধে টীল মহোদয় আর যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"Then it was that the knightly people of the Lycians, kinsmen of the Greeks,

and their fore-runners in civilisation, wrought out the noble figure of Apollo, the God of light, the son and prophet of the most high Zeus, Saviour, Purifier and Redeemer, whose cultus lifted high above all nature-worship, spread thence over all the lands of Greece, and exerted on the religious, moral and social life of their inhabitants so profound and salutary an influence.

"গ্রীকশোণিত যাহাদের শিরায় প্রবাহিত হইত, যাহারা গ্রীকদিগের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত করেন, লিলিষাব সেই বীরপুত্রগণও সেইকালে এপলোদেবের সৌম্য মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন—যে এপলো জ্যোতিঃ স্বরূপ, দেব দেব পরমদেব জিয়সের আত্মজ ও বাণীস্বরূপ, যিনি মুক্তি শুদ্ধিদাতা, পতিত-পাবন এবং যাঁহার দেবশক্তি প্রাকৃতিক শক্তি অপেক্ষা প্রভূত প্রভাবশালিনীরূপে অনুভূত হইয়া গ্রীশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, এমত কি, গ্রীশদেশবাসিগণের সামাজিক, নৈতিক ধর্ম্ম্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অভ্যুদয়ে সেই শক্তির প্রভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।"

তবেই দেখা যাইতেছে যে, গ্রীকদিগের এই এপলো দেব শুদ্ধ যে দেবদেব পরমদেব জিয়সের আত্মজ ও বাণীস্বরূপ ছিলেন এমত নহে, তিনি মুক্তি, শুদ্ধিদাতা পতিত-পাবন ছিলেন। তাঁহার পূজা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার পবিত্র দেবভাব কোথায় না অনুভূত হইত? সেই দেবভাব গ্রীশের সীমান্ত দেশে, কিনিসিয়া, লিডিয়া, সমস্ত গ্রীকদ্বীপে এবং তাহারও অতীত অনেক দূরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীশ অতিক্রম করিয়া জুডিয়া এবং সিরিয়াতেও তাহা গিয়াছিল। কারণ, তৎকালে গ্রীশের সহিত অনেক দেশ বিদেশ বাণিজ্য এবং গ্রীকবিদ্যা-শিক্ষা সূত্রে আবদ্ধ ছিল। গ্রীশের বড় বড় পণ্ডিত ও কবিগণ, হিসিয়ড (Hesiod) শোলন (Solon) পাইথাগোরস (Pythagorus) এবং পীণ্ডার (Pindar) ডেলফায়ের এপলো দেবের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এসকাইলস্, সফোক্লিশ এবং ফিডিয়াসের নাটকাবলীতেও সেই দেব-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্যাগধর্ম্ম এবং বলিদানে সক্রেটিসের বড় আনন্দ ছিল। পিতৃধর্ম্ম এবং ডেলফায়ের দৈববাণীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি অনুভূত হইত। এপলোদেবের পূজার তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যে দেববাণী এপলোর মন্দিরে তিনি শুনিতেন, সেই দেববাণী এক এক সময়ে তাঁহার নিজ অন্তর হইতে সমুত্থিত হইত। যে অন্তরাত্মা হইতে এইরূপ দৈববাণী সমুত্থিত হইত, সেই অন্তরাত্মা তাঁহার নিকট দেবতা ছিল—ভক্তির দেবতা। সেই সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো। প্লেটো ভক্তির সহিত প্রেম মিশাইয়া ভগবানের পূজায় অনুরক্ত হইলেন। প্লেটোর অন্তরে ভগবান এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন—সত্যং, শিবং, সুন্দরং। প্লেটোর সুন্দর কি?

"Beauty is the most vivid image of Truth, it is Divinity in its perceptible form"—Lewes

সুন্দরই সত্যের উজ্জ্বল প্রতিমা—এইরূপে পরম পুরুষ মানবের জ্ঞানগোচর হন।"

তবেই প্লেটোর মতে সুন্দরই পুরুষোত্তমের বাহ্যরূপ ও বিভূতি।—তাই যদি হয়, তবে শিব কি?

"The Good is God. Truth, Beauty, Justice are all aspects of the Deity,—Goodness in his nature The Good is therefore incapable of being perceived; it can only be known in Reflection".—*Lewes.*

"ব্রহ্মই—শিবম্। সত্যং, শিবং, সুন্দরং—এ সমস্তই এক ব্রহ্মেরই রূপ—সমস্তই শিবময় ভগবান। ভগবানের শিবময় রূপ সামান্য জ্ঞানগোচর নহে—তাহা কেবল ধ্যানে অনুভূত হয়।"

বাস্তবিক, বাহ্যসৌন্দর্য্যে আমরা ভগবানের মূর্ত্তি দেখিতে পাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয় ত কেবল শিবময় নহে; সকল বিষয়ই কিয়দংশে শিবময় কিয়দংশে অশিবময়।

তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ভগবানের মূর্ত্তি কই? প্লেটো বলিলেন, যদি ভগবানকে দেখিতে চাও, তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে অমঙ্গলকে অপসারিত কর। কিরূপে করিবে? ধ্যানে করিবে। কেবল সমাহিত চিত্তে তুমি ভগবানের অনুধ্যান করিলে তাঁহার মঙ্গলময় মূর্ত্তি অনুভব করিতে পারিবে। সেই মূর্ত্তিতে তিনি পরম পবিত্র স্বরূপ, অপাপবিদ্ধ, শিবময় মহাদেব। তবে প্লেটো ভগবানে এই ত্রিবৃৎতত্ত্ব দেখিতে পাইলেন।

"Truth, Beauty, Justice are all aspects of the Deity".

তিনি সত্যস্বরূপ আদিদেব; পরম পবিত্র শিবরূপ সত্যের সূক্ষ্ম প্রতিমা, এবং সুন্দর রূপ তাঁহার ধর্ম্মনৈতিক ও স্থূল জগৎ প্রতিমা।

প্লেটোর শিষ্য কাইলো এ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাইলো এই খানেই থামেন নাই। লুইস বলেন :—

"There are two great facts in connection with the Alexandrian School : *First*, the union of Platonism with oriental Mysticism ; *Second*, the entire new direction given to philosophy by uniting it once more with Religion."

"এলেক্স্যাণ্ড্রিয়ান স্কুলের দুইটী বিশেষ ধর্ম্ম এই—প্রথমতঃ এই সম্প্রদায়েরা প্লেটোর দার্শনিক মতামতের সহিত প্রাচ্য যোগোপলব্ধ তত্ত্ব সকল মিশাইয়া এক নূতন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ তাহারা দর্শনের সহিত ধর্ম্মের সম্মিলন সাধন করিয়াছিল।"

প্লেটোর যাহা দার্শনিক তত্ত্ব, কাইলো তাহাতে যোগোপলব্ধ সামগ্রী দিয়া ধর্ম্মে পরিণত করিলেন।

প্লেটোর সত্যস্বরূপ আদিদেব আদিকারণ রূপে পিতৃস্বরূপ; শিবরূপ সত্যের সূক্ষ্ম প্রতিমা কেবল ধ্যানে অনুভূত বলিয়া ভগবানের সেই মূর্ত্তি জ্ঞান ও চৈতন্যস্বরূপ। সত্যস্বরূপের মূর্ত্তিভেদ রূপে চৈতন্যস্বরূপ পরম পিতৃদেবের পুত্র এবং এই চৈতন্যরূপে তিনি ধ্যানে ভগবানের মুখস্বরূপ ও বাণী। এই চৈতন্যরূপে তিনি মানবের বেদবাণী—আপ্তবাক্য। সক্রেটিস তাঁহার এই দেববাণী শুনিতেন—সমাহিত চিত্তে একাগ্রতার সহিত শুনিতে পাইতেন। এই চৈতন্য-রূপিণী পরমাসুন্দরী। ধর্ম্মনৈতিক জগতের সকল সৌন্দর্য্য জ্ঞানময়ে অনুভূত হয়। সেই সুন্দর জ্ঞানময় স্থূলরূপে বাহ্যজগতে পরিদৃশ্যমান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্যময়ী প্রকৃতি দেবীর রূপ। দার্শনিক সাংখ্যতত্ত্ব যেরূপে পৌরাণিকেরা পূজোপকরণে গড়িয়া আনিয়াছেন, ফাইলো সেইরূপ গড়িয়া আনিলেন। সত্যস্বরূপ পুরুষ আদিকারণ পরম পিতা,—সূক্ষ্ম, চৈতন্যময়ী প্রকৃতি—যিনি কেবল ধ্যানে অনুভূত, সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতি অনন্তরূপে মহৎ তত্ত্ব,বুদ্ধি ও প্রধানা প্রকৃতি। এই মহৎ তত্ত্ব, প্রধানা, অনন্তপ্রকৃতি অহঙ্কার-ভূষিত বিশেষ রূপ ধারণ করিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে প্রতীয়মানা। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্য এই সাংখ্যতত্ত্বে নিহিত।

ফাইলো আলেকজাণ্ড্রিয়ায় গিয়া বৌদ্ধগণের নিকট এই সাংখ্যযোগতত্ত্ব লাভ করিলেন। প্লেটোর ত্রিবাদকে তদনুসারে গড়িয়া আনিলেন। তখন ফাইলোর ত্রিবাদ এইরূপে পরিণত হইল;—

"We can, however, have some knowledge of God in the Word which is the Interpreter between God and man. The word is God's thought. This thought is two-fold—Thought embracing all Ideas, and thought as thought, and it is the thought realized—thought become the world."—*Lewes.*

সত্যস্বরূপ অজ্ঞেয় হইলেও আপ্তবাক্য তাঁহার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছে। আপ্তবাক্যই একমাত্র পরমপুরুষকে মানবের নিকট প্রকাশ করে। বাস্তবিক এই বাক্য জ্ঞানময়। চৈতন্যস্বরূপ ভগবানের বাক্য সিদ্ধগণের

অন্তরে শ্রুত হয়। তাহাই মহাশব্দ, মহাবাক্য। সেই চৈতন্যস্বরূপ ভগবানের দুইরূপ। একরূপে তিনি কেবল সূক্ষ্ম চৈতন্যময়—ধ্যানে অনুভূত। প্লেটো এইরূপকে Idea বলিয়াছেন। তাঁহার অন্য চৈতন্যরূপ চিন্তাময়। চৈতন্যরূপ চিন্তামণি ব্যক্তরূপে পরিণত হন। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সেই চৈতন্যরূপের ব্যক্তরূপ—চিন্তামণি স্থূলরূপে ব্যক্ত।

সক্রেটিস যে এপলোদেবকে এত ভক্তি সহকারে দেখিতেন, বলা বাহুল্য, সেই পূজার্হ এপলোদেব আবার ফাইলোর অন্তরে দেখা দিলেন। সেই এপলোদেব সত্যস্বরূপ পরম পুরুষের বাণী (Oracle) পুত্র। যিনি পরম পবিত্র হইয়া এপেলোদেবের নিকট যান, তিনিই কেবল এপলোর দৈববাণী শুনিতে পান। নহিলে পাপমলিন হৃদয়ে এপলোদেবের নিকটবর্ত্তীও হইবার যে ছিল না। কেবল শুদ্ধচিত্তই সমাহিত হইলে এপলোদেবের বাণী শ্রুত হয়। এইজন্য এপলো দেব পতিতপাবন, মুক্তি ও শুদ্ধিদাতা। ইতিহাসবেত্তা কি বলিতেছেন, দেখুনঃ—

"For him who approached with a pure heart, a single drop of the consecrated water of the well of Castalia sufficed, but he who came with an impure mind could not wash away with a whole ocean the pollution of his sin".—*Tiele*

"যিনি শুদ্ধচিত্তে, নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হৃদয়ে তাঁহাকে পূজা করিতে যাইতেন, তাঁহার পক্ষে পবিত্র ক্যাষ্টিলিয়া বাপীর এক ফোঁটা বারিই যথেষ্ট। কিন্তু যাহার হৃদয় অপবিত্রও পাপ মলিন, সমস্ত সমুদ্র বারির স্নানে তাহাকে পবিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ করিতে পারে না।"

পাপমলিন হৃদয়ে এপলোর পূজা করিতে গেলে পরকালে তাঁহাকে দণ্ডার্হ হইতে হইত।

এ সকল স্থূল কথা; সূক্ষ্ম কথা আভ্যন্তরিক পবিত্রতা। এই স্থূলকথা আমাদের কাশীধামেও দৃষ্ট হয়। যিনি নিষ্পাপ, জ্ঞানবাপীর এক ফোঁটা জল তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি সেই শুদ্ধচিত্তে ও ভক্তিসহকারে যদি কাশীনাথকে দেখেন, তবে তিনি শিবময় ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। নহিলে সমস্ত গঙ্গাজলে পাপীকে পবিশুদ্ধ করিতে পারে না।

এপলোদেবের ভগিনী এথিনী (Athene) কে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তিনি কেবল সূক্ষ্ম চৈতন্যময়ী অনন্ত প্রকৃতি।

ভগবানের এই পিতাপুত্র-সম্বন্ধ জ্ঞাপক ত্রিবৃৎতত্ত্ব নিম্ন মিসরে অতি প্রাচীন কালে প্রচারিত ছিল। সেই তত্ত্বে জগতের আদি কারণ পরম পিতা Osiris-Ra তাঁহার জ্ঞানময় চৈতন্যতত্ত্বই, দ্বিতীয় তত্ত্ব—যিনি সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধির দেবতা ছিলেন—তাঁহার নাম Thut. এই দেবতা চৈতন্যরূপা বাণী স্বরূপ। তৃতীয় তত্ত্ব পুত্ররূপ Horos. এই পুত্ররূপে Osiris Ra দেখা দিতেন এবং সেই আত্মজেই পরমাত্মা বিদ্যমান থাকিতেন। পিতা পুত্র একই বস্তু। এই দেখুন, এই ত্রিবৃৎতত্ত্ব নিম্ন মিসরের পৌরাণিক ধর্ম্মে কিরূপে দেখা দিয়াছিল ;—

"The triumph of life over death is rather the subject of the myth of Osiris, the chief God of the Empire, specially worshipped in Thinis Abydos. Osiris slain by his brother Set—lamented by his wife and sister Isis and Nephthys—endowed by Thut, the God of Science and Literature with the power of the Word—is avenged by his son Horos, and, while himself reigning in the kingdom of the Dead, lives again in him on earth."—*Tiele.*

নিম্ন মিসরের ধর্ম্ম যখন ক্রমে ক্রমে উচ্চ মিসরে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং যখন মিসরদ্বয়ের মিলন হইয়াছিল, তখন থিবে এই ত্রিবৃৎ তত্ত্ব কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। তবেই

দেখা যাইতেছে, যীশুর ত্রিবৃৎতত্ব কিছু নূতন বস্তু নহে। পরমেশ্বরের ত্রিবিধ মূর্ত্তি বৈদিক কাল হইতে প্রচারিত আছে। পুরাতন মিসরে সেই জ্ঞান বিদ্যমান ছিল; দেবার্চ্চনরত প্রাচীন গ্রীশে তাহা বিলক্ষণ পরিচিত ছিল। নানাসূত্রে তাহা ফাইলোর জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। ফাইলো যীশুর পূর্ব্বে নিজ মত প্রচার করিয়াছিলেন। ফাইলোর মত জুডিয়ায় অপ্রচারিত ছিল না; তাহা সেই সূত্রে যীশুর কর্ণগোচর হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, ফাইলো হইতে যীশুর ত্রিবাদ সমুত্থিত হইয়াছে। এ বিষয় আর একরূপেও প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

যীশুর ত্রিবাদ তত্ত্ব খ্রীষ্টজগতে আর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ফাইলোর ত্রিবাদে যে জ্ঞান নিহিত ছিল, যাহা প্রাচীন কাল হইতে ধারাবাহিক ক্রমে এলেক্স্যাণ্ড্রিয়ান স্কুলে উদিত হইয়াছিল, তাহা এমত সজীব জ্ঞান তত্ত্ব ছিল যে, ক্রমশঃই তাহা আলোচিত হইয়া আরও অধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

"Plotinus said, that although Dialectics raises us to some conviction of the Existence of God, we can not speak of his nature otherwise than *negatively*. We are forced to admit his existence. To say that he is superior to Existence and Thought is not to define him; it is only to distinguish him from what he is not. What he is, we can not know; it would be ridiculous to endeavour to *comprehend* him The unity which is absolute, immutable, infinite and self-sufficing, hence Perfect, is not the numerical unit, not the indivisible point. It is the absolute universal One in its perfect simplicity. It is the highest degree of Perfection, the ideal Beauty, the supreme Good. God, therefore, in his absolute state, in his first and highest hypostasis, is neither Existence nor Thought, neither moved nor mutable: He is simple unity or as Hegel would say the Absolute Nothing, the immanent Negative."—*Lewes.*

প্লোটাইনস বলিয়াছিলেন যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ জানা মনুষ্যের জ্ঞানাতীত। সসীম চিন্তা ও অনুধ্যানে তাঁহার কিয়দাভাস লাভ করা যায় বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে তিনি "নেতি"। তিনি ইহা নয়, উহা নয়, এ বস্তু নয় ও বস্তু নয়, নয় নয় শব্দ মাত্রে তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় মাত্র। তাঁহার সত্তা আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ, অস্তিত্বের অস্বীকার ও তাঁহার অস্বীকার সমান হইয়া দাড়ায়। যখন তাঁহাকে অস্তিত্ব ও জ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিলে, তখন তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ দিলে না, তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিলে না; কেবল তিনি যাহা নহেন, সেই অবস্থা হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া ব্যাখ্যা করিলে মাত্র। বাস্তবিক তিনি যে কি, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। তাঁহাকে সম্যক্ বুঝিবার জন্য প্রয়াস করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যাহা সৎ অপরিচ্ছিন্ন সত্য, যাহা অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য, অনন্ত এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বলিয়া পূর্ণ স্বরূপ, তাহা গণিতের সামান্য একত্ব নহে, তাহা জ্যামিতির আনুমানিক অপরিচ্ছিন্ন বিন্দুও নহে, তাহা শুদ্ধমাত্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী একমেবাদ্বিতীয়ং। তিনি পূর্ণ হইতে সম্পূর্ণ, সুন্দর হইতে সর্ব্বসুন্দর; শিবময় হইতে সদাশিবময়।

অতএব, মানুষী চিন্তাকে যত বিস্তৃত কর না কেন, তাহার উপরে তিনি অবস্থিত। সেই চিন্তাতীত অপরিচ্ছিন্ন পরম তত্ত্ব অস্তিত্ব নহেন, জ্ঞানও নহেন। তিনি চৈতন্য ও সত্তা হইতেও পৃথক। তিনি কেবল একমাত্র সৎ অথবা যেমন হিগেল বলিয়াছেন, তিনি অচিন্তনীয় অভাব মাত্র, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্লীন "নেতি"।

এই স্কুলের আর একজন পণ্ডিত প্রোক্লস এই চিন্তাকে আরও প্রসারিত করিয়া বলি-

য়াছেন যে, সত্তা ও অস্তিত্ব বলিলেও তাহা মানুষী চিন্তার্গত হইল; কিন্তু তিনি অচিন্ত্য, অস্তিত্ব; তিনি অস্তিত্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ। তাঁহাকে কিছু নয় বলা ঠিক নহে, বরং তাঁহাকে অস্তিত্বাতীত পদার্থ বল।

"He is the unconditioned unconditional Something or that which Proclus calls the Non-being although it is not correct to call it Nothing."—Lewes.

প্রোক্লস ব্রহ্মতত্ত্বকে আরও সূক্ষ্ম করিয়া বুঝাইলেন। মানবের যে সত্তাজ্ঞান হয়, সেই সত্তাজ্ঞানও কিয়দংশে চিন্তাধীন; সুতরাং সেই সত্তাজ্ঞানে ত্রিগুণময় জড়জ্ঞান বর্ত্তমান। কিন্তু পরম পুরুষ সেরূপ সত্তাজ্ঞানেরও অতীত। অতএব, তিনি পরম পুরুষজ্ঞান হইতে সত্তা জ্ঞানকে বিভিন্ন করিয়া বলিলেন, সেই পুরুষ Non-Being.—অস্তিত্বজ্ঞানাতীত বস্তু। সুতরাং প্রোক্লসের Non-Being যাহা, সাংখ্যের নির্গুণ, উদাসীন পুরুষও তাহা। সাংখ্য সেই সত্তাজ্ঞান হইতে পরমপুরুষকে প্রভিন্ন করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি নির্গুণ, উদাসীন, সেই পুরুষজ্ঞানে সত্তাজ্ঞানের ত্রিগুণময় জড়ভাব নাই। ত্রিগুণময় সত্তাজ্ঞান মূল প্রকৃতিজ্ঞান। এই মূল প্রকৃতি শুদ্ধ সত্যস্বরূপ ও চিতের অধ্যাস পাইয়া অনন্ত প্রকৃতিকে পরিণত। প্রোক্লস বৌদ্ধধর্ম্মোপদিষ্ট সাংখ্যজ্ঞান অবলম্বন করিয়া সাংখ্যের নির্গুণ, উদাসীন পুরুষকে Non-Being বলিয়াছেন। প্লোটাইনস ব্রহ্মতত্ত্বকে যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, প্রোক্লস তাঁহাকে আরও বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন মাত্র। কারণ, প্লোটাইনস "নেতি নেতি" বলিয়া সেই ব্রহ্মতত্ত্বকে সত্তাজ্ঞান হইতেও পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সত্তা নন; তবে যদি তাঁহাকে সত্তা বল, সে সত্তা চৈতন্যময়। তিনি সৎ চিৎ। তিনি চিদ্রূপ সত্তা স্বরূপ।

প্লোটাইনস যখন এই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইলেন, তখন তিনি যে ত্রিবাদের খ্যাপন করিলেন, তাহা ফাইলোর ত্রিবাদ হইতেও সূক্ষ্মতর। প্লোটাইনসের ত্রিবাদ এই:—

"God is triple and at the same time one. His nature contains within it three distinct Hypostases (substances i.e., persons) and these three make one Being. The first is the Unity, not the Being at all, but simple Unity. The second is the Intelligence which is identical with Being. The third is the Universal Soul, the Cause all activity and life

First—The absolute Unity
Second—The first Intelligence.
Third—The Soul of the world

পরমতত্ত্ব পরমপুরুষ ত্রিবিধ অথচ এক। তাঁহার স্বরূপ ত্রিবিধ দেবসত্ত্ব, সেই ত্রিবিধ দেবসত্তায় তাহার একত্ব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি এক,—যাহাকে সত্তা বলা যায়, সেই সত্তা হইতে পৃথক হইয়া তিনি এক। দ্বিতীয়তঃ তিনি চৈতন্য স্বরূপ; এই চৈতন্যরূপে তিনি অস্তিত্ব স্বরূপ। তৃতীয়তঃ তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমতত্ত্ব, পরমাত্মা—যে পরমাত্মা সকল চেতনের চেতন, সকল জীবনের জীবন।

প্লোটাইনসের ত্রিবাদ এইরূপ। ব্রহ্মতত্ত্বকে তিনি অচিন্ত্য জ্ঞান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিবার তিনি উপায়ও বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অচিন্ত্য বলিয়া কি একেবারে মানবের অলভ্য? তাহা নহে, ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে নিজে ব্রহ্মত্বলাভ করিতে হয়। বাহিরের পরমাত্মতত্ত্বের সহিত ভিতরের আত্মতত্ত্বকে একীভূত করিতে হয়। এইরূপ একীভূত পরমজ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে। প্লোটাইনসের এই কথা তৃতীয় প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে।

প্লাটাইনসের ত্রিবাদ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, তন্মধ্যে সৃষ্টি প্রকরণ নিহিত। নির্গুণ হইতে সগুণের সম্ভব এবং

সূক্ষ্ম সগুণেরই স্থূল ব্যক্ত ভাব এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আরও প্রতীত হইবে যে, এই সৃষ্টি প্রকরণ সাংখ্যের পরিণামবাদ এবং বেদান্তীয় বিবর্ত্তবাদ মাত্র।

The doctrine of Emanation.

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংশ্রবে আসিয়া ফাইলো এবং তদুপরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ কেমন বৈদিক ব্রহ্মতত্ত্ব এবং সৃষ্টি প্রকরণের খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা বিবৃত করিলাম।

উপরে আমরা দ্বিবিধ যুক্তি দ্বারা দেখাইলাম যে, যীশুর ত্রিবাদ কেমন ধার করা জিনিষ। প্রথম যুক্তি এই, হয় ফাইলো হইতে যীশু তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, না হয়, যীশু হইতে ফাইলো তাহা লইয়াছিলেন। এই বিকল্পের মধ্যে প্রথম পক্ষই সম্ভবতঃ সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। কারণ,ফাইলোর ত্রিবাদ তত্ত্ব জানিবার অনেক পন্থা ছিল, পৌরাণিক গ্রীকধর্ম্মে তাহা বিদ্যমান ছিল, এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচার সঙ্গে তাহা মিসরের বিদ্যালয়ে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন মিসরের ত্রিবৃৎ তত্ত্ব জ্ঞান যে সেই বিদ্যালয় মধ্যে প্রবেশ করে নাই, এমত ও সম্ভাবিত নহে। এইরূপ নানা দেশ হইতে ফাইলোর মত গঠিত হইয়া থাকিবে। যীশুর উদয় হইবার পূর্ব্বে ফাইলোর মত সকল জুডিয়া মধ্যে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং যীশু সম্ভবতঃ ফাইলো হইতেই সেই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় যুক্তি এই—ফাইলোর মত যেমন পূর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রচারের ফল, সেই চিন্তা-স্রোত তেমনি পর পর চলিয়া গিয়াছিল, সেই খানেই নিবৃত্ত হয় নাই। ফাইলো যে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী পণ্ডিত প্লোটাইনস এবং প্রোক্লস সেই চিন্তাস্রোতকে আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাহাদের দার্শনিক মত কত উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু যে দেশে সে চিন্তা মূলেই ছিল না, সেই খ্রীষ্ট জগতে যীশূপদিষ্ট ত্রিবাদ আর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই।

ফাইলো হইতে যে যীশু তাহার ত্রিবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা বলি নাই, বহুকাল পূর্ব্বে অনেক উদারচিত্ত সত্যসন্ধ খ্রীষ্টানগণই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীশে যে ত্রিবাদ প্রচারিত ছিল, তন্মধ্যে এপেলোদের লোকের শুদ্ধি, বুদ্ধি ও মুক্তিদাতা ছিলেন। চিত্তের মলিনতা থাকিলে এপলোদেবের পূজাধিকারী হইবার যো ছিল না। যীশুও জীবের শুদ্ধি ও মুক্তিদাতা। পবিত্র আত্মা (Holy ghost) ভগবান এবং যীশুর সহিত জীবের মিলন করিয়া দেন। বৌদ্ধ ত্রিবাদেও এই কথা। সুতরাং বৌদ্ধ ও গ্রীক ত্রিবাদের সহিত যীশুর ত্রিবাদের আরও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। কি বৌদ্ধ, কি গ্রীক, উভয় ত্রিবাদই যীশু জন্মিবার পূর্ব্বে প্রচারিত ছিল, এবং তাহা যীশুর কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিবারও অনেক সুযোগ ছিল; কারণ, যীশুর সময়ে তাহার স্বদেশেই গ্রীক বিদ্যার সম্যক আলোচনা হইত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারকেরাও তখন সেই অঞ্চলে গিয়া বৌদ্ধ মত-সমস্ত প্রচার করিয়াছিলেন। সিরিয়া এবং ব্যাবিলনে যে বিশয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল, RenAn তাহা বলিয়াছেন এবং অশোকের শাসনেও প্রকাশ যে, তিনি সিরিয়া প্রভৃতি পঞ্চ যবনরাজ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। এই শাসনের ইংরেজী অনুবাদ দ্বারা সকল সংশয় দূর হইয়াছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া যায়,তাহা আর লোককে বলিয়া দিতে হয় না। সিদ্ধান্ত এই,যীশুপদিষ্ট ত্রিবাদ তাঁহার নিজ সম্পত্তি নহে। এই ত্রিবাদ মধ্যে যে প্রেম-তত্ত্ব নিহিত আছে,আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, সে প্রেম-তত্ত্বও যীশুর নিজ সম্পত্তি নহে। তন্মধ্যে যীশুর নিজ সম্পত্তি কি ছিল, তাহা আমরা পর প্রস্তাবে প্রদর্শন করিব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

সাধ্বী অঘোরকামিনী।

জেলা খুলনার অন্তর্গত শ্রীপুর (টাকী) গ্রামে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয়া অঘোর কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺বিপিন বিহারী বসু মহাশয় একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। সে সময়ে, এদেশে, বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয় নাই। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃ গৃহে লেখা পড়া আদৌ শিক্ষা হয় নাই। দশ বৎসর বয়সে উক্ত গ্রামেই সাধু চরিত্র প্রকাশ চন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে আসিয়া সেকালে বালিকাদের বিদ্যা শিক্ষার কিরূপ সুবিধা হইত, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বালিকা অঘোর কামিনী শ্বশুরালয়ে আসিয়া স্বামীর সাহায্যে,অতিশয় গোপনে, পাঠাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। রন্ধন শালায় চুল্লীর আলোকে কিম্বা চন্দ্রালোকেই পড়িতে হইত; এবং অঙ্গারখণ্ড কিম্বা পুঁই ফলের রস ও কাঠি দ্বারা ধরা পৃষ্ঠে হস্তলিপি অভ্যাস করিতে হইত। ঈদৃশ প্রতিবন্ধক সত্বেও তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্গলা লিখিতে পড়িতে এবং হিসাব রাখিতে শিখিলেন। তাঁহার হস্তলিপি দেখিলে স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর বলিয়া মনে হইত না। বহুদিন পরে তিনি ইংরাজী ভাষা শিখিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাতেও কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় এতাদৃশ ছিল যে, তিনি "পারিব না" একথা কখনও মুখে উচ্চারণ করিতেন না।

গৃহকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বালিকা বধূ শ্বশুরালয়ের বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে রন্ধনাদি গৃহকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আবার যখন অল্প দিন পরেই পুরাতন কুসংস্কার পরিত্যাগ করা অপরাধে স্বামীসহ শ্বশুর গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল, তখনও সেই ক্ষুদ্র গৃহিনী স্বল্প আয়ের মধ্যে সুন্দররূপে সংসার চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী অপেক্ষাকৃত সামান্য কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ডেপুটি-মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন; কিন্তু, কোন সময়েই তাঁহাদের দ্বার দুস্থ আত্মীয় কিম্বা বন্ধুগণের প্রতি বদ্ধ হয় নাই। প্রত্যুত, তাঁহাদের গৃহে সকল সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ এবং ব্রাহ্মমাত্রেই সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। এই নব দম্পতির ৩ পুত্র এবং ২ কন্যা জন্মে। তাহাদের সহিত সমান স্নেহে অনেক গুলি পিতৃ মাতৃ হীন বালক বালিকা ইঁহাদের গৃহে পালিত হইতেছিল। আজ তাহারা "দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইলাম" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। যদিও দশমবর্ষে বিবাহ হয়, তথাপি শ্রীমতী অঘোর কামিনী বিবাহের দিন হইতেই স্বামীকে কিরূপে সুখী করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের নিত্যব্রত করিয়াছিলেন এবং, সাধু স্বামীর পরিচালনায় সাধ্বী স্ত্রী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিজ্ঞার বল ছিল—সাধু ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া যাহা

কর্ত্তব্য মনে করিতেন, পর্ব্বতসম বাধা বিঘ্ন তাঁহাকে তাহা হইতে টলাইতে পারিত না। তত্রাচ স্বামীর ঈদৃশ আজ্ঞাকারিনী ছিলেন যে, বিবাহ-বাসর হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কখনও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। পবিত্র আধ্যাত্মিক মিলনের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ইহারা দুটি আত্মাকে এক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এরূপ মিলনই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে।

জনহিতৈষণায় দেবী অঘোর কামিনী এ দেশীয় মহিলাদের মধ্যে উচ্চে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় এবং আশ্চর্য্য কার্য্যদক্ষতা, পরের দুঃখ, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির দুঃখ মোচনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বাঁকিপুরের বালিকা-বিদ্যালয়টী উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে, ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সে, কন্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে, লক্ষ্ণৌ নগরে গিয়া কুমারী থোবর্ণের ছাত্রীনিবাসে কিছুদিন থাকেন। সেখান হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি মহিলা মিসনরীদিগের ন্যায় অদম্য উৎসাহে উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা এবং শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিহার প্রদেশে এবং পশ্চিমাঞ্চলে বালিকাদের শিক্ষার সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি বাঁকিপুরে একটী ছাত্রীনিবাস স্থাপন করিবার সংকল্প করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া নিজ গৃহেই অনেকগুলি বালিকাকে রাখিয়া তাহাদের শিক্ষার সহায়তা করিতেছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, স্ত্রীশিক্ষা এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের সহায়তার জন্য একটী "নারী-সমিতি" সংস্থাপিত করেন। গৃহকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং স্কুলের নিয়মিত কার্য্য করিয়াও তিনি যখনই কোন স্থানের দুরবস্থা, পীড়া, কিম্বা বিপদের সংবাদ পাইতেন, তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হইতেন, এবং সেবা, সান্ত্বনা অথবা অন্য প্রকার সাহায্য দান করিতেন। অনেক সময়, নিজের শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া, রাত্রিকালে বিপন্ন বন্ধুর সাহায্য করিতে গিয়া স্বীয় স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেন। সূতিকাগারে রোগশয্যায় শায়িত বিপন্ন কত দরিদ্র নারীর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, এই সহৃদয়া নারী, পূতিগন্ধময় গৃহ স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন।

অল্প বয়সেই স্বামী কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, স্বীয় স্বভাব-সুলভ বিশ্বাস ও ধর্ম্মোৎসাহের বলে সাধ্বী অঘোর কামিনী ব্রাহ্মসমাজের ভক্ত শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। সামাজিক উপাসনায় ইঁহার প্রভূত উৎসাহ ছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় মাঘোৎসবে যোগ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন, সে সময়ে প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া ৩।৪ টী পুত্র কন্যাকে আহার করাইয়া, অন্যান্য অনেক মহিলার পূর্ব্বে উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব রজনীতে গৃহের সকলকে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিবার জন্য মন্দিরে যাইতে অনুরোধ করেন; বলিলেন "কেবল একজন থাকিলেই আমার চলিবে।" আচার্য্য কেশব চন্দ্র তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন যে, "আমার জীবনের একটী প্রধান বাসনা এই যে, জগতের সমক্ষে স্ত্রীচরিত্রের একটী আদর্শ দেখাই। যদি আপনার মত একজন মহিলা পাই, তাহা হইলে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।" এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার জীবনের প্রভূত উন্নতি হয়। ৩০।৩১ বৎসর বয়সে স্বামীসহ আধ্যাত্মিক উন্নত জীবন যাপন করিবার ব্রত গ্রহণ করেন; এবং কয়েক বৎসর পরে রমণীসুলভ

বসন-ভূষণপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। স্বামীর সম্পন্ন অবস্থা হইলেও তিনি দরিদ্রের মত থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার গৃহে পরমেশ্বরের নাম সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইত। যিনি একবার তাঁহার প্রার্থনা কিম্বা উপাসনাদিতে যোগ দিয়াছেন, তিনিই তাঁহার প্রেম ও ভক্তির গভীরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের উদাহরণ স্বরূপ, শিশু দৌহিত্রের বিয়োগ-জনিত দারুণ শোক যখন তাঁহার করুণ হৃদয়ে প্রথম আঘাত করে, সেই সময়কার একদিনের প্রার্থনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আমাদের শিক্ষার জন্য শিশুকে এখানে পাঠাইয়াছিলে, প্রভু। শিশু ক্ষুদ্র জীবনে যাহা দেখাইয়া গেল। তাহা যেন উত্তমরূপে শিখিতে পারি। শিশু যেরূপ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আলোক দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইত, আমি যেন তোমাকে দেখিবার জন্য সেইরূপ ব্যাকুল হই। সে যেমন উষার তরুণ সূর্য্য পানে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত ও তাহার মধ্যে তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া সমস্ত দিন হাসিত, আমিও যেন প্রতিদিন প্রাতঃকালে তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া লই এবং সেইরূপ বিমল হাসি হাসিতে শিখি।"

নির্ম্মল শিশু জীবনকে আদর্শ করিয়া পাঁচ মাসের মধ্যেই পুণ্যবতী "পবিত্র শিশুদিগের রাজ্যে"র উপযুক্ত হইয়া পুণ্যধামে চলিয়া গেলেন!

নানা প্রকার পরিশ্রমে শরীর ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল বলিয়া তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই জ্বর হইল। জ্বরের দ্বিতীয় দিনেও রাত্রি ৯টার সময় একটী পীড়িত বন্ধুকে দেখিয়া আইসেন। ক্রমে বাতের আক্রমণে রোগ বৃদ্ধি হইল। ভয়ঙ্কর রোগ-যন্ত্রণা ধীরভাবে বহন করিয়া, সকলের প্রতি মিষ্ট বাক্য ব্যবহার করিতেন। যন্ত্রণা যখন কিছুতেই উপশম হইতেছে না দেখিলেন, তখনও চিকিৎসা পরিবর্ত্তন অথবা অন্য কোন উপায়ে রোগ উপশম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। রোগের সময়, তাঁহার ইচ্ছানুসারে দৈনিক উপাসনা তাঁহার শয্যা গৃহেই হইত এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতার মধ্যেও উপাসনার সময় উঠিয়া বসিতেন এবং নিজে একটু প্রার্থনা করিতেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আর বাঁচিবে[illegible]ভিন্ন স্থান হইতে আগত বন্ধুদের নিকট [illegible] লইয়াছিলেন। মৃত্যুর ৩৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—

"সুবোধ, সাধুপথে চলিও, কখনও অসৎ পথে যাইও না, আমি আর কিছু রাখিয়া যাইতে পারিলাম না।" "তোমরা কাঁদিও না, দেখ, আমি কাঁদিতেছি না। সেদিন চখে জল আসিয়াছিল বলিয়া দুদিন দেরী হইল।"

১৫ই জুন সোমবার, রোগ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিশ্বজননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। শান্তিদাতা তাঁহার আত্মাকে শান্তি বিধান করুন!

এক সময়ে, বাবু হরিগুরু রুদ্র, স্ত্রীবিয়োগজনিত শোকে কাতর হইয়া, এই পরিবারে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি কাটোয়া হইতে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, সাধ্বী অঘোর কামিনীর জ্বলন্ত বিশ্বাস, ভক্তি, এবং কর্ম্মযোগের তাহা এক অপূর্ব্ব ইতিহাস। তাঁহার পত্রের শেষাংশ এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

"এক্ষণে দেবী অঘোর কামিনীর পারিবারিক দৈনিক জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হইত তৎসম্বন্ধে দুই একটী বিষয় উল্লেখ করিব।

তিনি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া সন্তানদিগকে লইয়া মাতৃস্তোত্র পাঠ করিতেন। পরে তাঁহার স্বামীর প্রাতঃকালীন উপাসনার * জন্য উপাসনা-গৃহের বস্ত্র

* কখন কখন মধ্যাহ্নেও এই উপাসনা হইত।

সকল যথাস্থানে বিশ্রাস করিয়া আমাদিগকে উপাসনা লয়ে ডাকিতেন। উপাসনান্তে আমাদিগকে কিছু কিছু খাইতে দিতেন। ইহার পর আমরা স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেলে, গৃহের অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্তা হইতেন। বাড়ীর দাস দাসী হইতে গৃহিণীর কার্য্য সকলই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কখন কখন তিনি স্বহস্তে ঐ সকলের কার্য্য করিতেন। পরিবেশন কার্য্য নিজেই করিতেন এবং ইহাতে তাঁহার বড়ই সুখ হইত। আমরা সকলেই এক সঙ্গে খাইতে বসিতাম। পাছে লোকসান হয়, এজন্য একেবারে সমস্ত অন্ন পাতে না দিয়া অল্প অল্প দিতেন। তাঁহার ঐরূপ শৃঙ্খলা ও স্নেহমাখা পরিবেশনে মনে হইত, যেন নিজের জননীর নিকটেই আহার করিতেছি। বেকালে কার্য্য হইতে বাড়ী আসিলে স্বয়ং আমাদের জলখাবার প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেন। সন্ধ্যার সময় ছেলে কয়েকটাকে লইয়া উপাসনা গৃহে বসিয়া ঈশ্বর স্তোত্র পাঠ ও শ্লোক সংগ্রহ হইতে শ্লোক পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতেন। এই সময়ে গৃহের অন্যকাজ থাকিলে আপনার বড় কন্যার উপর ঐ কার্য্যের ভার দিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংসারের কর্ত্তব্য পালনে এক দিনের জন্যও তাঁহাকে বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখি নাই। কি সুখজনক কি দুঃখজনক, সকল কার্য্যে তাঁহাকে প্রফুল্লচিত্তে করিতে দেখিয়াছি।

অনেক পরিবারে দেখিয়াছি, কার্য্য বশতঃ কোন লোক আসিয়া যদি কোন পরিবারে আশ্রয় লন, তাহা হইলে গৃহস্থ হয়ত দুই কি তিন দিবস তাঁহার সেবা শুশ্রূষা পরম সমাদরে করিতে থাকেন। কিন্তু ৪র্থ কি ৫ম দিবসে, প্রকাশ্যে না হউক, অপ্রকাশ্যেও তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ বিরক্তি দেখাইতে থাকেন। আমি যে পরিবারের কথা এতক্ষণ বলিলাম, তাহাতে এ সম্বন্ধে এক উদারভাব বরাবর দেখিয়াছি। এখানে যে কোন রূপ লোক যে কোন কার্য্যের জনাই আসুন না কেন, এবং তিনি কার্য্য সমাপ্তির জন্য যত দিনই থাকুন না কেন,তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে তাঁহার যত্ন করিয়াছেন। এ পরিবারে কোন বিষয়েই কখনও বাড়াবাড়ি দেখি নাই। সকলই পরিমিত, সকলই শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সকলই নিয়মিত। এজন্যই যতদিন এখানে ছিলাম, এক দিনের জন্যও সুখ শান্তির ব্যাঘাত হয় নাই বা চিত্ত কোন প্রকারে বিকৃত হইবার অবসর পায় নাই।

ঋণ শত্রুকে এই পরিবারে প্রবেশ করিতে দেখি নাই। কোন কোন মাসের শেষে দৈনিক খরচের কিছু অনাটন হইলে, পরিবারস্থ সকলকেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় আহারের জন্যও কষ্ট সহ্য করিতে দেখিয়াছি, তথাপি ঋণ করিতে অথবা কোনরূপে কর্ত্তব্যের পথ হইতে অবসৃত হইতে দেখি নাই। অনেকে মনে করিতে পারেন, যে পরিবারের আয় এত টাকা,সে পরিবারে কষ্ট বা কেন হইবে এবং তজ্জন্য বা ঋণ করার প্রয়োজন কি? যদি আজি কালিকার সুসভ্য নামধারী মহাপুরুষদিগের পরিবারের ন্যায় কেবল কর্ত্তা কর্ত্রী লইয়াই পরিবার হইত এবং কেবল মাত্র নীচ স্বার্থসুখ সংসাধন করাই পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে এরূপ কথা একদিন সম্ভব হইত। কিন্তু আমি যে পরিবারের কথা বলিতেছি, তাহাত কেবল কর্ত্তা কর্ত্রী লইয়াই নহে। তাহা দুঃখী, তাপী, অভাবগ্রস্ত সকলের জন্য অবারিত। সে পরিবার জগৎ মাতা জগদ্ধাত্রীর ভাণ্ডার। এখানকার অভাব সম্ভাবের আগমনী মর্ত্ত্যে স্বর্গের আগমন। এই পরিবারের অভাবগ্রস্ত লোকদিগের মুখে কি সুষমা। ইহাদের অশ্রুজলে সেই প্রেমময়ের মুখজ্যোতি পড়িয়া কি পবিত্র সৌন্দর্য্যেই সমুদায় গৃহ সুশোভিত হয়। ইহাই মহাত্মা যিশুর সংসারে স্বর্গের দৃশ্য।

বিষয় সম্ভোগে অনাসক্তি—আজ কয়েক বৎসর হইল বাঁকীপুরে অবস্থানকালে একদিন শীতকালে বাড়ীতে কতকগুলি লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে সকলেরই লেপের প্রয়োজন। আমি মনে করিতে লাগিলাম, এতগুলি লোক, কি করিয়া সকলের জন্য লেপের যোগাড় হইবে। বাড়ীতে যত গুলি লেপ ছিল, সমস্তই আনয়ন করা গেল। কোন রূপে আমাদের সকলেরই এক প্রকার অভাব পূর্ণ হইল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা রাত্রির পর আবার কয়েকজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা কি রূপে রাত্রিযাপন করিবে ভাবিতেছি। সুবোধকে বলিলাম। সুবোধও ইতস্তত করিতে লাগিল। কিন্তু মা ইহার সংবাদ পাইয়াই, কোথা হইতে তাহাদের জন্যও শীত নিবারণ হইতে পারে, এরূপ কতকগুলি কাপড় আনিয়া দিলেন। উহাতেই আমাদের সকলের অভাব পূর্ণ হইল।

কিন্তু আমার মনে কে যেন বলিয়া দিল, অদ্য রাত্রিতে মাকে শীতে বড় কষ্ট পাইতে হইবে। পরদিন প্রাতে উঠিয়া, সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিলাম সুবোধ, শেষের শীত নিবারণের জন্য যাহা আনিলে, তাহা কে দিল এবং কিরূপেই বা পাইলে? উত্তরে সুবোধ বলিল, মা নিজের গাত্র বস্ত্র খুলিয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি শীত ভোগ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এত কষ্ট পাইয়াছেন কিন্তু তজ্জন্য আমাদিগকে কোন কথাই বলেন নাই। অলঙ্কার দ্বারা কিম্বা বেশভূষা দ্বারা আপন দেহকে সজ্জিত করিতে আমি তাঁহাকে কখনই দেখি নাই। দেহ রক্ষার জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাই পরিধান করিতেন। সন্তানাদির মনে যাহাতে কোন প্রকার বিলাসিতা না আসে, তাহার জন্য তিনি অনেক সময় অনেক উপায় অবলম্বন করিতেন। অকস্মাৎ গৃহস্থালীর কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে তজ্জন্য বৃথা শোক করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না।

তাঁহার পতিব্রতা—সুখে দুখে, সম্পদে বিপদে, রোগে শোকে স্বামীর সেবা করিতে কখনই তিনি বিস্মৃত হন নাই। ঐরূপ আজীবন স্বামীর সেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্তা থাকিতে আমি অল্প মহিলাকেই দেখিয়াছি। সেবাধর্ম্ম তাঁহার জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। প্রকাশ বাবু অনেক দিন হইতে জীবনের নানা দুঃখ বিপত্তি পূর্ণ অবস্থার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছেন। জানিনা তিনি কতদিনে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতেন, যদি ঐরূপ সহধর্ম্মিনী তাঁর সঙ্গের সঙ্গিনী না হইতেন। ইহাদের উভয়ের জীবনের অনেক ব্যাপারে আমরা তাঁর পাতিব্রত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় এস্থলে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

রাজগিরি। (১)

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সিংহ, বি-এল মহাশয় ১৩০২ সালের নব্যভারতের বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় "রাজগৃহ বা রাজগিরি" সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। আমি তখন মধুপুরে ছিলাম। তখন আমি ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রপীড়িত। ১৩০১ সালের শেষ এবং ১৩০২ সালের প্রথমাংশে সাড়ে চারি মাস মধুপুরে বাস করিয়াও এই জ্বর যায় নাই। বিগত ফাল্গুন মাসে আবার আমার শরীর পুনরায় খারাপ হয়। কলম্বো যাওয়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা প্রতিকূল ঘটনায় সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বিগত ফাল্গুন মাসে শরীর খারাপ হওয়ায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কোথায় যাইব, ভাবিতেছিলাম এবং নানাস্থানের বন্ধুদিগকে পত্রাদি লিখিতেছিলাম। ১৩০১ সালে, পীড়িত হইয়া যখন আমি শয্যাগত ছিলাম, তখন আমার অকৃত্রিম বন্ধু, তদনীন্তন কালের কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু চিকিৎসার সহকারী ডাক্তার ডাক্তার কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বিহারে বদ্‌লি হন। তিনি যখন বিহারে যান, তখন আমাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বিহারে লইয়া যাইতে একান্ত জেদ করিয়াছিলেন। বিহারের নিকটে যে রাজগৃহ, তাহা তখন জানিতাম না। তৎপর নব্যভারতে রামলাল বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ পাঠে রাজগৃহ দেখার ইচ্ছা আমার মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিগত ফাল্গুন মাসে যখন কোথাও যাওয়ার কথা ভাবিতেছিলাম, তখন কালীপ্রসন্ন বাবু বিহারে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। তাঁহার ভালবাসার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, আমি বিহার যাইব, ধার্য্য করিলাম। বহুদিনের মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার সুবিধা হইল। কালীপ্রসন্ন বাবু এ সম্বন্ধে আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবনে ভুলিব না।

রাজগৃহে আমি প্রায় একমাস ছিলাম।

যাহা দেখিয়াছি, তাহা যেন হৃদয়ে চির-দিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কাহা-কেও সে সকল বুঝাইতে পারিব, সে আশা করি না। রাজগৃহে অবস্থান কালীন আ-মার অনুরোধে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রাজগৃহের ঐতি-হাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি সুন্দর পত্র লেখেন। তাহা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা নব্য-ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক সমস্ত কথাই তাহাতে সুন্দররূপে প্রকা-শিত হইয়াছে। পুনঃ আবার রাজগৃহ সম্বন্ধে লেখার আবশ্যকতা কি, অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে একটী কথা এই, ক্ষীরোদ বাবু স্থানটী দেখেন নাই, রামলাল বাবু মাত্র ৩।৪ দিন রাজগৃহে ছিলেন। বিশে-ষতঃ বরগাঁয়ে নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্মৃতি-চিহ্ন আছে, তাহার বিবরণ রামলাল বাবু কিছুই দেন নাই। বরগাঁয়ে বৌদ্ধকীর্ত্তির যে ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, তাহা দেখিলে দুঃখ, ক্ষোভ এবং বিস্ময়ে প্রাণ মন আকুল হয়। উৎকলের ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকটস্থ অসংখ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে যে ভাবের উদয় হয়, ইহাতে তাহাপেক্ষা অধিকতর জমাট ভাব প্রাণে বদ্ধ হয়। বরগাঁয়ের কীর্ত্তির ধ্বংসাব-শেষ দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, মহাত্মা ধর্ম্মপাল বৌদ্ধগয়ার মন্দির ঘটিত বিবাদে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া এই স্থানের ধ্বংসাবশেষ বজায় রাখিতে যদি চেষ্টা করিতেন, তবে তিনি দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি-সংরক্ষণরূপ মহা কার্য্য করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইতে পারিতেন। রাজগৃহ হিন্দু, মুসলমান, জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের তীর্থ। কত কত মহাজনদিগের পূত চরণ-রেণুতে এই স্থান পবিত্রীকৃত। এখানে নানকসাহীদিগের ধর্ম্মসঙ্গত এবং জৈনদিগের ধর্ম্মশালা আজও প্রাচীন কীর্ত্তির শেষ প্রদীপ হস্তে লইয়া দণ্ডা-য়মান রহিয়াছে। এ স্থানের পাণ্ডাগণ নিতান্ত অশিক্ষিত। আনটীর বায়ু এবং জল অতি বিশুদ্ধ। এতগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ আর কোথাও আছে কিনা, জানিনা। এই সকল সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়, একান্ত প্রার্থনীয়। এই সকল কারণে, আমরা রাজগৃহের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপ লিপি-বদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলাম। আশা করি, পাঠকগণের বিরক্তির কারণ হইবে না।

রাজগৃহের ম্যাপখানি এস্থানে তুলিয়া দিলাম। এই ম্যাপখানি বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দিয়াছিলেন। তিনি যে সকল স্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নাম ম্যাপে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা যে সকল স্থান সম্বন্ধে বিশেষরূপ উল্লেখ করিব, তাহা ১, ২, ৩, ও ক, খ, গ এইরূপে চিহ্নিত হইয়াছে।
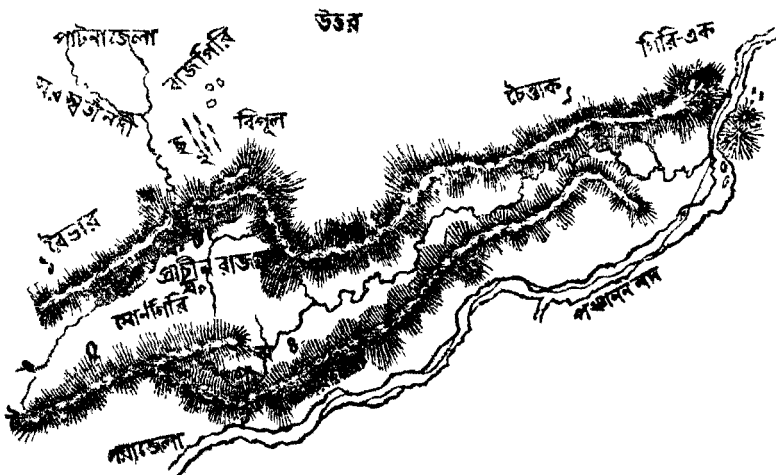
এই গুলির আধুনিক নাম।

১। বৈভার-গিরি। (২) বিপুলাচল (মহাভারতের চৈত্যক পর্ব্বত) (৩) রত্নগিরি। (৪) উদয়গিরি। (৫) সোণগিরি।

ক। এইখানে সোণভাণ্ডার, ইহাকে শতপর্ণী গুহা বলে। তিব্বত-গ্রন্থে নাগ্রোধ গুহা ইহার নাম।

খ। এইখানে দুটী প্রকাণ্ড গুহা আছে।

গ। বাণগঙ্গা। ঘ। নির্ম্মলকূপ।

ঙ। সরস্বতী নদী।

চ। সূর্য্যকুণ্ড ও অন্যান্য কুণ্ড।

ছ। আমবাগানের মধ্যে ইনস্পেকসন বাঙ্গালা। জ। জরাসন্ধের আখড়া।

ঝ। জরাসন্ধের রণভূমি।

ঞ। অগ্নিধারা প্রভৃতি কুণ্ড।

ট। তপোবনের কুণ্ড সমূহ।

চৈত্যক ১। দেবীনগর বা কল্যাণপুরের গোল্ড-মাইনিং কোম্পানির বাঙ্গালা।

∘∘—গিরিয়াক গ্রাম।

∴ এইখানে আধুনিক রাজগিরি গ্রাম।

আর আর যে সকল স্থান আছে, এই সকলের পরিচয়ে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইবে।

আমি ৫ই চৈত্র (১৩০২ ১৭ই মার্চ্চ,১৮৯৬, মঙ্গলবার রাত্রিতে,একটী ভৃত্য সঙ্গে করিয়া, রেলগাড়ীতে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম। রওয়ানা হওয়ার পূর্ব্বে একটু সর্দ্দির ভাব হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম, পশ্চিমের হাওয়াতে শরীর সুস্থ হইবে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে শরীর আরো খারাপ হইল। গভীর রাত্রে মধুপুরে যখন ট্রেন উপস্থিত হইল, তখন শীতে কাঁপিতে লাগিলাম, গরম কাপড় বাহিরে ছিলনা, সুতরাং রাত্রে যারপর নাই কষ্ট পাইতে হইল। পরদিন প্রায় ৩ ঘটিকার সময় বখতিয়ারপুর ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। রাত্রের শীতের পর দিবসের প্রখর রৌদ্র-দুই প্রতিকূল অবস্থায় শরীরকে বড়ই খারাপ করিল। অজ্ঞাত রাজ্যে ভগ্ন শরীর লইয়া উপস্থিত হইলাম। কালীপ্রসন্ন বাবু এক জন বন্ধুর নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন, ষ্টেসনে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তিনি পীড়িত হইয়া বাসায় গিয়াছেন, ষ্টেসনে নাই। বখতিয়ারপুর ষ্টেসনের নিকটে গঙ্গা নদী প্রবাহিত। সমস্ত রাত্রি এবং দিনের কষ্টের পর, চৈত্র মাসের দারুণ তীব্র রৌদ্রদগ্ধ আমরা দুটী প্রাণী অপরিচিত স্থানে, সেই বন্ধুর সাক্ষাৎ না পাইয়া একটু বিপদে পড়িলাম, ষ্টেসনের পুল পার হইয়া অন্য পার্শ্বে গেলাম। একটী মুটে আমাদের জিনিস লইয়া এক মেইল-কার্টের আড্ডায় লইয়া গেল। আমাদিগের ক্লেশ দেখিয়া আর একজন মুটে বলিল, এ আড্ডার গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব আছে, সম্মুখের আড্ডায় যাও, সেখানে গাড়ী প্রস্তুত আছে,এখনই ছাড়িবে। এখান হইতে বিহার ১৮ মাইল, বেলীসরাই প্রায় ২০ মাইল পথ। বখতিয়ারপুর ষ্টেসনের চতুর্দ্দিকে ধূলির আড়ম্বর। বখতিয়ারপুরের ডাক বাঙ্গালাটী সুন্দর। ষ্টেসনের ধারেই মেলকার্ট ও একাগাড়ীর আড্ডা। এখানে কয়েকখানি দোকান ও ধর্ম্মশালা আছে। আর একটু দূরে,উত্তরে,নদীর নিকটে অনেক গুলি দোকান ঘর আছে। বলা বাহুল্য যে, দোকানগুলি সবই পশ্চিম দেশীয় লোকের। দেখিলাম, গাছ পালায় বসন্তের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে বটে, কিন্তু ধূলায় সকল সৌন্দর্য্য ঢাকিয়াছে! মেইল-কার্টের আড্ডাগুলি যেন মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস্। আমরা যে আড্ডায় গাড়ীতে বসিলাম, সে আড্ডায় একখানি বড় ঘরে অনেকগুলি খাটিয়া পাতা আছে।

পথিকগণ সেখানে বিনা ভাড়ায় যতক্ষণ ইচ্ছা থাকিতে পারে। সেখানে পায়খানা ইত্যাদি আছে। অন্যান্য সুবিধাও করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমরা অপেক্ষা না করিয়া মেইল কার্টে উঠিলাম। বখতিয়ারপুরে এক্কা ও গরুর গাড়ীও পাওয়া যায়। মেল-কার্ট ২টী ঘোড়ায় টানে, আমাদের গাড়ীতে কোচম্যান ও দুই জন সইস সহ আমরা ১১ জন উঠিলাম। লগেজে গাড়ী পূর্ণ, তার উপর ঘোড়ার দানা ইত্যাদি তুলিয়া গাড়ীখানির তিলার্দ্ধ স্থান রাখিল না। উপরে ক্যাম্বিসের ছাউনি। একগুলি লোক এবং বোঝা লইয়া, চৈত্র মাসের ধূলি উড়াইয়া, গাড়ী অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটিকার সময় ছাড়িল। আমাদিগকে ৮০ হিসাবে ১৷৷০ ভাড়া দিতে হইল। রাস্তা প্রস্তরময়, কিন্তু মেরামতের অভাবে, তখন বোর্ডের কার্য্যদক্ষতা বেশ ঘোষণা করিতেছিল। চৈত্রের রৌদ্র, গাড়ীর ঝাকুনি, ধূলির আক্রমণ আমাদিগকে অস্থির করিতে লাগিল। গাড়ীতে পাশ ফিরিবারও স্থান নাই। পাকা রাস্তার নিম্ন দিয়া গরুর গাড়ীর রাস্তা গিয়াছে। সে রাস্তা যেন ধূলির সাগর। রাস্তার দুইধারে বৃক্ষ আছে বটে, কিন্তু অনেক স্থলের বৃক্ষই আধুনিক, রৌদ্র-নিবারণের শক্তি তাহাদের এখনও জন্মায় নাই। ৩ স্থানে ঘোড়া বদল হইল। আমরা রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় বেলি-সরাই পৌছিলাম। বেলী-সরাই ৺ বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন ইহার অর্দ্ধেকাংশ দাতব্য চিকিৎসালয় ও ডাক্তার বাবুর বাসা এবং অপর অংশে পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদের বন্ধু কালী প্রসন্ন বাবু বিহারের ডাক্তার বেলি-সরাইর দক্ষিণ অংশে ছিলেন। আমাদের গাড়োয়ান, নিয়ম বিরুদ্ধ হইলেও, ঐ পর্য্যন্ত আমাদিগকে পৌছাইয়া দিল। আমরা অবশ্য গাড়োয়ানকে কিছু বক্‌সিস্ দিয়াছিলাম। গাড়ীতে যাইবার সময় সর্ব্বপ্রথম একটী ঘটনায় আমার মন আকৃষ্ট হয়। কোচ্‌ম্যান ও অপর আরোহীগণ সকলেই মুসলমান। তাহাদের সকলের পরিধানের বস্ত্রই পরিপাটী, সকলেই সুসভ্য—সকলেই আদব কায়দা জানে। বিহার পাটনা জেলার একটী সবডিবিসন, পাটনা মুসলমান-প্রধান স্থান। বিহার যেন পাটনার একটী হোমিওপেথিক ডোজ। বিহারের মুসলমানগণ সম্ভ্রান্ত, সুসভ্য, মিষ্টভাষী এবং সংযত। মুসলমান সম্প্রদায় বিহারে বিশেষরূপ গণ্যমান্য। ইহাদের আচার ব্যবহার অতি মিষ্ট। হিন্দুগণের বাড়ীতে ইঁহারা সাদরে নিমন্ত্রিত ও গৃহীত হইয়া থাকেন, এবং ইঁহারাও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। গাড়ীতে চলিতে চলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সৌজন্যে, ভদ্রতায় আমরা বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। রাত্রে বেলি-সরাইতে যাইয়া শুনিলাম, কালীপ্রসন্ন বাবু বাসায় নাই, ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে গিয়াছেন। আমরা নিজ বাড়ীর ন্যায় দ্রব্যাদি লইয়া ডাক্তার বাবুর বাসায় উঠিলাম। ডাক্তার বাবুর ভ্রাতা ও শ্যালক মহাশয় আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের যত্নে আমাদের সেবা শুশ্রূষার কোনই ত্রুটী হইল না। যদিও আমার শরীর বড়ই খারাপ হইয়াছিল, তবুও রাত্রে কিছু অন্নাহার করিলাম। ডাক্তার বাবুর শ্যালক আমাদিগকে বিহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন—তন্মধ্যে এই দুটী কথায় আমাদের মন খুব আকৃষ্ট হইয়াছিল, প্রথম কথা তিনি বলিয়া-

ছিলেন যে, বিহার মুসলমান-প্রধান স্থান; দ্বিতীয় কথা—এ প্রদেশ বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের রাজ্য। আমরা প্রথম কথার কতক পরিচয় গাড়ীতেই পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু দ্বিতীয় কথাটীর মর্ম্ম তখন বুঝিলাম না—শেষে বেশ বুঝিয়াছিলাম।

আমাদের আহারের পর কালীপ্রসন্ন বাবু বাসায় আসিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ে অনেক সময় গেল। শেষে বিশ্রাম করিলাম। সর্দ্দির আক্রমণে সমস্ত রাত্রি আর ঘুম আসিল না। বড় কষ্টে রজনী কাটাইলাম।

পরদিন প্রাতে ডাক্তার বাবুর ভ্রাতার সহিত বিহার দেখিতে বাহির হইলাম। দেখিবার বড় কিছু নাই। বিহার যেন একটী প্রকাণ্ড তাল বাগান। বিহারের নিকটে একটী ছোট পাহাড় আছে, তাহার উপর উঠিলে বিহারকে তাল-জঙ্গল বই আর কিছুই বোধ হয় না। এত তালগাছ আমরা আর কোথাও দেখি নাই। বেলি-সরাই বিমলা বাবুর এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বটে। সাধারণের চাঁদায় ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজগৃহ এবং বরগাঁও হইতে বিমলা বাবু অনেক প্রস্তরময় মূর্ত্তি আনিয়া ঘর পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল এখন কলিকাতা যাদুঘরকে শোভিত করিতেছে। বিমলা বাবুর এই কাজে আমরা যারপর নাই কষ্ট পাইলাম। সে থানের যে কীর্ত্তি, সে থানে তাহা রক্ষা করিলেই ভারতের কীর্ত্তির স্মৃতি জাগরুক থাকিবে, এইরূপ ভাবে মূর্ত্তি ইত্যাদি স্থানান্তরিত করিলে ভারতকে দুই দশ বৎসরে শ্মশানে পরিণত করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে বিহারের বর্ত্তমান সুযোগ্য ডেপুটী বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত আমাদিগের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, যথাস্থানে তাহা লিপিবদ্ধ করিব।

বিহারে দেখিবার প্রধান জিনিস, দুকদুম সাহের দরগা। দুকদুম সাহ একজন মুসলমান যোগী। রাজগিরিতে ইঁহার নামে একটী কুণ্ড আছে। রাজগিরিতে এক সময়ে নাকি ৪০ দিন উপবাস থাকিয়া তিনি নমাজ করিয়াছিলেন। রাজগিরির কথা পরে ব্যক্ত হইবে। বিহারের দরগায় দুমদুম সাহের কবর আছে। এখানে সময়ে সময়ে মেলা হইয়া থাকে, হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকই মেলায় আগমন করিয়া থাকে। এই দরগাকে সকল শ্রেণীর লোক সম্মান করিয়া থাকে; এবং কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা এখানে সিন্নি দিয়া উপকার পাইয়া থাকে। শুনিয়াছি, বহু সম্ভ্রান্ত লোক এই দরগার প্রতি আস্থাবান। দুকদুম সাহ ৭০০ বৎসরের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া সাধন বলে সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিহারের দক্ষিণদিগের বালুকাময় একটী নদী পার হইয়া এই দরগায় যাইতে হয়। রাস্তায় ধূলি, নদীর বক্ষে ধূলি, চতুর্দ্দিকে যেন ধূলির সাগর। ধূলিতে জুতা ডুবিয়া যায়। এই দরগায় এই সময়ে একটী মেলার আয়োজন হইতেছিল। দরগাটী যে খুব প্রাচীন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। দরগায় অনেক সাধুর সমাধি আছে। তন্মধ্যে দুকদুম সাহের সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার উপর সুন্দর বস্ত্রের চাঁদোয়া টাঙ্গান আছে ও সমাধি উত্তম বস্ত্রাচ্ছাদিত। যারপর নাই যত্নে সমাধির পরিচর্য্যা হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণের এক কোণে একটী বৃক্ষ আছে। লোকেরা বলিল যে, দুমদুম সাহ দন্তমার্জ্জন করিয়া কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। একটী ছোট ঘর দেখাইয়া বলিল যে, এই ঘরে সাহজি

নির্জ্জন সাধন করিতেন। বহুলোকের নমাজের স্থল আছে এবং মেলার সময় অনেক লোক থাকিতে পারে,এমন প্রাঙ্গণ ও গৃহাদি আছে। দরগার পশ্চিমে একটী প্রাচীন পুকুর। স্থানটী দেখিলে সাধু মাহাত্ম্যের কথা প্রাণে জীবন্ত ভাবে উদিত হয়। অন্যান্য তীর্থের ন্যায়, এখানকার লোকেরাও পয়সা চায়। আমাদিগকেও কিছু দিতে হইয়াছিল।

বিহারের বেলি-সরাই দ্বিতীয় দৃশ্য বস্তু। লাট বেলী সাহেবের স্মরণার্থ সাধারণের চাঁদায় ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা একটী কীর্ত্তি বটে, কিন্তু যে স্থানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা পছন্দ-সই নহে। চতুর্দ্দিকে দোকান, খোলার বাড়ী, ছোট ২ রাস্তা—যেন হাটের মধ্যে শয়ন-ঘর। হাঁসপাতলটী বিহারের মিউনিসিপালীটীর গৌরব। বেলি-সরাইর ঘরগুলি ভাল—দুই দিকে বারাণ্ডা, বড় বড় থাম, মধ্যে অনেক ঘর। প্রাঙ্গণে অনেক স্থল আছে। কিন্তু পথিকদিগের জন্য যে অংশ রহিয়াছে, তাহা যেন শ্মশান—সবই খালি। ভদ্রলোকদিগের প্রতি ঘরেব ভাড়া মাসে ৪৷৷০ দিলে একদিন থাকা যায়। এবং সাধারণ লোকদের ভাড়া প্রতিদিন ৴৫। প্রবেশদ্বারে যে ট্রুক-টাওয়ার আছে, তাহা দেখিতে সুন্দর নহে। এক এক দিকে পাঁচটী করিয়া ঘর। বিমলা বাবুর নাম এই বাড়ীর সহিত সংমিশ্রিত। বিহারে জৈনদিগের একটী মন্দির, গবর্ণমেণ্ট স্কুল, কাছারী, জেল, সকল দেখিতে এক বেলাও লাগে না। স্কুলের নিকটে কতকটা স্থান খুব উচ্চ—প্রাচীনত্বের চিহ্ন এই স্থলে স্পষ্ট পাওয়া যায়। এই উচ্চভূমির দক্ষিণ দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড গেটের ভগ্নাংশ আছে। তাহার উপর বড় বড় বৃক্ষ উঠিয়াছে। এখানে পূর্ব্বের যে কিছু স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কতদিনের, নির্ণয় করার কোন উপায় নাই।

বিহার সহরের মধ্যেও অনেকস্থলে আফিংয়ের চাষ হইয়া থাকে। আর প্রধান চাষ তালবৃক্ষের। এত তাল বৃক্ষ কোথাও প্রায় দেখা যায়না, এত তাড়ার কাট্‌তিও কোথাও শুনা যায় নাই। তাড়ীপানে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক সকল বিভোর।

বিহারের বায়ু ভাল, লোকে বলে। জলও মধুপুরের ন্যায় মিষ্ট। কিন্তু রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণের জল ব্যবহার করিয়া আসিয়া শেষে বিহারের মিঠা কুয়ার জলও নিতান্ত বিস্বাদ লাগিয়াছিল। বিহারের রাস্তা সকল ধূলিময়। অনেক রাস্তাই মৃন্ময়,প্রস্তরময় রাস্তাও আছে, কিন্তু সংখ্যা অল্প। মৃন্ময় রাস্তাতে অবিরত ধূলি উড়িতেছে। হাটা যায় না পা ডুবিয়া যায়। বিহারে ধূলির খুব প্রাদুর্ভাব,পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্রে জানিয়াছিলাম, কিন্তু এত ধূলি,পূর্ব্বে বুঝি নাই। দু প্রহরের সময় যখন লু (গরম বায়ু) বহিতে থাকে, তখন চতুর্দ্দিক ধূলিতে অন্ধকার হইয়া যায়। পশ্চিমের অনেক সহরেই গরুর গাড়ীর বহুল প্রচার, সুতরাং সর্ব্বত্রই ধূলির রাজত্ব।

শরীর খারাপ,তার উপর ধূলির আক্রমণ। রাস্তাগুলি ছোট ছোট। নিকটে কোথাও একটু খোলা স্থান নাই—নিশ্বাস ফেলিবার জায়গাও যেন নাই। এ স্থল আমাদিগের মোটেই ভাল লাগিল না। বৈকালে কালীপ্রসন্ন বাবু জনৈক বন্ধুর একখানি উৎকৃষ্ট গাড়া যোগাড় করিয়াছিলেন। সেই গাড়ীতে বৈকালে পাহাড় দেখিতে গেলাম। পাহাড়ের পশ্চিম-দক্ষিণ দিয়া একটী বালুকাময় নদী চলিয়া গিয়াছে। দরগায় এই নদীর উপর

দিয়াই যাইতে হয়। পাহাড়ের উপরে দুই স্থলে বসতি আছে। পাহাড়টী খুব উচ্চ নহে, খুব বড়ও নহে, পূর্ব্বে কিছু উচ্চ থাকিলেও, বখতিয়ারপুর রাস্তায়, বাড়ী ঘর নির্ম্মাণে অনেক পাথর নিঃশেষ করিয়াছে। লোকেরা বলে, ক্রমেই পাহাড়ের উচ্চতা কমিতেছে। পাহাড়ের উপরে অনেকগুলি প্রাচীনসমাধি ও মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ আছে। সে গুলি দেখিলে বাস্তবিকই মুসলমান রাজত্বের অনেক স্মৃতি অন্তরে জাগরিত হয়। ধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য মুসলমান সম্প্রদায় যত সমাধিস্তম্ভ ও মসজিদ এই ভারতবর্ষে নির্ম্মাণ করিয়াছে, হিন্দুসম্প্রদায় বুঝিবা তাহার এক আনাও করে নাই। মুর্শিদাবাদে দেখিয়াছি, প্রতি রাস্তায় ২টী ৩টী ৪টী করিয়া মস্‌জিদ আছে। ধর্ম্মের জন্য স্বার্থত্যাগে মুসলমান-সম্প্রদায় বড়, না হিন্দু সম্প্রদায় বড়, আমাদের সন্দেহ আছে। এই পাহাড়টী বিহারের অতি নিকটে। এই স্থানটী দেখিয়া আমরা যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। স্থানটী বড়ই মনোরম্য। অনেকক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরের গাড়ী পাহাড়ের নীচে অপেক্ষা করিতেছে, তাতে শরীর খারাপ, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিতে হইল।

বিহারে অধিক বাঙ্গালী নাই। মৎস্য তত মিলে না—দ্রব্যাদি বড় সুবিধায় পাওয়া যায় না। তবে মুসলমানী সহর, পেয়াজ মাংসের বেশ বন্দোবস্ত আছে। মুসলমানী গান, বাজনা ও ব্যাণ্ডের প্রাদুর্ভাব খুব। মুসলমানী সহর বটে, কিন্তু মুসলমানদিগের ব্যবহার বড় মধুর।

দিন গেল, শেষ রাত্রেই আমরা রাজগিরি যাত্রা করিলাম। যেখানে বসিতে হইবে, ঠিক হইয়া বসাই উচিত। কালীপ্রসন্ন বাবু পুলিস হইতে শিলাওর থানার লোকের নিকট একখানি পত্র আনিয়া দিলেন, এবং বাবু নন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ইনস্পেকসন-বাঙ্গলার বন্দোবস্ত করিলেন। ইনস্পেকসন-বাঙ্গলাটা বোর্ডের অত্যাচারের যেন একটা মূর্ত্তিমান হাড়িকাঠ। শিথিল নিয়মরূপ রজ্জুতে বাধিয়া এখানে মাথা প্রবেশ করাইয়া, অনেকের সম্মান বলি দেওয়া হইয়াছে। বাবু রামলাল সিংহের প্রবন্ধে অত্যাচারের কথা একটু পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবু ইহার মধ্যে আছেন, ভয় থাকিলেও আমাদের প্রতি অত্যাচার নাও হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া আমরা ইনস্পেকসন বাঙ্গালায় থাকার আয়োজন করিয়াই চলিলাম। এ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন বাবুকে খুব সতর্ক করিয়াছিলাম। পরেও এ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনা-চক্র কে প্রতিরোধ করিতে পারে? সে সকল অত্যাচারের কথা যথা স্থানে বর্ণিত হইবে। আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া রওয়ানা হইলাম। কালী প্রসন্ন বাবু বাগান হইতে কপি শালগম ইত্যাদি তুলিয়া দিলেন এবং কিছু চাউল, ডাইল, লবণ আলু দিলেন। যেন বনবাসের আয়োজন! রাজগৃহ এখন বনবাসের স্থান বই কি? আমরা শেষ রাত্রে রাজগিরি যাত্রা করিলাম। রাস্তায় ধূলি উড়াইয়া, অসংখ্য তাল বৃক্ষের সারি অতিক্রম করিয়া আমাদের গাড়ী চলিল। বন্ধুহীন অজ্ঞাত বনবাসে চলিলাম! রাজগৃহ বিহার হইতে ১৫মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। আর ২ কথা পরে লিখিব।*

পবিত্র কোরাণের সত্যতা। (২)

হাজারাত ওসমানের খালিফা পদে অধিষ্ঠিত হইবার ৩।৪ বৎসর পরে মিসরবাসিগণ বিদ্রোহ করিয়া হাজারাত ওসমানকে নিহত করেন এবং ঐ হত্যার কারণে তাঁহারা হাজারাত ওসমানের প্রতি কোনও প্রকারের মিথ্যা অপবাদ দিতেও ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা কখনই এরূপ দোষারোপ বা অপবাদ দেন নাই যে, হাজারাত ওসমান কোরাণের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সময় হইতে এসলাম ধর্ম্মে "সিয়া" ও "খাবিজা'' সমাজের উৎপত্তি হয়। এই দুই সম্প্রদায় হাজারাত ওসমানের পরম শত্রু ছিলেন। এই দুই দল আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিকট যে কোরাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে,তাহার কোন কোরাণে কোনও প্রকারের বিভিন্নতা নাই, কিম্বা তাঁহারা হাজারাত ওসমানের প্রতি কোরাণ পরিবর্ত্তনের কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই। অতএব ইহার দ্বারাও হাজারাত ওসমানের প্রতি সে প্রকারের দোষারোপ হইতে পারে না।

এস্থলে ইহা অবশ্যই জিজ্ঞাস্য যে, যদ্যপি কোরাণে কোন প্রকারের পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহা হইলে এখন পর্য্যন্ত এসলাম ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবহারপদ্ধতিতে নানারূপ বিভিন্নতা থাকিবার কারণ কি? এই সকল বিভিন্নতার জন্য কোরাণ কোন প্রকারে দায়ী নহে; ঐরূপ বিভিন্নতা থাকিবার কারণ এই যে, প্রেরিতপুরুষকে যে কোন প্রকার বিধিপদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখিলেন,শিষ্যগণ সেই সকল পালন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে,বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনে নানা ধর্ম্মশাখায় বিভিন্নতা হইয়া কয়েক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। কিন্তু যদ্যপি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যে এসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রেরিত পুরুষের আদেশের বিপরীতে খালিফাগণের আদেশের অনুগামী হইতেন এবং পূর্ব্ব পঠিত কোরাণকে ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে নামাজের মত উপাসনা, যাহা প্রতিদিন পাঁচ বেলা করিয়া পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাতে কোন প্রকার বিভিন্নতা থাকিত না। কিন্তু এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের বিভিন্নতা পূর্ব্বেও ছিল এবং এখন পর্য্যন্তও রহিয়াছে। হাজারাত ওসমানের পরিবর্ত্তন করা কোরাণকে সকলে মান্য করিয়া, নিজেদের পূর্ব্ব সরল ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। অন্ততঃ পক্ষে ঐ সকল কোরাণে এইরূপ লিখিত থাকিত যে,পূর্ব্বে হাজারাত পয়গাম্বরের সময় কোরাণে এইরূপ লিখিত ছিল, পরে খালিফাগণ তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া এইরূপ লিখিয়া দিয়াছেন। কিম্বা এই সকল শব্দ পূর্ব্বে কোরাণে ছিল না,পরে খালিফাগণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ কথা আজ পর্য্যন্ত কোন কোরাণে দেখা যায় নাই। অতএব এই সকলের দ্বারা ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, যে কোরাণ আরবী পয়গাম্বরের সময়ে অবতীর্ণ ও সম্পূর্ণ হইয়াছিল, সেই কোরাণ আজ পর্য্যন্ত বিনা পরিবর্ত্তনে এসলাম সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক্ষণে ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারায় কোরাণের অলৌকিকতার দাবি সাব্যস্ত

করার আবশ্যক। পাঠকগণ ইহা অবগত থাকিবেন যে, আজকাল যেরূপ সপ্তাহে সপ্তাহে নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়া বিনা আপত্তিতে স্ব স্ব মতে ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন,, এসলাম আবিষ্কার কালে তদ্রূপ ছিল না। সে কালের ভয়াবহ প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিলে হৃদয়গ্রন্থিও শিথিল হইয়া যায়। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত জাতি একপক্ষ হইয়া এই অসহায় এসলাম ধর্ম্মকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য কতই ভয়াবহ ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন। প্রকাশ্যে ধর্ম্মচর্চ্চা করা দূরের কথা, গোপনে লুক্কায়িতভাবে ধর্ম্ম আলোচনা করাও কষ্টকর ছিল। এসলাম ধর্ম্ম আবিষ্কারকালে আরব দেশে বহুসংখ্যক খ্রীষ্টান ইহুদি বংশানুক্রমে বসতি করিয়া আসিতেছিলেন এবং অধিকাংশ আরববাসিগণ, যাহারা নিজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া ইহুদি বা খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই শিক্ষিত ও বিদ্বান ছিলেন এবং তাঁহাদের ভাষাও আরবি ছিল। তাঁহারা এসলাম ধর্ম্মকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য অনর্থক যুদ্ধ করিয়া নানা প্রকারের কষ্ট ও যাতনা উপভোগ করিলেন, পরিশেষে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, ঈর্ষা ও বিদ্বেষের জন্য জন্মভুমি আরব দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। এই প্রকারের কষ্ট স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে ইহাপেক্ষা জব্দ করার আরো উপায় ছিল। কোরাণের সদৃশ আরো একটী রচনা করিয়া আরবি পয়গম্বরকে দেখাইতে পারিতেন যে, আপনারা যে কোরাণকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া সম্মান করিতেছেন, আমরা নিজে ঐ প্রকার কোরাণ রচনা করিয়াছি। এইরূপ দেখাইতে পারিলে, আরবি পয়গাম্বর কোরাণের ঐ অলৌকিক দাবিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেন, কিম্বা পুনরায় ঐরূপ দাবী করিতে লজ্জিত হইতেন। কিন্তু এ প্রকার কোন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের দ্বারায় আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কেহ মনে করিতে পারেন যে, ঐরূপ কোরাণ সেই সময়ে কেহ রচনা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু আরবি পয়গাম্বর তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঐ কল্পিত কোরাণ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আরব হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া থাকিবেন। যদি একথা সত্য হইত, তবে তাঁহাদের ইহা একান্ত উচিত ছিল যে, তাঁহারা দূর দেশে থাকিয়া আপনাদের রচিত কোরাণকে আপনাদের সত্য প্রমাণের জন্য নিকটে রাখিয়া এসলামের শত্রুগণকে দেখাইতেন ও তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতেন। তাহা সেকালে কেহ করেন নাই। এস্থলে কেহ তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন যে, সেকালে ঐ প্রকার অনেকগুলি মনুষ্য-রচিত কোরাণ প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে যুদ্ধ বিগ্রহে ঐ সমস্ত কোরাণ একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহা আর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই, যে খ্রীষ্টান ইহুদিগণ ঐ সময়ের এসলাম ইতিহাস অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়াছিলেন, তাহারা ঐ ইতিহাসে মনুষ্য-রচিত কোরাণের কতকাংশ অনায়াসেই লিখিয়া দিতে পারিতেন কিম্বা ইহা নিশ্চয়ই লিখিয়া দিতে পারিতেন যে, অমুক অমুক শিক্ষিত মহাশয়গণ যে কোরাণ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা মুসলমানগণের দ্বারায় নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার আর কিছুমাত্র পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কোন ইতিহাসের দ্বারায় এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইউরোপ-নিবাসী খ্রীষ্টানগণ, কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত, সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্যাম দেশে আসিয়া আরব-নিবাসী

মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিলেন, অত্যন্ত অনুসন্ধানের সহিত এসলাম ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহারা এ সংবাদ পাইলেন না যে, কোন খ্রীষ্টান বা ইহুদি কোরাণের ন্যায় কখনও কোন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এসলাম ধর্ম্মে অপরাধ দিবার জন্য লিখিয়া দিতে পারিলেন যে, দ্বিতীয় খলিফা হাজারাত উমার; আলেকজেন্দ্রিয়ার পুস্তকালয় পোড়াইয়া দিলেন, কিন্তু যাহা তাঁহাদের আবশ্যকীয় কার্য্য ছিল, অর্থাৎ কোরাণের অলৌকিকতার দাবী মিথ্যা প্রমাণ করাইয়া দেওয়া, তাহা করাইতে পারিলেন না। কোরাণ অবতীর্ণ কালে আরব দেশে অনেক গুলি লোক আরবি ভাষায় বিদ্বান ও পারদর্শিতা লাভ করিয়া আরবি ভাষার উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টিত ছিলেন। সে সময় কেহ কোন প্রকারে কোরাণের সমতুল্যতা করিতে পারিলেন না, কোরাণ সে কালের সহস্র সহস্র শত্রুগণের শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিরাজমান থাকিলেন। এ সময়ে জগতের এমন কোন্ জাতি আছেন যে, এই পবিত্র কোরাণের সমতুল্যতা করেন, কি করিতে পারেন? তাহা একেবারে অসম্ভব ও কল্পনার অগম্য।

ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারায় এসলাম প্রমাণ করাইয়া দিয়াছেন যে, আজ পর্য্যন্ত কোরাণের ন্যায় রচনা কেহই করিতে পারেন নাই ও ভবিষ্যতে পারিবেন না। এক্ষণে জ্ঞান-সঙ্গত প্রমাণের দ্বারায় ইহা দেখান আবশ্যক যে, মনুষ্য কর্ত্তৃক কোরাণের অনুরূপ রচনা হওয়া সম্ভব কি অসম্ভব। যদি অসম্ভব হয়, তবে তাহার কারণ কি? এসলাম এই অসম্ভবতার অনেকগুলি কারণ দর্শাইয়াছেন। পবিত্র কোরাণে গোপনীয় ঈশ্বর ভাবের ব্যাখ্যা ও গত সময়ের প্রকৃত ঘটনা এবং ভবিষ্যতের বাণী (যাহা মানব জ্ঞানের অতীত এবং যাহার ক্রমশঃই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে) এরূপ উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা মানব বুদ্ধিতে কদাচই হইতে পারে না। কোরাণে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা সকল যে প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মানব রচনায় পাওয়া যায় নাই। কোরাণ সদৃশ ক্ষুদ্র পুস্তক যেরূপ সম্পূর্ণ আবশ্যকীয় ধর্ম্ম বিষয়ে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, মনুষ্য-রচনায় তদ্রূপ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারেনা। মনুষ্য আপন সামান্য বুদ্ধিতে অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত যতই কেন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করুক না কেন, তত্রাচ তাহাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা অসম্পূর্ণ থাকা প্রযুক্ত, তাহাদের রচনায় অনেক স্থানে অনেক প্রকারের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে, কিম্বা প্রকৃত ঘটনার অনেক বিপরীত ভাব পাওয়া যাইবে। পবিত্র কোরাণে সে দোষ আদৌ নাই। মানব স্বভাবে ক্রোধের সময় দয়া ও দয়ার সময় ক্রোধ কখনই উদিত হয় না, কিন্তু কোরাণের যে স্থানে ঈশ্বরের ক্রোধের বিষয় বর্ণনা হইয়াছে, সেই স্থানেই ঈশ্বরের দয়া ও দোষ মার্জ্জনার অঙ্গীকার ও পরকালের সুখ সম্পদের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। অনেক কবি ও গ্রন্থকর্ত্তাগণকে দেখা গিয়াছে, তাঁহারা বিশেষ কোন এক প্রকারের গ্রন্থ রচনা করার পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ যুদ্ধের বর্ণনা বেশ লিখিতে পারেন, কেহ প্রেম-কবিতা রঞ্জিত করিতে পারেন, কেহ প্রকৃতির চিত্র বেশ অঙ্কিত করিতে সক্ষম, কিন্তু কোন ব্যক্তিই প্রত্যেক প্রকারের রচনা, সমতুল্য ভাবে করিতে পারেন না। কোরাণের অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত। ইহাতে প্রত্যেক প্রকারের রচনা

অতি উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। এই প্রকারের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রচনার বিদ্যমানতায় কোরাণ প্রমাণ করিতেছে যে, ইহা মনুষ্য রচিত নহে। এই সকল প্রমাণের মধ্যে চিন্তা করিলে এরূপ একটী অকাট্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার আলোচনা করিলে আর তিল মাত্র সন্দেহ থাকে না, কোরাণ কথনই মনুষ্য-রচিত গ্রন্থ নহে, ইহা অবশ্যই ঈশ্বর-প্রেরিত।

জগতে আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে গুলি দুই ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি ঈশ্বর-সৃজিত (natural) এবং আর কতকগুলি মনুষ্য নির্ম্মিত (artificial)। ঈশ্বর সৃজিত বস্তুর যে গুণাগুণ আমরা দেখিতে পাই, তাহা মনুষ্য-নির্ম্মিত বস্তুতে দেখিতে পাই না। ঈশ্বর-সৃজিত বস্তুতে যে গুণাগুণ পূর্ব্বে ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে ও ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিবে। উপযুক্ত দুই শ্রেণীর বস্তুর তথ্য বুঝিয়া লইবার জন্য জগদীশ্বর মানব-হৃদয়ে এরূপ একটী স্বাভাবিক জ্ঞান দিয়াছেন, যদ্দ্বারা মনুষ্য কোন একটী বস্তু দেখিলেই তাহা ঈশ্বর-সৃজিত বা মনুষ্য নির্ম্মিত, সহজে বুঝিতে পারেন। নানা জাতির এই জ্ঞানকেই প্রাকৃতিক জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কোরাণ মনুষ্য-রচিত নহে, ঈশ্বর প্রেরিত।

শ্রীসৈয়দ আবদুল গফার।
(মেদিনীপুর)

শিশুর সান্ত্বনা।

শূন্য ঘরখানি প'ড়ে আছে ওই,
শূন্য খাঁচা গেছে ভেসে;
সোনার পাখীটি উড়িয়া উড়িয়া
গিয়াছে সোণার দেশে।
হেথায় যাহারা রয়েছে পড়িয়া,
ল'য়ে আছে অন্ধকার;
শূন্যময় বুক, শূন্যময় প্রাণ,
দুনয়নে শতধার।
গেছে মনোরমা, নাই সে প্রতিমা,
শিশুগুলি কেঁদে সারা;
কার মুখ চাবে? কার কাছে যাবে?
কোথা শান্তি পাবে তারা?
মা ছিল যখন, সকলি ত ছিল;
মা নাই, কেহই নাই;
একা মা বিহনে যেন তাহাদের
শূন্যময় সব ঠাঁই!
এক মা হারায়ে না-হারা তাহারা
কত মা ফিরিয়া পেলে;
তবু কি অবোধ মানে সে প্রবোধ?
মাকে চায় মার ছেলে।
মা-ছাড়া যাহারা যায়নি—থাকেনি
একদিন কোন খানে;
মা-ছাড়া তারা যে থাকিতেও পারে,
স্বপনেও নাহি জানে।
কাছে আছে যারা, চিরদিন তারা,
রহিবে, যাবে না ফেলে;
এই যারা জানে, মৃত্যু কারে বলে—
কি বুঝে দুধের ছেলে?
যেখানেই যাক, আসিবে মা ফিরে;
তারা চায় ধ'রে আনে;
গেলে একবার, আসে না যে আর;
কে মানায়—কে বা মানে?
কিছুতেই তারা বুঝিতে চাহে না,
আসিবে না মা যে আর;
"নিশ্চয় আসিবে, আজ নয় ক'াল;"
বুঝেছে তাহারা সার।
"হয় ত বা ঘরে এসে এতক্ষণ
চুপ ক'রে ব'সে আছে;
চল্ যাই ভাই, দেখে আসি মাকে,
ছুটে যাই মার কাছে।"
বার বার তারা মা মা ব'লে তাই
মার ঘরে ছুটে যায়;
মা বুঝি লুকাল? আতি পাতি খোঁজে,
খুঁজে খুঁজে নাহি পায়।

এঘর ওঘর, খোঁজে সব ঘর,
বিরক্তি বিশ্রাম নাই;
বলাবলি করে, "একবার যদি—
একবার ধরা পাই!"
"বাড়ীতে ত নাই! কোথা গেল ভাই?
গেছে বুঝি গঙ্গাস্নানে?"
জানালার ধারে ব'সে থাকে তারা,
চেয়ে থাকে পথপানে।
বেলা হ'ল কত, তবু পথ চেয়ে,
আঁখি জলে বুক ভাসে;
"এল না কেন মা? কেন মা এল না?"
কেঁদে কেঁদে ফিরে আসে।
"তবে কি লুকায়ে বেড়াতে গেছে মা?
কারো বাড়ী ওপাড়ায়?"
এল না এবেলা, আসিবে ও বেলা;
ওবেলা এল না হায়!
এবেলা—ওবেলা, এল কত বেলা,
কত বেলা গেল—এল!
মার বেলা কই এল না ত আর?
মা যে গেল—সেই গেল!
"গেছে কি মা তবে মামার বাড়ীতে?"
শিশুরা সেখানে যায়;
সেখানেও কই, মাকে নাহি পায়;
"মা তবে গেল কোথায়?"
একবার যদি, দেখা পায় মাকে,
ধ'রে আনে গিয়ে ছুটে;
কত আবদার, কত তিরস্কার,—
করে মার কোলে উঠে।
সত্য কি মা ব'লে ডাকিলে তাহারা,
সেখানে মা সাড়া দেয়?
এত যে ক্রন্দন, শুনে কি মায়ের
সাধ হয় কোলে নেয়?
কে জানে কোথায় ফুরাবে তাদের
মা মা ব'লে অন্বেষণ!
কে জানে সে কবে ফিরে পাবে তারা
তাদের সর্ব্বস্ব-ধন!
চলে যায় দিন, ব'য়ে যায় মাস;
অতীত না ফিরে চায়;
ধীরে ধীরে তার বিস্মৃতি-বসন
টেনে দেয় সব গায়।
শেষে একদিন আপনারা তারা
বুঝিয়াছে—বুঝায়েছে;
"ধরাধরি, করে, ওরে ভাই, মাকে
পাঠশালে নিয়ে গেছে!"

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৯। ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য ৸০। এই পুস্তকে মহাকবি ভবভূতি, শঙ্করাচার্য্য, কবিরাজ রাজশেখর, কবি ভর্ত্তৃহরি, চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর, রাজা ভোজদেব, জগদ্ধর ঠাকুর, এবং স্মার্ত্ত মিত্রমিশ্র প্রভৃতি প্রবন্ধ আছে। ত্রৈলোক্যনাথ নব্য-ভারতের পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার গবেষণা, তাঁহার সত্যানুসন্ধান-পিপাসা, তাঁহার গভীর জ্ঞানানুরাগ এখন সকলের মন আকর্ষণ করিয়াছে। ত্রৈলোকানাথের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস এবং কবি বিদ্যাপতি যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে ত্রৈলোক্য বাবুর ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। অসাধারণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত রাজেন্দ্র লালের স্বর্গারোহণের পর বঙ্গদেশে প্রত্নতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক আলোচনা একরূপ নিবিয়া গিয়াছে। এই অন্ধকারময় বঙ্গগৃহে ঐতিহাসিক জ্ঞানের ক্ষীণ প্রদীপ হস্তে লইয়া বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সকলকে এই পথে আহ্বান করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, এত প্রশংসা সত্ত্বেও বড় কেহ তাঁহার পুস্তক কিনিয়া পড়ে না। বঙ্গদেশের ইহা একটা অমার্জ্জনীয় দোষ। বঙ্গদেশ যেন ঘোর তিমিরে, ঘোর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। এই পুস্তকে এই সকল মহাজনদিগের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহাদের জীবনের এবং লেখার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং প্রতিভা স্ফূর্ত্তির ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-

মালায় ত্রৈলোক্য বাবু যে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছি। এ সকল প্রবন্ধ নবভারতে প্রকাশিত হয় নাই, হইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেন, এই পুস্তক কত মনোহর হইয়াছে। ত্রৈলোক্য বাবু সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাঁহার ভাষাজ্ঞান অসাধারণ। তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকার অপরিমেয়। ত্রৈলোক্য বাবু বাঙ্গালা ভাষায় এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে গৌরবান্বিত করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে থাকিয়াও, বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিপুষ্টির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া শরীরের রক্ত জল ও কষ্টে উপার্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেছেন, ইহা আমাদের ভাষার ও দেশের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমরা এমনই অপদার্থ, আমরা এরূপ পুস্তকের আদর করা দূরে থাকুক, তুচ্ছ এবং ঘৃণা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করি! অথচ মুখে বলি—"বাঙ্গালায় ভাল বই হয় না!" হায়রে দুর্ভাগ্য! সংস্কৃত সাহিত্যের এরূপ বিস্তৃত আলোচনা এবং কবিদিগের সমালোচনা বাঙ্গলা ভাষায় আর প্রকাশিত হয় নাই। সকলের নিকট বিনীত নিবেদন, সকলে গ্রন্থকারের এক এক খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া দেখুন। কি অপূর্ব্ব জিনিস্ হইয়াছে, বুঝিবেন। আমরাও শ্রীযুক্ত আর, সি, দত্ত মহোদয়ের সহিত একবাক্যে বলি,

"The attempt is the first of its kind in our language."

ভট্টোজীদীক্ষিত ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে, সে প্রবন্ধটী ইহাতে নাই। এই প্রবন্ধের অনুরূপ সকল প্রবন্ধে এই পুস্তক পূর্ণ। ত্রৈলোক্য বাবুর আবির্ভাবে তাঁহার পিতার কুল উজ্জ্বল এবং বঙ্গভূমি ধন্য হইয়াছে।

২০। প্রবোধ-সঙ্গীত।—শ্রীবিহারিলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০। এখানি কবিতাপুস্তক। লেখক ভাব অপেক্ষা দুরূহ শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী, সৌন্দর্য্য যোজ অপেক্ষা জটিলতা বিন্যস্তের অধিক প্রয়াসী; যথা—

"অরোরা কিরণে রাকা চিরদিন,
বিকীরে জোছনা রাশি।
তুষার মসৃণ শয়নে অরুণ
মাখে কোমলতা, রাশি।"

২১। শ্রীহরিদাস ঠাকুর।—শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০। প্রধানতঃ চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্য-ভাগবত অবলম্বনে পরম সাধু হরিদাসের এই জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। হরিদাস যবন কিনা, এ সম্বন্ধে অনেক বাদ প্রতিবাদ হইয়াছে, সম্যক মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তিনি যবন ছিলেন। হরিদাস একজন প্রকৃত হরিভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি, যে কুলকেই তিনি পবিত্র করিয়া থাকুন, তিনি সকলের প্রণম্য। এই সাধুর জীবনচরিত সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়, ততই ভাল। ভগবদ্ভক্ত ৺ জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় হরিদাস সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। বহুদিন পরে আমরা অঘোর বাবুর উদ্যম ও চেষ্টা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। বিধাতা তাঁহার মঙ্গল করুন। তবে একটী কথা এই, গভীর বৈষ্ণবশাস্ত্র-সিন্ধুতে এখনও তাঁহার অবগাহন হয় নাই। এজন্য অনেক কথা ভাসা ভাসা বোধ হয়।

২২। গোধন-রক্ষক বা গোধন চিকিৎসা পুস্তক—শ্রীসচ্চিদানন্দগীতরত্ন গো-তীর্থ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ॥০, সমর্থ পক্ষে ১৲। ১৩নং বিন্দুপালিতের লেনে (রামবাগানে) পাওয়া যায়। মনুষ্যের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন গোকুল। গোকুল রক্ষার্থ যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের একান্ত ধন্যবাদের পাত্র। গো-চিকিৎসার বিবিধ কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গো-বসন্ত প্রকরণে, আমাদের মনে হয়, নব্যভারতে বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত সারবান কথা সকলের চুম্বক সন্নিবিষ্ট করিলে অনেকটা ভাল হইত। এ সম্বন্ধে নিত্যগোপাল বাবু বিস্তৃত ভাবে তাহা লিখিয়াছেন, ইহাপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষায় আর অধিক কথা লেখা হয় নাই। যাহা হউক, এই পুস্তক যাঁহারা প্রকাশ করি-

য়াছেন, এবং যাহারা এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই পুস্তক প্রচার দ্বারা যে দেশের প্রভূত উপকার হইবে,সে বিষয়ে হিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

২৩। ছত্রপতি শিবাজী।—শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত,মূল্য ১॥০। শিবাজী হিন্দু-কুল গৌরব অথবা ভারতের গৌরব। বাঙ্গালা ভাষায় এই মহাত্মার জীবনচরিত ছিল না বলিয়া আমাদের দুঃখের সীমা ছিল না। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহোদয়ের পিতৃদেব তাঁহাকে শিবাজীর জীবনী লিখিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি, দাক্ষিণাত্য দেশ ও কোকন প্রদেশের যে সকল স্থলে শিবজী জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা পরিদর্শন করিয়া এই মহাত্মার জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন্। এতদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্রীয়,হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরাজি বহুবিধ গ্রন্থ-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া এই অপূর্ব্ব রত্ন তুলিয়া বঙ্গ ভাষার মস্তকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম, যত্ন, গবেষণা, অধ্যবসায়,অর্থ ব্যয়—সব সার্থক হইয়াছে,আমরা মনে করি। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল,মধুর, তেজস্বিনী। এই বীরের জীবনী লিখিতে ভাষায় যে যে গুণ থাকার প্রয়োজন, তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনীর প্রভূত আছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই অধঃপতিত বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পুণ্যশ্লোক, ক্ষণজন্মা, মাতৃভূমির গৌরব শিবাজীর এই জীবনকাহিনী অধিত,পঠিত এবং অনুকৃত হউক, আমাদের ইহাই একমাত্র কামনা এবং প্রার্থনা।

২৪। কাতন্ত্ররূপমালা ব্যাকরণম্। 'রৈক' লল্লুরামাত্মজ জীবরাম শাস্ত্রিনা সংশোধিতাম্। মুম্বই (বোম্বে) নির্ণয়সাগরাখ্যযন্ত্রালয়ে দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত ও হীরাচন্দ্র নেমিচন্দ্র শ্রেষ্ঠী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। ইহাতে সটীক কলাপ সূত্র দুইভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছে। সূত্রগুলির ক্রমানুসার ও সমাবেশ বাঙ্গালার চলিত সাধারণ ব্যাকরণ হইতে অনেক স্থলে বিভিন্ন ও উল্টাপাল্টা। টীকা সংক্ষিপ্ত হইলেও সরল, সুন্দর এবং অর্থ-প্রকাশিকা। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, ইহা বিশুদ্ধ সংস্করণ বলিয়া বোধ হইল। ছাপা ও কাগজ ভাল। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে কলাপ সূত্রগুলি অতি সরল। পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন স্থান ভিন্ন এদেশে কলাপের প্রচলন বিরল। এ গ্রন্থ দেবনাগরী অক্ষরে পরিচিত কলাপ অধ্যায়ী এবং অধ্যাপক উভয়ের নিকটই আদরনীয় হইবে।

২৫। কতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া।—রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়াধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারেণ বিরচিতা। মূল্য ২৲ টাকা। পাণিনিব্যাকরণে দুইটী প্রক্রিয়া আছে। একটী লৌকিক, অন্যটীর নাম বৈদিক। রামায়ণ মহাভারত কাব্য নাটক আখ্যায়িকা পুরাণ স্মৃতি জ্যোতিষ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যবহৃত পদ সমূহের নাম লৌকিক প্রয়োগ। উহা লৌকিক প্রক্রিয়ার সূত্রের দ্বারা সাধিত হয়। আর বেদে যে সকল পদ ব্যবহৃত আছে, উহা বৈদিক প্রক্রিয়ার সূত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন করিতে হয়।

কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের প্রণেতা সর্ব্ববর্ম্মা আখ্যাত পর্য্যন্ত রচনা করেন,অপর অংশ প্রসিদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করেন। কাত্যায়ন কৃদন্ত শব্দ সমূহসাধনের সূত্র রচনা করেন। দুর্গসিংহ সর্ব্ববর্ম্মকৃত সূত্র ও কাত্যায়ন সূত্র সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই কয়টী লইয়া কলাপ ব্যাকরণ। ইহাতে এক প্রকার বৈদিক প্রক্রিয়া নাই বলিলেই চলে। কাত্যায়ন কদাচিৎ কৃদন্তের দুই চারিটী বৈদিক পদ সাধনের সূত্র রচনা করিয়াছেন।

আমাদের মহামহোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মহাশয় বৈদিকপ্রয়োগে বঞ্চিত, কলাপ ব্যাকরণ ব্যবসায়ীদের উপকারের নিমিত্ত কলাপব্যাকরণে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ পূর্ব্বক কাতন্ত্রচ্ছন্দ প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ রচনা দ্বারা যে যশোরাশি সঞ্চিত করিয়াছেন, এই গ্রন্থের দ্বারা তাহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। সূত্র ও বৃত্তিগুলি বেশ সহজবোধ্য হইয়াছে। তবে

অন্যান্য বৈয়াকরণদের ন্যায় ইনিও সম্পূর্ণ পাণিনির পদানুসরণ করিয়াছেন। পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যতীত আর সমস্তই পাণিনি সূত্রের রূপান্তর মাত্র। পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা নিম্নে পাণিনি সূত্র ও কাতন্ত্রচ্ছন্দ প্রক্রিয়ার সূত্র উদ্ধৃত করিলাম।

ষষ্ঠীযুক্তশ্ছন্দসিবা। পাণিনি ১।৪।৯

ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত পদের সহিত পতি শব্দের ঘিসংজ্ঞা হয় বিকল্পে বেদ বিষয়ে। উদাহরণ ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং।

ষষ্ঠীযুক্তঃ পতিরগ্নিষ্টাদৌবা।১।
কাতন্ত্রচ্ছন্দ প্রক্রিয়া ৫০ পৃষ্ঠা।

পাণিনিতে যাহাকে ঘি সংজ্ঞক করা হইয়াছে, কলাপ ব্যাকরণে উহাকে অগ্নি সংজ্ঞক বলা হইয়াছে। বিকল্পে ঘি অথবা অগ্নি সংজ্ঞক হইল সুতরাং ষষ্ঠ্যন্ত ক্ষেত্রস্য এই পদের সহিত যুক্ত পতি শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে পত্যা না হইয়া পতিনা হইল। পাণিনি, ছন্দসি বেদবিষয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বারংবার ছন্দসি শব্দ ব্যবহার না করিয়া প্রথম সূত্রে ছন্দসি বলিয়া উহার অনুবৃত্তি টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু এখানে টাদৌ এই পদটী কেন ব্যবহার করিলেন, বলিতে পারি না। প্রসক্তি থাকিলে তাহার প্রতিষেধ করা উচিত, কিন্তু পতিশব্দের সু ঔ জস্ অম্ ঔট শস্ বিভক্তিতে অগ্নি সংজ্ঞা হইলেও যে পদ হইবে, না হইলেও সেই পদই হইবে। সে যাহা হউক, ভাগীরথীর উভয় তীরে যে প্রকার মুগ্ধবোধের বহুল প্রচার, পদ্মা নদীরও উভয় তীরেও সেই প্রকার কলাপ ব্যাকরণের বহুল প্রচার। আশাকরি, বিক্রমপুর প্রদেশস্থ বৈয়াকরণ মহাশয়েরা অভিনব কাতন্ত্রচ্ছন্দ প্রক্রিয়াখানি অঙ্গের আভরণ স্বরূপ লাভ করিয়া সুখী হইবেন।

২৬। সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্।—শাঙ্করভাষ্যতদনুবাদসমেতম্ শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ সম্পাদিতম্। শ্রীসারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়েন প্রকাশিতম্। মূল্য ১্। যেমন অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও ভগবান্ কৃষ্ণের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন ও ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র সনৎসুজাত বা সনৎকুমারের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে এই সনৎসুজাত অধ্যাত্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত, আর এই অধ্যাত্মশাস্ত্র উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত। উভয়েরই প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, তবে ভগবদ্গীতার ন্যায় উচ্চতম ভাবপূর্ণ না হউক, ইহা যে একখানি উচ্চশ্রেণীর অধ্যাত্মগ্রন্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ পাঠে প্রাণে শান্তি পাইবেন। এই গ্রন্থের ২।১টী শ্লোক উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, স্থানাভাব প্রযুক্ত হইল না। এই গ্রন্থখানি বঙ্গদেশে প্রচারিত ছিল না। শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে নাসিক হইতে এই গ্রন্থখানির সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। বঙ্গের অন্যতম দার্শনিক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইহার সম্পাদন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ও পূর্ব্বোক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশ করিতেছেন। বঙ্গদেশে অমুদ্রিতপূর্ব্ব এই গ্রন্থপ্রচারের জন্য আমরা সম্পাদক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৭। কল্লোলিনী।—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত, মূল্য ১।০। শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। মৃণালিনীর এইখানি তৃতীয় গ্রন্থ। পূর্ব্বগ্রন্থ দুখানির আমরা বিশেষ প্রশংসা করিয়াছি। এই পুস্তকে বিশেষ পরিচয়ের কিছুই নাই। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থকর্ত্রীর কবিতা নির্ব্বাচনে যথেষ্ট দোষ আছে। গ্রন্থকর্ত্রী লিখিতে অনেক পারেন, কিন্তু সকলই যে ছাপাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। এই পুস্তকের অনেক গুলি কবিতাই প্রকাশের অযোগ্য। অধিক গ্রন্থ প্রকাশ না করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে একটু সংযত হইয়া চলিলে ভাল হয়। "কল্লোলিনী" লেখিকার পূর্ব্বার্জ্জিত যশোরাশি কিছু বিধৌত করিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

গরিব-সেবা।

যত্র মন তত্র ধন।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে একটী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি নির্ধন, বান্ধবহীন ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি গরিব-সেবাতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই পবিত্র কার্য্যে অদ্য কম করিয়া তিনি বাৎসরিক বিংশতি লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। পৃথিবীর নানা দিগ্দেশস্থ অশীতি সহস্র দাতা এই টাকা দিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ এই পুণ্যকার্য্যে দুই ক্রোড় টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছেন, এই ব্যক্তি কে, এবং কিরূপে এই অদ্ভুত কাণ্ড সম্পন্ন হইতেছে? এই আশ্চর্য্য কাহিনীর বর্ণনা করিতেছি।

এই মহাত্মার নাম বর্ণদ, ইনি আয়র্লণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জনক স্পেনীয়-বংশে জর্ম্মানীদেশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার জননী জাতিতে ইংরাজ, কিন্তু আয়র্লণ্ডে ভূমিষ্ঠ হন। সুতরাং বর্ণদের শোণিতে জর্ম্মানী, স্পেন, ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের বিমিশ্রিত অংশ ছিল। তরুণ বয়সে তাঁহার বোধ হইল, তাঁহার জীবন পাপময়। তারুণ্যেই তিনি তাঁহার জীবন পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুণ্য কার্য্যে উৎসর্গ করিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন,—পাদ্রী হইয়া চীনদেশে যাইব, সেখানে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিব। এইরূপ স্থির করিয়া চিকিৎসা ও ধর্ম্মতত্ত্ব উভয়ই আলোচনা করিতে লাগিলেন। লণ্ডনের একটী হাঁসপাতালের ছাত্র হইলেন। এই সময়ে লণ্ডনে ভয়ানক বিসূচিকা মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইল। যেমন এক পক্ষে অনেকে ভয়ে পলায়ন করিল, তেমনি অপর পক্ষে অনেকে, বিনা বেতনে রোগী-সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিলেন। ডাক্তার বর্ণদও তাহাই করিলেন, বাড়ী বাড়ী যাইয়া গরিবদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। এই সময় দীনজনের দুর্দ্দশা তাঁহার নয়নগোচর হইতে লাগিল। তিনি দিবসে হাঁসপাতালে ও শবচ্ছেদ গৃহে কার্য্য করিতেন, রাত্রিতে প্রয়োজনীয় পাঠ করিতেন। আর প্রতি সপ্তাহে দ্বিরাত্রি এবং সমগ্র রবিবার একটী অনাথ পাঠশালায় বিনা বেতনে শিক্ষা দিতেন। এই পাঠশালা তিনি নিজে স্থাপন করিয়াছিলেন। উপযুক্ত গৃহের অভাবে একটী গর্দ্দভের আস্তাবলে তাঁহাকে এই পাঠশালা বসাইতে হইয়াছিল। একদিন শীতকালে—রজনী প্রায় দুই প্রহর, বর্ণদ সে অনাথ পাঠশালায় আসীন। ছাত্রগণ চলিয়া গিয়াছে। যুবক সমুদায় দিবসের অবিরাম শ্রমে ও সেই রজনীর অধ্যাপনায় ক্লান্ত-কলেবর—কি ভাবিতেছেন? বুঝি, জীবনতরি সংসার-সাগরে কোন্ কোন্ পথ দিয়া চালাইয়া কোন্ কোন্ বন্দরে উঠিবেন, পরোপকারের বিপুল বাণিজ্য কিরূপে বিস্তৃত করিবেন, বিভুচরণে কিরূপে আত্মাকে এককালে উৎসর্গ করিয়া দিবেন—বুঝি, তাহাই ভাবিতেছেন। গৃহের প্রজ্জ্বলিত পাবক শীত নিবারণ করিতেছে এবং তাহার আভা যুবকের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছে। এমন সময়ে সেই গৃহে এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। পাঠক যেন মনে না করেন যে, নির্ব্বাত দীপ-প্রদীপ্ত রঘুকুলমণিকক্ষে রাজলক্ষীর ন্যায় কোন দেবী দয়া করিয়া আবির্ভূত হইলেন; অথবা অমরাবতীবাসী পার্থ-শয়ন-মন্দিরে

পুরন্দর-প্রেরিত অপ্সরাবৎ কোন সুন্দরী মহাত্মা বর্ণদকে প্রলোভিত করিতে আসিলেন। না, তাহা নহে। এ মূর্ত্তি মধ্যে কল্পনার মাধুরী বা কবিত্বের লহরী নাই, এই মূর্ত্তি নিতান্ত শুষ্ক, কঠিন, সদ্যবৎ। ইহা আর কিছু নহে, এক অনাথ অর্দ্ধনগ্ন শীতকম্পিত অস্থিসার ভিক্ষুক বালকের মূর্ত্তি। পৌরাণিক পাঠক হয়ত বলিবেন, ভিক্ষুক বালক হইলেই যে তাহার ভিতর কবিত্ব বা ধর্ম্মপ্রাণমর্ম্ম থাকিতে পারে না, এমন নহে। বিষ্ণু বামনদেবরূপে ভিক্ষুক সাজিয়া বলি রাজাকে ছলিয়াছিলেন। আর হিরণ্ময় রাজার উপাখ্যানে পড়িয়াছি, রাজাকে ছলিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং কুষ্ঠগ্রস্ত ভিক্ষুক সাজিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। তাই, ভাই, সাবধান। হয়ত ভিক্ষুকের বেশে ভগবান্ আমাদিগের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। কন্থা স্কন্ধে ভিক্ষুকের সেই শীর্ণদেহের অভ্যন্তরে, নরদেহধারী সেই ভ্রাম্যমাণ মলিনমন্দিরে, স্বয়ং ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন, জানিও। ভিক্ষুকের রসনা দ্বারা ভিক্ষুকের প্রসারিত হস্তের দ্বারা, ভগবান্ই তোমার নিকট সেবা চাহিতেছেন। যদি ভগবানের দয়ার আশা রাখিতে চাও, যদি নরকাগ্নির ভয় থাকে, তাহা হইলে দ্বারস্থ দীন ভিক্ষুককে তাড়াইও না। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যিনি কেবল নিজের জন্য পাক করেন, তিনি পাপ ভক্ষণ করেন।

আমি বলিতেছিলাম, নগ্নপ্রায় শীতার্ত্ত এক ভিক্ষুক বালক, সেই রজনীতে, শেষে পাঠশালায় বা বর্ণদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই বালক যে ভগবানের দূত, তাহা বর্ণদ প্রথমে বুঝেন নাই, তিনি যে পথ খুজিতেছিলেন, দীনবন্ধুর কৃপায় এই বালক যে সেই পথ দেখাইয়া দিতে আসিয়াছে, সহসা তাঁহার সে উপলব্ধি হয় নাই। তাই বর্ণদ তাঁহাকে বলিলেন "এত রাত্রিতে এখানে কেন? বাড়ী যাও।" ভগবানের আদেশ পালন না করিয়া—বালক যাইবে কেন!

তাই সে বলিল "আমি কোন ক্ষতি করিব না। আমাকে আজি রাত্রি এখানে থাকিতে দিন্।" "কি আশ্চর্য্য, তুমি রাত্রিতে একা এই স্কুলে থাকিবে?

তোমার মা কি ভাবিবেন?"

"মহাশয়, আমার মা নাই।"

"তোমার বাপ?"

"মহাশয় আমার বাপও নাই।"

"সে কি কথা, মিথ্যা বলিও না। মা নাই বাপ নাই, তবে থাক কোথা?"

"আমি কোথায়ও থাকি না।"

বর্ণদ মনে করিলেন, "ছোড়া বলে কি? এত অল্প বয়সেই এমন মিথ্যা কথায় পাকিয়া গিয়াছে।" তিনি তাহাকে জেরা করিতে লাগিলেন। বালক সহজে সত্য কথা বলিল। আরও বলিল, "কেবল আমি নহি, আমার মত গৃহহীন আরও অনেক বালক আছে।" তাহাদিগের মা বাপ বা অন্য কোন আশ্রয়দাতা নাই।"

এই কথা শুনিয়া বর্ণদের বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল, তিনি ভাবিলেন, "এমন অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে প্রত্যয় করিতে পারি না।" ইত্যবসরে বালক শীতে কাঁপিতেছিল, বালককে অগ্নি তাপ দ্বারা শীতার্ত্ত দেহকে উষ্ণ করিতে বলিলেন, এবং উষ্ণ কাফি পান করিতে দিলেন। বালক কাফি সেবনে পরিতৃপ্ত হইল। পরে বর্ণদ নিরাশ্রয় অনাথ বালক বালিকা দর্শনে নির্গত হইলেন। বালক অগ্রে, পশ্চাতে বর্ণদ নিঃশব্দে চলিতেছেন। বর্ণদ-তীর্থযাত্রী, অনাথ

বালক বালিকা দর্শন কৌতুহলী। বালক এই তীর্থযাত্রীর পাণ্ডা। রাজবর্ম্ম চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধ—কেবল মাত্র প্রহরীর পদবিক্ষেপ ধ্বনি-শ্রুতি-গোচর হইতেছে। বর্ণদ বলিলেন "কৈ? কোথাও বালক বালিকা দেখি না।"

বালক বলিল "এখনই দেখিবেন।" পাহারাওয়ালার ভয়ে সব বালক বালিকা লুকাইয়া আছে।" বর্ণদ দেখিলেন, সম্মুখে এক দৃঢ় প্রাচীর। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ! তোমার বালক বালিকারা কোথায়?" সেই প্রাচীর শিরোবর্ত্তী সেই ছাদ দেখাইয়া বালক উত্তর করিল "ঐ, উপরে, মহাশয়!" বালক অনায়াসে তাহার উপরে উঠিল, উপর হইতে একটী যষ্টি ধরিল। তাহার সাহায্যে—বর্ণদ কোন মতে উপরে উঠিলেন। তিনি তথায় দেখিলেন, ১১ এগারটী বালক সেই ছাদের উপর, শীতে জড়সড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, তৎনই সহসা চন্দ্র মেঘবিনির্মুক্ত হইল, এবং সেই নিদ্রিত বালকগণের মুখোপরি চন্দ্রালোক পতিত হইল। সেই নিমীলিতনেত্র বালকগণের শীত ক্লিষ্ট মুখবৃন্দ হিমানিপীড়িত কুসুমবৎ প্রতীয়মান হইল।

বর্ণদ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে সহসা যবনিকা উৎক্ষিপ্ত হইল। তিনি যেন দেখিতে পাইলেন, লণ্ডন নগরীর পরিত্যক্ত কুমারগণের দুঃখের অগাধ সাগর তাঁহার সম্মুখে তরঙ্গায়িত। তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল, "কি ভয়ানক অবস্থা। এই বালকগণ গৃহ হীন, কপর্দ্দক হীন, রক্ষক হীন। কেহ তাহাদিগকে সন্তান বলিয়া লয় না, কেহ তাহাদিগের প্রতি চায় না, হা বিধাতঃ! তোমার লীলা কে বুঝিবে—হায়, ইহাদিগের কিছুই নাই কেন, আমার এবং অজস্র ব্যক্তির সমুদায় প্রয়োজনীয় বস্তু আছে কেন? হে বিভো, তোমার বিধান বুঝি না। যাহাই হউক, অন্ততঃ আমার আশ্রিত এই বালকটীকে উদ্ধার করিতে হইবে।" এদিকে বালক যাহা প্রত্যহ দেখে, তাহাই দেখিতেছিল। সুতরাং তাহার মনে কোন ভাবোচ্ছ্বাস হয় নাই। সে বলিল "ইহাদিগকে জাগাইব কি?"

"চুপ, ইহাদিগকে জাগাইও না," এই বলিয়া বর্ণদ সেই স্থান হইতে ত্বরা প্রস্থান করিলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, আর একটী আড্ডা দেখিতে চাহেন কি? এমন আরও অনেক আছে" বর্ণদ উত্তর দিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে" এইরূপে সেই ভিক্ষুক বালক অজ্ঞাতসারে ভগবানের দৌত্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করিল।

দিন যায়, রাত্রি যায়, কেবল মাত্র এক চিন্তা বর্ণদের হৃদয়ে জাগরূক। সেই একাদশ বালকের শোচ্য ক্লিষ্টানন—যাহা ছাদের উপরে পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে তাঁহার নিকট চিত্রপটবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। তিনি এইক্ষণ হইতে সেই অনাথ জনগণের সেবার্থ নীরবে নিরঞ্জনের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিলেন। স্থির করিলেন,—

"চীন দেশে যাইব না। সেই দেশে অন্য ধর্ম্মপ্রচারক যাইতে পারেন। আমার কার্য্যক্ষেত্র গৃহের সন্নিকটে"।

এই মনে করিয়া তিনি কিরূপে অনাথদিগের আশ্রয় দিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিজের টাকা নাই, কেমন করিয়া অনাথগণের আহার যোগাইবেন? কেমন করিয়া সেই নিরাশ্রয় বালক বালিকাগণের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন? গরিব সেবার কার্য্যে যে ধন চাই, তাহা কোথা হইতে আসিবে?

১। যত্র মন, তত্র ধন।

অর্থাৎ গরিব সেবায় মন থাকিলে ধনের অভাব হয় না। ভগবান্ তাহার উপায় করিয়া দেন। জেনেরাল বূথ, ব্রিষ্টল-নিবাসী মুলার, এবং বর্ণদ তাহার প্রমাণ। একদিন রাত্রিতে একটী বড়লোকের বাটীতে বর্ণদের নিমন্ত্রণ হইল, সেই থানে তিনি অনাথ শিশুগণের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিলেন।

গৃহস্বামী ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহার কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বর্ণদকে বলিলেন—

"আপনি কি বলেন, এই তীক্ষ্ণ দুঃসহ শীতে এই লণ্ডন নগরীতে অনেক নিরাশ্রয় বালক বালিকা বাহিরে খোলা বারান্দায় শুইয়া আছে"। "হাঁ মহাশয়,—আমি বাস্তবিকই তাহাই বলিতেছি"।

ভাড়াটিয়া গাড়ীতে ২০ জন ভদ্রলোক অনাথ-দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লণ্ডনের দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে একটী বালকও দেখিতে পাইলেন না। একজন প্রহরী বলিল—

"একটী তাম্র মুদ্রা দিব বলুন, এখনি ভিক্ষুক বালক বালিকা যেখানে থাকুক না কেন, দেখা দিবে"।

প্রত্যেক ভিক্ষুককে একটী করিয়া পয়সা দেওয়া হইবে, প্রচার করা হইল। অমনি একটী প্রকাণ্ড ত্রিপলের নিম্ন হইতে পুরাতন ক্রেট" বাক্স ও পিপের অভ্যন্তর হইতে পিল্-পিল্ করিয়া বালকের পর বালক নির্গত হইতে লাগিল। ৭৩ টী বালক রাজবর্ত্ম দীপের নিম্নে সারি সারি দণ্ডায়মান হইল। শোচনীয় দৃশ্য! দর্শকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ লর্ড সাফটেস্-বরি এবং অন্য কয়েক জন পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন।

বর্ণদের জীবন ব্রত আরম্ভ হইল, একটী অনাথাশ্রম খুলিলেন; এবং সেই গৃহ সানন্দে স্বহস্তে সংস্কার করিলেন। লণ্ডনের দরিদ্র পল্লীর রাস্তায় দুই রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ২৫টী বালক সংগ্রহ করিলেন।

যাহা পরিণামে একটী বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইবে, এইরূপে তাহার সূত্রপাত হইল। যিনি প্রথমে ২৫ জন মাত্র বালককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, অদ্য তিনি ৫০০০ পঞ্চ সহস্র বালক বালিকাকে আশ্রয় দিয়া লালন পালন করিতেছেন। আমাদিগের এক এক পরিবারের প্রায় ৫।৬ জন মাত্র লোক, তাহাতেই আমরা কত বিব্রত হই। কিন্তু বর্ণদের পরিবারে ৫০০০ পাঁচ সহস্র লোক। তথাপি তাঁহার স্নেহে, যত্নে ও সুনিয়মে এই বিরাট পরিবারের সমুদায় কার্য্য কেমন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। একবার কল্পনা করুন, প্রতি দিন ৫০০০ পাঁচ হাজার লোকের ভোজ হইতেছে। কেবল ভোজন নহে। তাহার সঙ্গে আরও মনে করুন, ৫০০০ পাঁচ হাজার বালক বালিকার কত কাপড়, জুতা বিছানা, তাহাদিগের বাসের জন্য কতগুলি ঘর চাই,—সংক্ষেপে ৫০০০ পাঁচ হাজার বালক বালিকাকে লালন পালন করিতে হইলে যাহা যাহা চাই, পাঠক নিজে তাহা এক বার কল্পনা করিয়া দেখুন। কি প্রকাণ্ড ব্যাপার! এই ৫০০০ পাঁচ হাজার ব্যক্তির কেবল খাদ্য যোগাইবার জন্য প্রতি দিন প্রায় ২০০০ দুই হাজার টাকার অধিক পড়ে, এত বেশী টাকা কেমন করিয়া সংগ্রহ হয়? কেবল দাতব্য! হাঁ। লালা বাবু যেমন বৃন্দাবনে ঠাকুর ও গরীব সেবার জন্য জমিদারীর আয় ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, বিলাতের অনেক পরোপকারী ব্যক্তি সৎকার্য্যের জন্য নিজের জমিদারী অস্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বর্ণদের গরিব সেবার কার্য্যে সেইরূপ কোন

জমিদারীর আয় নির্দ্ধারিত নাই। চাঁদার টাকা আসিতে যদি বিলম্ব হয়, তাহা হইলে বর্ণদ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন,তাঁহার প্রার্থনা কখনও নিষ্ফল হয় নাই।

২। যথা ভক্তি তথা মুক্তি।

ভক্তের প্রার্থনা কখনও নিষ্ফল হয় না। পূর্ণ ভক্তির সহিত, পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত, নির্ম্মল অন্তঃকরণে, ঈশ্বরকে ডাক, ঈশ্বর উত্তর দিবেন, ঈশ্বর দর্শন দিবেন। সাধুজন এই কথা বলেন। আমার তোমার পক্ষে ইহা কল্পনা করা অসম্ভব হইতে পারে,কিন্তু ইহার ভিতর বাস্তবিক কিছুই অসম্ভব না থাকিতে পারে। আমি একটী মোহন্তকে দেখিয়াছি। লোকে বলে, ইহার ঘরে খাদ্য থাকুক আর না থাকুক, যতই অতিথি আসিয়াছে, ইনি তাহাদিগকে অনায়াসে ভোজন করাইয়াছেন, কখনও ফিরাইয়া দেন নাই। বৈজ্ঞানিক পাঠক হয় ত এই কথায় একটু হাসিবেন, বলিবেন, দ্রৌপদীর ব্রাহ্মণ ভোজন অথবা খ্রীষ্টের সেই অলৌকিক অনুচর ভোজন।

এসব আমরা এখন বিশ্বাস করিতে পারি না। মোহন্তকে আপনি প্রবঞ্চক মনে করিতে পারেন, দ্রৌপদীর ব্যাপার কাব্যালঙ্কার মাত্র ভাবিতে পারেন, ঈশার কর্ত্তৃক ভোজন মহাজন জীবন কাহিনীর অতি বর্দ্ধিত অত্যুক্তি মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু ডাক্তার বর্ণদ সাহেব যে সকল বিস্ময়জনক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে আপনি কি বলিবেন?

প্রার্থনার উত্তর নগদ টাকা।

তৎ সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা বলি। ১ম ঘটনা। একবার শীতের প্রাতঃকালে ইংলণ্ডে সহসা যত অধিক শীতের প্রাদুর্ভাব হইল। বর্ণদের বালক বালিকাগণ শীতে রাত্রিতে থাটে কাঁপিতে লাগিল। তহবিলে পয়সা নাই। বর্ণদ কেমন করিয়া কম্বল ক্রয় করিবেন। তিনি বলেন—

"আমি আগ্রহ সহকারে ভাগবানকে ডাকিতে লাগিলাম"।

যিনি হিমানীবৎ এই তীব্র শীত প্রেরণ করিয়াছেন,তিনি অবশ্য আমাদিগের দরিদ্র বালক বালিকাগণকে শীতপীড়ন হইতে রক্ষা করিবেন। আমি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। হে বিপদভঞ্জন বিভো! আমার পরিবারের পঞ্চ সহস্র বালক বালিকার জন্য কম্বল প্রেরণ করুন। কিন্তু সেই দিবস টাকা আসিল না। পর দিন বালক বালিকাগণ শীতে কাঁপিতেছে। তাহাদিগের দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিলাম না। কম্বলের দোকানে যাইয়া কম্বল দর করিলাম। মূল্য ১৫০০ দেড় হাজার টাকা হইল। কিন্তু টাকা নাই। কম্বল বাছান হইল, লওয়া হইল না। তাহার পর দিন ঈশ্বর সকাশে আমাদিগের আবেদন আবার উপস্থিত করিলাম—প্রভো! আর বিলম্ব সহেনা, অনাথ বালক বালিকাগণের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করুন। পর দিন প্রাতে বর্ণদ প্রথমেই যে পত্র খুলিলেন,তাহার মধ্যে ১ খানি ১৫০০ দেড় হাজার টাকার চেক পাইলেন। পত্র প্রেরক ইংলণ্ডের ১ জন পাদ্রী। তিনি লিখিয়াছিলেন—"অতিরিক্ত শীত হেতু যে গরম কাপড় প্রয়োজন, তাহার মূল্যের জন্য এই ১৫০০ দেড় হাজার টাকা পাঠাইলাম।" এই সময় এই পাদ্রীকে এই টাকা পাঠাইবার প্রবৃত্তি কে দিলেন?

২য় ঘটনা। আরও আশ্চর্য্যজনক। ডাক্তার বর্ণদের মনে হইল যে, ইংলণ্ডের একটী গ্রামে অনাথিনী বালিকাদিগের জন্য

একটী আশ্রম অত্যন্ত আবশ্যক। তিনি শীঘ্রই সেইস্থানে একটী অনাথাশ্রম সংস্থাপন করিবেন, এই বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। কিন্তু এইটী সংবাদপত্রে প্রকাশ করার পরই তাঁহার সন্দেহ হইল, হয় ত এই কার্য্যসাধক অর্থ সংগ্রহ হইবে না। হয়ত এই কার্য্য এক্ষণ আরম্ভ করা ভগবানের ইচ্ছা নহে। এক বন্ধুকে তিনি তাঁহার এই দ্বিধার কথা বলিলেন। সেই বন্ধু বলিলেন, ভাল, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যাউক। এই কার্য্য যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা তাহা প্রকাশ করিবেন। এই বলিয়া দুই ভক্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে বসিলেন, আরাধনা সমাপ্ত হইয়া যাইল। তাঁহারা অক্সফোর্ড নগরে পৌঁছিলেন। পর দিন প্রাতে ডাক্তার বর্ণদের ঘরে জনৈক অপরিচিত পুরুষ প্রবেশ করিলেন "আপনি কি ডাক্তার বর্ণদ?" 'হাঁ' "আপনি নিরাশ্রয় বালিকাদিগের জন্য কতকগুলি আশ্রম স্থাপন করিবেন মানস করিয়াছেন?"

বর্ণদ বলিলেন "হাঁ"। অভ্যাগত ব্যক্তি বলিলেন ভাল, প্রথম আশ্রমটীর জন্য ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা আমার নামে লিখুন" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। বর্ণদ তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহার নিকট এই দানের হেতুবাদ জ্ঞাত হইলেন। ভদ্রলোকটীর একটী কন্যা বিয়োগ হইয়াছিল। সংবাদপত্রে বর্ণদের পত্র তিনি পড়িয়া মৃত-দুহিতা-স্মরণার্থে একটী বালিকাশ্রম নির্ম্মাণ করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। এই কথা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। লণ্ডন যাইলে ডাক্তার বর্ণদকে বলিবেন মনে করিয়াছিলেন। ঘটনা বশতই হউক, বা ঈশ্বরের অচিন্তনীয় নিয়োগ অনুসারেই হউক, তিনি সেই সময় অক্সফোর্ড নগরে আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, বর্ণদ সোৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে সেই গ্রামের ৪৯টী ক্ষুদ্র এবং পাঁচটী বৃহৎ অবলাশ্রমে ডাক্তার বর্ণদ ১০০০ এক হাজার বালিকা প্রতিপালন করিতেছেন।

৩য় ঘটনা। ১৮৯৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ডাক্তার বর্ণদ দেখিলেন যে,তাহার পর দিন প্রায় ৮৭০০০ হাজার টাকা না পাইলে ঐ তারিখে প্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না। কয় দিবস হইতে প্রার্থনা করিতেছিলেন, টাকাও কতক কতক আসিয়াছিল। ৩১শে তারিখে প্রায় ৭০০০০ হাজার টাকা আসিল। ভক্তগণের বিশ্বাস সেইদিন বর্ণদের অধিক টাকার দরকার, তাই দাতাদিগকে দীনবন্ধু সময়কালে টাকা পাঠাইতে প্রবর্ত্তনা দিয়াছিলেন।

৪র্থ ঘটনা। বর্ণদ বলেন যে, অনেক বৎসর পূর্ব্বে, একবার ২৪শে জুন তারিখের মধ্যে ৭০০০ সাত হাজার টাকা না দিতে পারিলে, একটী বন্ধকী সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া যাইবে, এই সর্ত্ত ছিল। আমার দুইজন ধনী বন্ধু আমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যখনই আপনার বড় অর্থকষ্ট হইবে, তখনই আমাদিগকে জানাইবেন। আমি দুইজনকেই লিখিলাম। উত্তর আসিল—একজন সহরে নাই, আর একজন আসন্নমৃত্যু। ২০শে তারিখ আসিল, তথাপি টাকা আসে নাই, বরঞ্চ আরও ৭০০৲ সাতশত টাকা চাহি। ২১শে, ২২শে,২৩শে তারিখ—আমদানী অকিঞ্চিৎ। ২৪শে তারিখ কেবল মাত্র ১০৲ টাকা আসিল। তখন হতাশপ্রায় হইয়া উত্তমর্ণকে অনুনয় করিয়া যদি আরও কিছু মেয়াদ পাই, তাহার

চেষ্টা দেখিবার জন্য নির্গত হইলাম। পথে দেখিলাম, একজন সৈনিক পুরুষ আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমিও তাঁহার প্রতি চাহিলাম। আবার চলিতে লাগিলাম, পর ক্ষণেই, কে আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। ফিরিয়া দেখিলাম, সেই সৈনিক পুরুষ। তিনি বলিলেন "কিছু মনে করিবেন না। আপনার নাম বোধ হয় "বর্ণদ"। আমি বলিলাম "হাঁ" কিন্তু মহাশয়ের নাম অবগত নহি। আপনি আমাকে চিনেন না। আমি আপনাকে চিনি, আমার উপর একটী ভার ন্যস্ত হইয়াছে। দুই মাস পূর্ব্বে আমি ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়াছি। আমাব একটী বন্ধু কর্ণেল—আপনাকে দিবাব জন্য আমাকে একটী পুলিন্দা দিয়াছেন। বোধ হয় তাহাতে টাকা আছে। কারণ আপনার সৎকার্য্যে তিনি অতি শ্রদ্ধাবান্। তাহাব স্ত্রী একটী সখের বাজার বসাইয়াছিলেন। সেইখানে আপনার জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আমি এখানে অল্প দিন আসিয়াছি। এ পর্য্যন্ত আপনার সহিত সাক্ষাৎ কবার অবকাশ হয় নাই। অদ্য প্রাতে ভাবিতেছিলাম, আপনার সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। কেমন আশ্চর্য্য, অদ্যই আপনার সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটিয়া যাইল। আপনি যদি একটু অপেক্ষা করিতে পারেন, আমি সেই পুলিন্দাটী আনিয়া দিই ** তিনি আমাকে পুলিন্দা দিলেন। তাঁহার সম্মুখে তাহা খুলিলাম। তাহাতে ১০০০০, দশ হাজার টাকার ১ খানি চেক পাইলাম। আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। এই টাকা তিন মাস পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে যখন প্রেরিত হইয়াছিল, তখন আমি নিজেই জানিতাম না যে, ২৪শে জুন আমাকে এ টাকা শোধ দিতে হইবে। আমার নিঃসন্দেহ অনুভব হয় যে, ঐ নির্দ্ধারিত দিবসে আমার ঐ টাকা প্রয়োজন হইবে বলিয়াই, ঈশ্বর এতাবৎ কাল পত্রবাহকেব নিকট তিন মাস ধরিয়া, ঐ টাকা রাখিয়াছিলেন * * যখন আমার টাকার দুঃসহ অভাব হইল, তখনই সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বব তাঁহাব দাসের সাহায্যার্থ তাহার শক্তিময় হস্ত প্রসাবণ কবিলেন।

এখন বলি, সাধু মোহন্তেব কথা যদিও অবিশ্বাস কবেন, হয়ত ডাক্তার বর্ণদের কথা অবিশ্বাস করিবেন না। অধিক আব কি লিখিব। সৎ কার্য্যে মতি থাকিলে গতির অভাব হয় না।

৩। যত্র মতি তত্র গতি।

পূর্ব্বে ভক্ত ঋষিদিগের আরাধনাও নিবেদন ঈশ্বর যেমন কাণ পাতিয়া শুনিতেন এখনও তিনি ভক্তদিগের প্রার্থনা তেমনই শ্রবণ করেন, তেমনই সিদ্ধ কবেন। পূর্ব্বে তিনি যেমন ঋষিদিগকে বর দিতেন, এখনও তেমনি রূপান্তরে বর দিতেছেন, প্রার্থিত বস্তু দান করিতেছেন। আমবা প্রার্থনা করিতে জানি না, তাই পাই না। আমাদিগের হৃদয় নির্ম্মল নহে, তাই প্রার্থনা করিতে জানি না। বিষয় ভোগ কামনায় নিয়ত মুগ্ধ, ইন্দ্রিয়গণ দ্বাবা সতত তাড়িত ও ঘূর্ণিত, তাই হৃদয় নির্ম্মল নহে।

বর্ণদ এমন সাধু, তথাপি তাহার শত্রু আছে। তাহাতে ক্ষতি নাই।

সব ভাল কাযেরই শত্রু আছে, আবার শত্রুর ভিতরেও ভাল লোক আছে। যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারাও ভ্রমে পড়িয়া ভাল লোককে আক্রমণ করেন। সংসারে জুয়াচোর ও ভণ্ডের ভাগ এত অধিক যে, অনেক বুদ্ধিমান্ সংসারজ্ঞ ব্যক্তি, পরীক্ষা না করিয়া

কাহাকেও নিঃস্বার্থ পরোপকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন না। জনসন বলিয়াছিলেন, দেশ হিতৈষিতা বা নিঃস্বার্থপরে পক'রিতা প্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র। ইহার অর্থ এমন নহে যে, স্বদেশপ্রেমিক বা পরহিতে রত ব্যক্তি একবারে নাই। ইহার অর্থ, স্বদেশপ্রেমিক ও পরোপকারী ব্যক্তি সংসারে অতি বিরল। এবং সাধুকে চিনিয়া লইবার জন্য পরীক্ষা আবশ্যক। তাই জেনারেল বৃথের নানা প্রকার পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। তাই ডাক্তার বর্ণদকে অনেকবার আদালতে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। কখন কখন বিচারাধিপতি আইনে বাধ্য হইয়া বর্ণদের বিরুদ্ধে ডিক্রি দিয়াছেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণদের কার্য্য মনে মনে অনুমোদন করিয়াছেন। একবার চীফ জষ্টিস্ কোলরিজ বর্ণদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াই তাহাকে চাঁদা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার আশ্রমগুলির বিশেষ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

৪। যত্র শক্র তত্র মিত্র।

ভগবানের এমনি ইচ্ছা যে, মন্দের ভিতর হইতে ভাল বাহির হয়। সাধুগণ যখন শক্র কর্ত্তৃক পীড়িত ও মথিত হন, তখন তাহাদিগের বিপুল হৃদয়জলধি ব্যথিত হয়! কিন্তু এই সাগর মন্থনে ধন্বন্তরী অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে করিয়া উত্থিত হন। সেই অমৃত পানে কত নরনারী অমর জীবন লাভ করেন। সেই মন্থনে লক্ষ্মীর উদ্ভব হয়, সাধুসেবা-নিকেতন স্বরূপ বৈকুণ্ঠধামে তাহার অধিষ্ঠান হয়, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে সেবার্থ অর্থাগম হয়। বর্ণদের জীবনে তাহাই দেখা যায়। সংবাদপত্রে যখন তাহার বিশেষ নিন্দাবাদ বাহির হইত, তখনি তাহার আয় বাড়িত। পূর্ব্বে যাহারা উদাসীন ছিলেন, এইরূপ অত্যাচারে তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উত্তেজিত হইয়া বন্ধুভাবে বর্ণদকে সাহায্য করিতেন। তাই বলিয়াছি, যত্র শক্র তত্র মিত্র। একজন ব্যক্তি বর্ণদকে পূর্ব্বে এক পয়সাও দেন নাই। তিনি বর্ণদের অযথা নিন্দাপূর্ণ একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহাকে ৭০০০৲ সাত হাজার টাকা পাঠাইয়াছিলেন। এক বৎসরে তাহার আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই শক্র কর্ত্তৃক সাগরমন্থনে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের কথা বলিয়াছি।

অনেক সময় শক্র মিত্র অপেক্ষা উপকারী। লোকে অন্যের প্রশংসা শুনিতে চাহে না। কিন্তু নিন্দা কর, তাহা পরম কুতূহলী হইয়া লোকে শুনিবে। কেবল শুনিবে, তাহা নহে, দৌড়িয়া গিয়া পথে ঘাটে যাহাকে দেখিবে তাহাকে বলিবে। সুতরাং যেই সাধুর নিন্দা আরম্ভ হইল, সেই সাধুর নাম নিন্দার ছলে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহার কার্য্যাবলী লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল। এবং পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রকৃত সাধু বিশুদ্ধ স্বর্ণ, অগ্নি পরীক্ষাতে তাহার দেব-চরিত্র-কান্তি তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় আরও দীপ্তি পাইতে থাকে, পূর্ব্বাপেক্ষা জনগণকে অধিকতর আকর্ষণ করে, বর্ণদ যখনই পরীক্ষাতে পড়িয়াছেন, তখনই যে তিনি শুদ্ধ বর্ণ বা নির্ম্মল সুবর্ণ, তাহাই প্রমাণ হইয়াছে। নিন্দুকগণ সাধুগণের অহিতসাধনে তৎপর হইয়া ভগবানে বিচিত্র বিধান যন্ত্র কৌশলে, হিত সাধন করিয়া ফেলে।

তাই বলিয়াছি যত্র শক্র তত্র মিত্র।

এখন আমরা বর্ণদের জীবনে দেখিলাম:

যত্র মন তত্র ধন। যথা ভক্তি তথা মুক্তি,
যত্র মতি তত্র গতি। যত্র শক্র তত্র মিত্র।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

এই প্রবন্ধ ১৮৯৭ সালের রিভিউ অব রিভিউ নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত Dr. Barnardo. বিষয়ক একটী প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া লিখিত"।

বাচস্পতি মিশ্র।

বাচস্পতি মিশ্র মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রের বহুতর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই সকল পুস্তক সংস্কৃত সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি ছিল। অনেক সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের রচিত গ্রন্থাবলীর টীকা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চূড়ামণির জীবনী সম্যকরূপে আলোচিত হয় নাই। আজ পর্য্যন্তও তাহার আবির্ভাব কাল নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই।

১৮৬৪ খ্রীঃ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপক কাউয়েল, ইংরেজী অনুবাদসহ 'উদয়নাচার্য্যের' রচিত "কুসুমাঞ্জলির" মূল প্রকাশ করেন। তাহার ভূমিকায় তিনি বাচস্পতি মিশ্রকে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* অদ্য পর্য্যন্ত এই মতের বিরুদ্ধে কেহ লেখনী চালনা করিয়াছেন কি না জানিনা। ১৮৭৬ খ্রীঃ ডাক্তার মিত্র 'বিবাদচিন্তামণির পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহাকে ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ অধ্যাপক ওয়েবার স্বরচিত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে' ডাক্তার মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিয়া, কাউয়েল সাহেবের এই ভ্রান্ত ও অমূলক অভিমত প্রামাণিক বোধে গ্রহণ করিয়াছেন।

* Professor E. B. Cowell's Preface to his edition of "Kusmmanjali" (1864), and A. Weber's "History of Indian Literature (1878) p. 245.

† Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. (III. 35.)

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাচস্পতিমিশ্র মিথিলাদেশে সেমৌলগ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি কেশব মিশ্রের পুত্র। বাচস্পতির পুত্রের নাম লক্ষ্মী দাস। বাচস্পতিমিশ্র মার্ত্তণ্ডতিলক স্বামীর শিষ্য ছিলেন। ইনি মৈথিল স্মার্ত্তকার মার্ত্তণ্ডমিশ্র হইতে পৃথক ব্যক্তি। এই মার্ত্তণ্ড মিশ্রের রচিত প্রায়শ্চিত্তমার্ত্তণ্ড বিদ্যমান আছে *। তিনি সামবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বাচস্পতিমিশ্রের পিতা কেশবমিশ্র অতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন। তিনি ষড়দর্শনেই সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। "ভাষারত্নে' তিনি বৈশেষিক, সাংখ্য ও ন্যায়দর্শনের সমালোচনা করিয়াছেন। ছাত্রদিগের সহজে ন্যায়দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভের আশায়, তিনি ন্যায়দর্শন সম্পর্কে "তর্কপরিভাষা" রচনা করেন।

"ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দং প্রণম্যেশং জগদ্গুরুং।
শ্রীমৎকেশবশর্ম্মাহং 'ভাষারত্নং' বদাম্যহং॥ (ভাষারত্ন)

"বালোঽপি যো ন্যায়নয়ে প্রবেশং
অল্পেন বাঞ্ছত্যলসশ্রুতেন।
সংক্ষিপ্তযুক্ত্যন্বিত "তর্কভাষা"
প্রকাশ্যতে তস্য কৃতে ময়ৈষা॥' (তর্কপরিভাষা)

"দ্বৈতপরিশিষ্ট" নামে স্মৃতিগ্রন্থে কেশব মিশ্র ব্যবহার, বিবাদ, বিবাহ, দান, শ্রাদ্ধ ও অশৌচাদি স্মৃতিশাস্ত্রীয় বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই কয়েক খানি পুস্তক ভিন্ন

* মার্ত্তণ্ডমিশ্রের রচিত "প্রায়শ্চিত্তমার্ত্তণ্ডের" ১৫৪৪ শকাব্দের (১৬২২ খ্রীঃ) লিখিত একখানি পুস্তক বেতিয়ার সন্নিহিত ভাঁরোবা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।
"নত্বা সরস্বতীং দেবীং শঙ্খকুন্দেন্দুসুন্দরীং।
প্রায়শ্চিত্তস্তু মার্ত্তণ্ডো মার্ত্তণ্ডেন বিধায়তে॥"
(Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss VII)

সামবেদী ব্রাহ্মণদিগের জন্য তিনি "ছন্দোগ-পরিশিষ্ট" এবং "প্রকাশ" নামে তাহার ভাষ্য রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় কেশব-মিশ্রের রচিত অন্য কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই *।"

'পরিমাণনিবন্ধ' নামক স্মৃতিগ্রন্থে, কেশব মিশ্র আপনাকে মিথিলারাজের প্রধান সভাসদ ও কবীন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"তীরভুক্তি-মহীপাল-পরিষন্মুখ্য-সূরিণা।
শ্রীকেশবকবীন্দ্রেণ নিবন্ধোঽয়ং বিধীয়তে॥"

কেশবমিশ্রের রচিত "তর্কপরিভাষার' ভাষ্য অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিতের দ্বারা রচিত হয়। বলভদ্রমিশ্রের কৃত টীকার নাম 'তর্কভাষাপ্রকাশিকা'। মৈথিল নৈয়ায়িক বলভদ্র মিশ্রের পুত্র গোবর্দ্ধন 'তর্কানুভাষা' নামে ইহার আর একখানি টীকা রচনা করেন। বিশ্বনাথ ও পদ্মনাভ নামে গোবর্দ্ধনের যে দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তন্মধ্যে পদ্মনাভ তাঁহাকে তর্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করান। তাঁহাদের মাতার নাম বিজয়শ্রী। বিশ্বনাথ

---

* 'স্মৃতিসার' ও 'ন্যায়তরঙ্গিণী' নামে দুইখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। অসম্পূর্ণ স্মৃতিসারে কোন্ তিথিতে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। "প্রয়োগসারে" দশপৌর্ণমাসাদি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চাননের রচিত ভাষা-পরিচ্ছেদের অনুকরণে "ন্যায়তরঙ্গিণী" রচিত হইয়াছে। ইহাতে সপ্তপদার্থের গুণলক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই উভয় পুস্তক বঙ্গদেশীয় একজন কেশব শর্ম্মা দ্বারা প্রণীত হইয়াছে। 'প্রয়োগসার' ও 'হরিসাধন চন্দ্রিকা' কেশব স্বামীর রচিত। স্মৃতিসারও প্রয়োগসারের গ্রন্থকার একই ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

"জগতীহেতুং নত্বা শ্রীকেশবশর্ম্মণা লিখিতঞ্চতৎ।
"স্মৃতিসারং" মণিহারং কুরুতারং স্মৃতিসারং পারংষৎ॥
(স্মৃতিসার)

"শ্রিয়ঃ পতিং নমস্কৃত্য কণ্বঞ্চমুনিসত্তমং।
প্রয়োগসারং বক্ষ্যামি কেশবোঽহংযথামতি॥"
(প্রয়োগসার)

জ্ঞানাতীতং হরিং নত্বা তস্য ভক্তিপ্রসিদ্ধয়ে।
রচ্যতে কেশবেন্দ্রেণ হরিসাধন চন্দ্রিকা॥
(হরিসাধনচন্দ্রিকা)

কেশবভট্ট (প্রদীপ) নামে কতকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত "কৃত্যপ্রদীপ", "শুদ্ধি প্রদীপ", "আচারপ্রদীপ", ও "প্রায়শ্চিত্ত প্রদীপ" পাওয়া গিয়াছে। তিনি লৌগাক্ষিভট্টের বংশধর। তাঁহার পিতামহের নাম কেশব এবং পিতার নাম অনন্তভট্ট। অনন্তভট্ট "সময় নির্ণয়" নামে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। ১৬০২ শকাব্দের লিখিত তাহার প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। তিনি উমাপতির আদেশে "প্রহ্লাদচম্পূ" ও নৃসিংহচম্পূ" রচনা করেন। গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী পুণ্যস্তম্ভ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মাধ্যান্দিনশাখাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

"শ্রীলৌগাক্ষিকুলারবিন্দ তরণি র্মাধ্যন্দিনাম্নায়বিৎ
মীমাংসাযুগতথ্যতর্কচতুরঃ সাহিত্যরত্নাকরঃ।
কাব্যং শ্রীনৃহরেঃ করোতি সুকৃতী গোদা-তট-প্রোল্লসৎ
পুণ্যস্তম্ভ নিবাসি-কেশবসুতানন্তাত্মজঃ কেশবঃ॥
"যচ্ছিষ্যৈ র্জগতীতলং পরিবৃত, য স্তর্কবিদ্যানিধিঃ,
শ্রীলৌগাক্ষিকুলারবিন্দতরণি র্মাধ্যন্দিনঃ কেশবঃ।
যং প্রাসূত সদা শিবাঙ্ঘ্রি কমলদ্বন্দ্বৈকনিষ্ঠংপরং
ভট্টানাংতমহং নমামি পিতরং সাম্বং কৃপাম্ভোনিধিং॥
কিং ভোজঃ কিমু বিক্রমঃ কিমপরঃ কণাবতীর্ণঃ কলৌ
সর্ব্বেষামিতি যত্র ধীর্ভবতি, সঃ ক্ষৌণীতলে নন্দতি।
শূরঃ শ্রীউমাপতি র্দলয়তি গোবিন্দভক্তিপ্রিয়ঃ,
শ্রীমৎ-কেশবপণ্ডিতো বিতনুতে চম্পূং তদীয়া জ্ঞয়া॥
প্রহ্লাদ চম্পূ।

পূর্ব্বোক্ত লৌগাক্ষিভাস্কর একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। জানকীনাথ তর্কচূড়ামণির রচিত "ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর" 'প্রকাশ' নামে ভাষ্য লৌগাক্ষির রচিত। তদ্ভিন্ন ন্যায়-দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার প্রণীত "পদার্থমালাপ্রকাশ" রঘুনাথ শিরোমণির পদার্থখণ্ডনের ভাষ্যরূপে লিখিত হয়। (Dr. F. E. Hall's Contributions towards the Bibliography of Indian Philosophy.)

(নৃসিংহচম্পু-কাব্য)

মেঘদূতের, 'মুক্তাবলী' নামে টীকা রচনা করেন।

বিজয়শ্রীতনুজন্মা গোবর্দ্ধন ইতি স্মৃতঃ
তর্কানুভাষাং তনুতে, বিবিচ্য গুরুনির্ম্মিত" ॥
শ্রীবিশ্বনাথানুজপদ্মনাভানুজো গরীয়ান্ বলভদ্রজন্মা।
তনোতি তর্কানাধিগত্য সর্ব্বান, শ্রীপদ্মনাভাদ বিদুষো বিনোদান ॥"
(তর্কানুভাষা)

পদ্মনাভের অপর ভ্রাতা পদ্মনাথ (প্রদ্যোতন) মিশ্র 'প্রকাশ' নামে চন্দ্রালোক অলঙ্কারের টীকা ও ভাস্কর নামে উদয়নআচার্য্যের গুণকিরণাবলীর ভাষ্য রচনা করেন। ভাস্কর ভট্টের কৃত ব্যাখ্যার নাম 'পরিভাষা দর্শন'। 'তর্কপরিভাষার' পূর্ব্বোক্ত তিনখানি টীকা ভিন্ন, আরও পাঁচখানি টীকা বিদ্যমান আছে বলিয়া ডাক্তর হল সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। কৌণ্ডিন্যদীক্ষিত ও চেন্নুভট্টের কৃত টীকা 'প্রকাশিকা', মাধবদেবের টীকা 'সারমঞ্জরী', গোপীনাথের টীকা 'ভাবপ্রকাশ' এবং গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌমের ভাষ্য 'ভাবার্থদীপিকা' নামে পরিচিত।

বাচস্পতিমিশ্র স্বরচিত কোন গ্রন্থেই আপনার পিতার নাম স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি "কৃত্যমহার্ণব" ও "দ্বৈতনির্ণয়" নামক স্মৃতি গ্রন্থদ্বয়ের আরম্ভে কেশবের বন্দনা করিয়াছেন। এই 'কৃত্যমহার্ণবে' তিনি আপনার আশ্রয়দাতা হরিনারায়ণ দেবের বংশাবলী বর্ণনা পূর্ব্বক রাজা হরিনারায়ণের আদেশে ইহা রচিত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আভীরদারকং উদঞ্চিতকিঙ্কিণীকং,
আতাম্রপাণিচরণং পুরুষং পুরাণং।
মঞ্জীরমঞ্জুমরুণাধরমর্দ্ধজাঙ্কং,
অদ্বৈতচিন্ময়-মনাদি-মনন্ত-মীড়ে ॥"

'কৃত্যমহার্ণবে' দ্বাদশ মাসের অনুষ্ঠেয় কার্য্য ও নানা ব্রতের বিষয় বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। মিথিলার রাজা হরিনারায়ণের আদেশে 'কৃতমহার্ণব' রচিত হয়। এই হরিনারায়ণ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভবেশের প্রপৌত্র এবং হরিসিংহদেবের পৌত্র। তাঁহার পিতার নাম দর্পনারায়ণ।

"আসীন্মৈথিলমেদিনীশাতমখঃ প্রত্যর্থিসীমন্তিনী-
নিত্যোদ্দীত-ভুজপ্রতাপ-তপন-প্রোত্তপ্ত-সপ্তার্ণবঃ।
রাজৎ কীর্ত্তিকুমুদ্বতী-পরিমল প্রাগ্‌ভাবি ভূমণ্ডলো,
রাজা শ্রোত্রিয়-বংশভূষণমণিঃ শ্রীমান্ ভবেশঃ কৃতী ॥
অস্যান্বয়ময়মলং বিমলী করিষ্যন্,
কীর্ত্ত্যা দিশো দশ মুহু ধবলীকরিষ্যন্।
সংগ্রামসীমনি ভটাংস্ত্রিদশীকরিষ্যন্,
আবিবভূব তনয়ো হরিসিংহ-দেবঃ ॥
এতস্মাদ্দ্বিজবংশভূষণমণিঃ সর্ব্বার্থচিন্তামণিঃ
ষটতর্কাসবণিঃ প্রতাপতপন-প্রারব্ধ-শুদ্ধারণিঃ।
প্রত্যর্থি ক্ষিতিপান্ধকারতরণিঃ শ্রীদর্প-নারায়ণো
রাজাসীদবনীভূষণমণিঃ ভূপালচূড়ামণিঃ ॥
আনন্দয়ন্ দ্বিজকুলং পিতৃকুলমুন্মীলয়ন্নাখিলং।
এতস্মাদজনি কৃতী শ্রীহরিনারায়ণো নৃপতিঃ ॥
শ্রীবাসুদেবভক্তঃ শ্রীসারদায়াঃ প্রসাদমাসাদ্য।
শ্রীমানয়ং নরেন্দ্রঃ শ্রীকৃত্যমহার্ণবং তনুতে ॥
মিথিলাবলয়বিভ্রাজঃ শ্রীহরিনারায়স্য কীর্ত্তিরয়ো।
তাবদ বিকশতু ভুবনে যাবদ বিষ্ণু র্বিরোচতু গগনে ॥
ইতি সপ্রক্রিয়মহারাজাধিরাজ—শ্রীহরিনারায়ণ-নিদেশাৎ মহামহোপাধ্যায় সন্মিশ্র-শ্রীবাচস্পতিবিরচিতঃ কৃত্য মহার্ণব' সমাপ্তিমগাৎ।" (কৃত্যমহার্ণব)

দ্বৈতনির্ণয়ে বাচস্পতি মিশ্র স্নান, সুদগ্রহণ, দত্তকপুত্র, মলমাস এবং তীর্থস্থলে শিরোমুণ্ডনাদি সন্দিগ্ধ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছেন। 'কৃত্যমহার্ণবে' তিনি যেমন মিথিলার চারিজন নরপতির অনুচিত প্রশংসায় আপনার লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন, সেইরূপ 'দ্বৈতনির্ণয়ে' তিনি পুরুষোত্তম দেবের পিতা রাজা ভৈরব

সিংহ এবং তাহার মাতাকে অতিরিক্ত প্রশংসা ও তোষামোদ বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। রাজা ভৈরবসিংহের মহিষীর আদেশে 'দ্বৈত নির্ণয়' রচিত হয়। রাজা ভৈরবসিংহ 'তুলা পুরুষ' নামে দান ব্যাপার সম্পাদন করেন।

"সব স্খলিতসাগর' বাবিত যো নপণামনা,
ভূজাবিজিতকাধনে -বদিত য স্তুলাপুরুষান।
স এব নৃপ ভৈরব, সমবসীয়ি পঞ্চাননো.
জযত্যাবিবিদাবকো জগতি বাদ-দাবক ॥
অযং বাপি নানান ... ব নীনাং,
... দো প্রতাপানতীনা ভ্যানা।
নিদাকাগতি শ্রেযসো নানভূমিঃ,
পুনীতে জগন্মণ্ডলং বাজচন্দ্রঃ ॥
সতাভানেব ... গোবীব মদনদ্বিষঃ।
... নৃপ ...ভৈরব-ভামিনী ॥
... ভৈরবেন্দ্রধরণীপতিধর্ম্মপত্নী,
রাজাধিরাজ ... দেবমাতা।
বাচস্পতিং নি... নিযোজ্য,
দ্বৈত নির্ণয়... বিধিব ... ॥ (দ্বৈতনির্ণয়)

'কৃত্যমহার্ণবে' যিনি হরিনারায়ণ নামে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই 'দ্বৈতনির্ণয়ে' ভৈরবেন্দ্র নামে পরিচিত হইয়াছেন। উদ্ধৃত অংশ পাঠে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। মিথিলার রাজা ভৈরবেন্দ্র হরিনারায়ণের সভায় বাচস্পতিমিশ্র অবস্থিতি করিতেন। রাজা ও রাজমহিষী উভয়েই অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ভবেশ, হরিসিংহদেব, দর্পনারায়ণ, ভৈরবসিংহ দেব (হরিনারায়ণ) এবং পুরুষোত্তম দেব নামক মিথিলার পাঁচজন নরপতির নামও ইহা হইতে জানা যাইতেছে। বাচস্পতি মিশ্র 'পিতৃভক্তিতরঙ্গিণী' নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে পুত্রের কর্ত্তব্য পিতৃশ্রাদ্ধের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তক তিনি মিথিলারাজ রামভদ্রদেবের আদেশে রচনা করেন। তিনি রাজা রামভদ্রের সভাসদ ছিলেন। রামভদ্র রূপনারায়ণ নামেও পরিচিত ছিলেন। রূপনারায়ণ রামভদ্রদেবের পিতা হরিনারায়ণ মিথিলায় রাজত্ব করিতেন।

"প্রণম্য বাসুদেবায তন্যতে স্বর্গরঙ্গিনী।
শ্রীবাচস্পতি-ধীরেণ পিতৃভক্তিতরঙ্গিনী ॥"

ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ-শ্রীহরিনারায়ণাত্মজ-শ্রীরূপনারায়ণাপদবীমনস্ক ৎমিথিলামণ্ডল—শ্রীরামভদ্র-চরণাদিষ্টেন পরিষদা শ্রীবাচস্পতিশর্ম্মণা বিরচিতোহয়ং শ্রাদ্ধকল্পঃ পরিপূর্ণঃ।" (পিতৃভক্তিতরঙ্গিনী)

'দ্বৈতনির্ণয়ের উল্লিখিত পুরুষোত্তমদেবের প্রকৃত নাম রামভদ্র (রূপনারায়ণ), পিতৃভক্তিতরঙ্গিনীর শেষাংশ দৃষ্টে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতীত হইতেছে। ইহা হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে বাচস্পতি মিশ্র মিথিলার রাজা ভৈরব সিংহ (হরিনারায়ণ) এবং তাহার পুত্র রামভদ্র (রূপনারায়ণ) দেবের সভাসদ ছিলেন।

ডাক্তর মিত্র মহোদয় এই তিন গ্রন্থ যে একই ব্যক্তির রচিত, তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি রামভদ্রকে রূপনারায়ণের পুত্র এবং হরিনারায়ণের পৌত্র বলিয়া ভ্রমক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

এক্ষণে রাজা ভৈরব সিংহ (হরিনারায়ণ) দেবের সময় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। এই সময় নির্ণয় করিতে পারিলে বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব কাল নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইবে।

বাচস্পতি মিশ্রের রচিত 'কৃত্য মহার্ণব' হইতে জানা যাইতেছে, রাজা ভৈরবসিংহ (হরিনারায়ণ) দেবের পিতার নাম দর্পনারায়ণ, এই রাজা দর্প নারায়ণের আদেশে

* 'The work was compiled by Vachaspati Sarma, a court pandit, under the orders of Rambhadra, son of Rupnarayan and grandson of Harinarayan of Mithila.' (Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. V. 90)

ক্রমে বিদ্যাপতি ঠাকুর দায়াধিকার সম্বন্ধে 'বিভাগসার' নামে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন।* বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত 'দানবাক্যাবলী' হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা দর্পনারায়ণের প্রকৃত নাম নরসিংহ দেব। রাজা নরসিংহদেব রাজ পণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুরের বংশধর। রাজা নরসিংহের পত্নীর নাম ধীরমতী দেবী †। এই ধীরমতী দেবীর আদেশে বিদ্যাপতি 'দানবাক্যাবলী' রচনা করেন। ধীরমতী দেবীর গর্ভে রাজা নরসিংহদেবের দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভৈরবসিংহ কনিষ্ঠ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধীরসিংহ। রাজা ভৈরবসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি ঠাকুর 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী' রচনা করেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বাচস্পতি মিশ্র ও বিদ্যাপতি ঠাকুর একই সময়ে মিথিলার রাজা ভৈরব সিংহের সভা অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। বিদ্যাপতি ঠাকুরের অসামান্য কবিত্ব ও বাচস্পতি মিশ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য মিথিলাকে একই সময়ে গৌরবান্বিত করে।

বিদ্যাপতি ঠাকুর যখন বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হন, সেই সময়ে বাচস্পতি মিশ্র পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেন। বিদ্যাপতি ভবসিংহের পৌত্র ও দেবসিংহের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা শিবসিংহের আদেশ ক্রমে 'পুরুষ পরীক্ষা' রচনা করেন। তিনি শিবসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মসিংহের পত্নী রাজ্ঞী বিশ্বাস দেবীর আদেশে 'গঙ্গাবাক্যাবলী' ও 'শৈব সর্ব্বস্বসার' প্রণয়ন করেন। বাচস্পতি মিশ্রের রচিত কোন গ্রন্থ শিবসিংহ, পদ্মসিংহ বিশ্বাসদেবী ও নরসিংহদেবের আদেশ ক্রমে রচিত হয় নাই। অতএব বিদ্যাপতি ঠাকুর যে বাচস্পতি মিশ্র অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

---

* আমরা "কবি বিদ্যাপতির জীবনী" নামক পুস্তকে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পরিচয় প্রসঙ্গে মিথিলার রাজ বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। উক্ত পুস্তকের ১৪—৩১ পৃষ্ঠায় বিদ্যাপতির জীবনী এবং তাঁহার রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর বিবরণ লিখিত হইয়াছে। উহার ৯৭ পৃষ্ঠার টীকায় মিথিলার কতিপয় নৃপতির আনুমানিক রাজত্ব সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রবন্ধে স্থলে স্থলে উক্ত পুস্তক হইতে কোন কোন বিষয় গৃহীত হইল।

† ডাক্তর মিত্র মিথিলার রাজা নরসিংহদেবের মহিষীকে রাজ পণ্ডিত রামেশ্বরের দুহিতা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে 'বিদ্যাপতির জীবনী' পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় আমরা ধীরমতীর সেইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি। নরসিংহদেব রাজ পণ্ডিত রামেশ্বরের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ডাক্তর মিত্র এই কামেশ্বরকে ধীরমতীর পিতা রামেশ্বর নামে পরিচিত করিয়া, মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের ভ্রম এক্ষণে প্রত্যাহার করিতেছি।

(Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. V. 137.)

* বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটী কবিতার অন্তে দেবসিংহের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই কবিতা রচনার সময় বিদ্যাপতি রাজা দেবসিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ১৩৮০—১৪৯০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন।

"সসন পরস খসু অম্বর রে
দেখল ধনী দেহ।
নব জলধরে তঁরে সঞ্চর রে
জনি বিজুরি রেহ॥
আজ দেখল ধনি জাইল রে
মোহি উপজল রঙ্গ।
কনক লতা জনু সঞ্চর রে
মহী নিরঅবলম্ব॥
তা পুন অবরুব দেখল রে
কুচযুগ অরবিন্দ।
বিগসিত নহি কিউ কারণৈ রে
সোঝা মুখ চন্দ॥

"পুরুষ-পরীক্ষায়" যিনি বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক ভবসিংহদেব নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, বিদ্যাপতির "বিভাগসার" ও বাচস্পতি মিশ্রের 'কৃত্যমহার্ণবে' তিনিই ভবেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই ভবেশ বা ভবসিংহদেবের দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দেবসিংহ জ্যেষ্ঠ ও হরিসিংহ কনিষ্ঠ। ভবসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবসিংহ মিথিলায় রাজত্ব করেন। দেবসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবসিংহ মিথিলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। শিবসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মসিংহ মিথিলায় রাজত্ব করেন। তদনন্তর পদ্মসিংহের মহিষী বিশ্বাসদেবী রাজ্যশাসনের ভার প্রাপ্ত হন। তদনন্তর নরসিংহ (দর্পনারায়ণ), ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ (হরিনারায়ণ) এবং রামভদ্রসিংহ(রূপনারায়ণ)যথাক্রমে মিথিলার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। রাজপণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুর দ্বারাই রাজবংশ মিথিলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাপতি ঠাকুর ও বাচস্পতি মিশ্রের প্রণীত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে মিথিলার ব্রাহ্মণ রাজবংশের এই বিবরণ পাওয়া যাইতেছে।

বিদ্যপতি কবি গাওল রে
বুঝহ রসবন্ত।
দেবসিংহ নৃপ নাগর রে
হাসিনি দেই কন্ত ॥"

পূর্ব্বোক্ত কবিতা হইতে হাসিনি দেবী দেবসিংহের মহিষী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই কবিতা কতদূর প্রামাণিক তাহা বলিতে পারি না। অপর দুইটী কবিতার ভণিতায় রাজা রাঘবসিংহ ও তাঁহার পত্নী মোদবতীর উল্লেখ দেখা যায়। এই রাঘবসিংহ পদের লক্ষ্য রাজা রঘুসিংহ (বিজয়নারায়ণ) বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি রাজা নরসিংহ (দর্পনারায়ণ) দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের অন্যতম।

"মোদবতী পতি, রাঘব সিংহ গতি,
কবি বিদ্যাপতি গাই ॥"
"ভণতি বিদ্যাপতি সুনু পরমান।
বুঝু নৃপ রাঘব ব্রষ পচোবান ॥"

বিদ্যাপতি ঠাকুর ও বাচস্পতি মিশ্রের বর্ণিত মিথিলার রাজবংশাবলী যে অভ্রান্ত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা উভয়েই মিথিলার নৃপতিদিগের সভাসদ ও সমকালিক কবি ছিলেন। মিথিলার প্রামাণিক ইতিহাস ও বংশাবলী 'পাঞ্জী' নামে পরিচিত। পাঞ্জী ১২৪৮ শকাব্দ (১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে তালপত্রে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। রাজা হরিসিংহদেবের আদেশ ক্রমে মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী ইহাতে সঙ্কলিত হইতে থাকে। 'পাঞ্জী'র লেখকগণ 'পাঞ্জিয়ার *' নামে পরিচিত। এই 'পাঞ্জী' রীতিমত ৫৭০ বৎসর যাবৎ তালপত্রে লিখিত হইয়া প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। পাঞ্জীর প্রদত্ত বংশপত্রিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও বাচস্পতি মিশ্রের বর্ণিত সংক্ষিপ্ত রাজবংশাবলী পূর্ণাবয়বে পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।

---

* মিথিলার পাঞ্জিয়ারগণ বঙ্গদেশের কুলজ্ঞ ঘটক দিগের সদৃশ। তাঁহারা প্রতি বৎসর মিথিলার গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন পূর্ব্বক তৎপূর্ব্ব বর্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ বালক বালিকার জন্ম হয়, তাহাদের নাম সংগৃহীত করেন। পরে পাঞ্জীতে সেই সকল নবজাত ব্রাহ্মণ সন্ততির নাম রীতিমত লিখিত হয়। প্রত্যেক মৈথিল ব্রাহ্মণের জন্ম ও বিবাহের বিষয় পাঞ্জীতে উল্লিখিত থাকে। পাঞ্জীতে যে সকল বালক বালিকার উল্লেখ থাকে না, জাত্যাভিমানী কোনও ব্রাহ্মণ তাহাদের সহিত স্বীয় কন্যা কি পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হয় না। এই জন্য পাঞ্জী শুদ্ধরূপে লিখিত করিবার জন্য, সকল মৈথিল ব্রাহ্মণেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি ও মনোযোগ থাকে। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে সৌরাথ মহেশী ও অন্যান্য স্থানে বিবাহের লগ্ন উপস্থিতের পূর্ব্বে মেলা হয়। সেই মেলায় বিবাহ-যোগ্য সন্তানের পাত্রপাত্রীর অনুসন্ধানে সকল মৈথিল ব্রাহ্মণ সমবেত হয়। কুলজ্ঞ পাঞ্জিয়ারগণ পাঞ্জী দৃষ্টে বিভিন্নবংশজ ও বিভিন্ন স্থানবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিবাহের বৈধাবৈধতা নির্ণয় করিয়া দেন। পাঞ্জিয়ারগণের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনত মস্তকে গৃহীত হয়। তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুসারে বিবাহের কথা বার্ত্তা নির্দ্দিষ্ট হয়। মধুবনীর ৭।৮ মাইল পশ্চিমস্থ সৌরাথ গ্রামের মেলার সময় লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ সমবেত হয়।
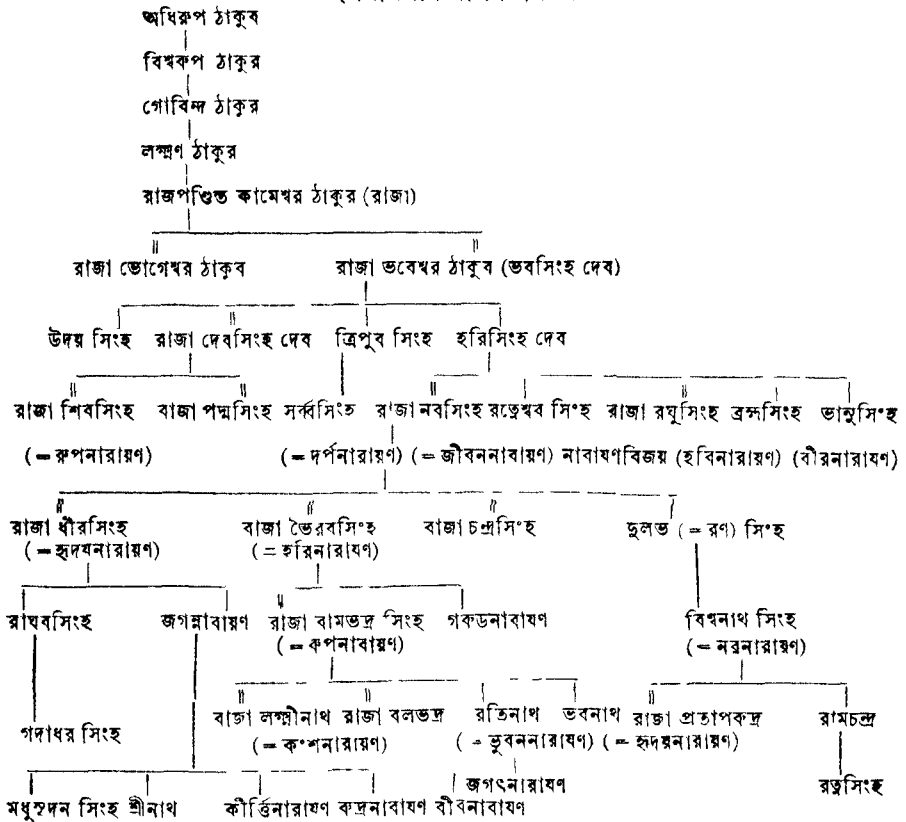
শতাধিক বৎসর অতীত হইল অযোধ্যা প্রসাদ নামে জনৈক মিথিলাবাসী কায়স্থ উর্দ্দু ভাষায় দ্বারবঙ্গ (দারভাঙ্গা) রাজবংশের এক ইতিহাস রচনা করেন। ইহাতে তিনি প্রচলিত কিম্বদন্তী অবলম্বনে মিথিলার প্রাচীন রাজবংশের দশ জন নরপতির নাম ও রাজত্ব কাল নির্দ্দেশ করেন। অযোধ্যা প্রসাদের প্রদত্ত নিম্নোদ্ধৃত নামমালা ও রাজত্ব সময় ১৮৭৮ খ্রীঃ সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র মহোদয় স্বসম্পাদিত "বিদ্যাপতি পদাবলী" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকের ভূমিকায় প্রথমতঃ প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ সুপণ্ডিত গ্রিয়ারসন সাহেব সারদা বাবুর গবেষণা-পূর্ণ ভূমিকার সারমর্ম্ম সঙ্কলন পূর্ব্বক 'বিদ্যাপতি' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেন। আমরা 'কবি বিদ্যাপতি'' পুস্তকে অযোধ্যা প্রসাদের উল্লিখিত নামমালা ও রাজত্বকাল নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিয়াছি।* ১৮৭৪ খ্রীঃ সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ বাবু 'বিদ্যাপতি' শীর্ষক প্রবন্ধে অযোধ্যাপ্রসাদের নির্দ্দিষ্টকাল কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। রাজকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন যে, পাঞ্জীর মতে

* এই বংশপত্রিকা মিথিলার প্রামাণিক ইতিহাস 'পাঞ্জী' হইতে সঙ্কলন করিয়া, ১৮৮৫ খ্রীঃ সুপণ্ডিত গ্রিয়ারসন সাহেব সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। গ্রিয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত বংশাবলী যথাসাধ্য সংশোধন পূর্ব্বক এস্থলে প্রদত্ত হইল (IndianAntiquary for 1885, XIV 19.)

* "কবি বিদ্যাপতি" (৯৭ পৃষ্ঠা) এবং "বঙ্গদর্শন চতুর্থখণ্ড (১২৮২) জ্যৈষ্ঠ"৮৭ ও ৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
Indian Antiquary for 1885, XIV. 187.

দেবসিংহ ৬১, শিবসিংহ ৩॥, পদ্মাবতী ১॥, লখিমা ৯, বিশ্বাসদেবী ১২ এবং নরসিংহ ৬ বৎসর রাজত্ব করেন। শিবসিংহ ১৩৬৯-৭৩ এবং নরসিংহদেব ১৩৯৫-১৪০১শকাব্দ পর্য্যন্ত মিথিলায় রাজত্ব করেন।

(১) ভবসিংহ (ভবেশ্বরসিংহ)	১৩৪৮—৮৫খ্রীঃ	=৩৭	বৎসর
(২) দেবসিংহ (দেবেশ্বরসিংহ)	১৩৮৫—১৪৪৬	=৬১	,,
(৩) শিবসিংহ	১৪৪৬—৪৯	=৩	,,
(৪) লখিমা দেবী	১৪৪৯—৫৮	=৯	,,
(৫) বিশ্বাস দেবী	১৪৫৮—৭০	=১২	,,
(৬) দ্রব্যনারায়ণ	১৪৭০—৭১	=১	,,
(৭) হৃদয়নারায়ণ	১৪৭১—১৫০৬	=৩৫	,,
(৮) হরিনারায়ণ	১৫০৬—২০	=১৪	,,
(৯) রূপনারায়ণ	১৫২০—৩২	=১২	,,
(১০) কংশনারায়ণ	১৫৩২—৪৯	=১৭	,,

পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকায় অযোধ্যাপ্রসাদ রাজা ভবসিংহকে মিথিলার রাজবংশের আদিপুরুষ ও প্রথম নৃপতি বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, ১৩৪৮—১৫৪৯খ্রীঃ পর্য্যন্ত ২০১ বৎসরে দশজন রাজার ধারাবাহিক রাজত্ব সময় প্রদান করিয়াছেন। গড়ে প্রত্যেক নরপতির রাজত্বকাল বিংশতি বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম তিন জনের রাজত্ব কাল দ্বারা শত বৎসরেরও অধিক পূর্ণ করা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী সাত জনের শাসন সময় ঠিক শত বৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। অযোধ্যাপ্রসাদের মতে ভবসিংহ ও দেবসিংহ দুইজনে ৯৮ বৎসর রাজত্ব করেন। দুই পুরুষে এক শতাব্দী রাজত্ব করা ইতিহাসে প্রায় দেখা যায় না। পিতা পুত্রের পক্ষে এত দীর্ঘকাল রাজত্ব কোনও ক্রমে সম্ভবপর বোধ হয় না। অযোধ্যাপ্রসাদের মতে শিবসিংহ তিন বৎসর কাল মাত্র রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মতে তিনি সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশীয় কোনও রাজা শিবসিংহের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। শিবসিংহের অসংখ্য কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন মিথিলায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার খনিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরোবর মিথিলার নানা স্থানে বর্ত্তমান আছে। লেহরাতে শিবসিংহের খনিত অতি বৃহৎ সরোবরের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তথায় তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি প্রদর্শিত হইতেছে। লেহরা গ্রাম কমলা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। লেহরা গ্রামের অতি বৃহৎ সরোবর 'রজোখরি' নামে পরিচিত। এই সরোবর যেমন সকল জলাশয় হইতে বৃহত্তম, সেইরূপ শিবসিংহ সমুদয় মৈথিল নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার নির্ম্মিত কীর্ত্তিকলাপের ন্যায় জনপ্রবাদ মুক্তকণ্ঠে শিবসিংহের সুদীর্ঘ রাজত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

"পোখরী রজোখরী, ঔর সভ পোখরা।
রাজা শিব সিংহ,ঔর সভ ছোক্‌ড়া॥"

অযোধ্যাপ্রসাদের তালিকায় রাজ্ঞী পদ্মাবতীর নাম পর্য্যন্ত অনুল্লিখিত রহিয়াছে। রাজা কামেশ্বর, ভোগেশ্বর, পদ্মসিংহ, রঘুসিংহ (বিজয়নারায়ণ), চন্দ্রসিংহ, বলভদ্র ও প্রতাপরুদ্র দেবের নাম অযোধ্যা প্রসাদের তালিকায় দেখা যাইতেছে না, কিন্তু 'পাঞ্জী' গ্রন্থে তাঁহাদের সকলের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত রহিয়াছে। কায়স্থজাতীয় অযোধ্যা প্রসাদ ব্রাহ্মণজাতির লিখিত 'পাঞ্জী' গ্রন্থ দেখিতে পান নাই। 'পাঞ্জী' দৃষ্টে রাজবংশের নামমালা প্রস্তুত করিলে, অযোধ্যা প্রসাদ কখনও রাজা ভবসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী ও কংশনারায়ণের পরবর্ত্তী নরপতিগণকে অনুল্লিখিত রাখিতেন না। যিনি রাজবংশের নাম নির্দ্দেশে

এরূপ গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার সময় নির্দ্দেশ অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অযোধ্যাপ্রসাদ রাজা দর্পনারায়ণকে দ্রব্যনারায়ণ নামে পরিচিত করিয়া, তাঁহার রাজত্ব কাল এক বৎসর মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অযোধ্যাপ্রসাদের মতে তিনি ১৪৭১ খ্রীঃ মিথিলার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মতে তিনি ১৩৯৫ শকাব্দ (১৪৭৩ খ্রীঃ) হইতে ছয় বৎসর কাল মিথিলায় রাজত্ব করেন।

এই সকল কারণে আমরা অযোধ্যাপ্রসাদ ও রাজকৃষ্ণ বাবুর নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতি আস্থাবান হইতে পারিতেছি না। অযোধ্যা প্রসাদের নির্দ্দিষ্ট সময় নির্ণয়ের প্রতি সুপণ্ডিত জন্ বিম্স ও জর্জ গ্রিয়াবসন্ সাহেব সন্দিহান হইয়া 'বিদ্যাপতি' শীর্ষক প্রবন্ধে * তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের কেহই কোন বিশিষ্ট কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক মিথিলার রাজবংশের বিভিন্ন নরপতিদিগের সময় নিরূপণের কোনও চেষ্টা করেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহার মীমাংসা করিব।

'কবি বিদ্যাপতি' নামক পুস্তকের ২৮-২৯ পৃষ্ঠায় আমরা শিবসিংহের প্রদত্ত এক খানি তাম্রশাসনের মূল প্রকাশ করিয়াছি। বাগ্‌মতী (কমলা) নদীর তীরবর্ত্তী 'গজরথপুর' রাজধানী হইতে এই শাসনপত্র প্রকাশিত হয়। মহারাজাধিরাজ শিবসিংহ ইহা দ্বারা ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে আপনার সভাসদ সুকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে বিসপী গ্রাম উপভোগার্থ প্রদান করেন। ইহা শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বৃহস্পতি বারে লিখিত হয়। ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে বাঙ্গলা সন ৮০৭, ১৪৫৫ সংবতাব্দ এবং ১৩২১ শকাব্দ প্রচলিত ছিল বলিয়া এই শাসনপত্রের শেষে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাপতি বিসপী গ্রাম দানপ্রাপ্ত হন এবং ১১০৭ খ্রীঃ মিথিলায় লক্ষ্মণাব্দের প্রচলন আরম্ভ হয়। ইহা হইতে মিথিলার প্রাচীন রাজবংশ, বাঙ্গালার সেনবংশ, শিবসিংহ ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের সময় নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে। শিব সিংহের প্রদত্ত এই শাসনপত্র মিথিলার প্রাচীন রাজবংশের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের প্রধান অবলম্বন।

পূর্ব্বোল্লিখিত শাসন পত্রের আরম্ভের দুইটী শ্লোক বাঙ্গলা অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু ১৮৭৪ খ্রীঃ ইহার অস্তিত্বের বিষয় ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "বঙ্গদর্শনে" বঙ্গবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অবগত করান। এই তাম্রশাসন রাজা শিব সিংহের রাজত্বের ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা দেবসিংহের রাজত্ব কালে লিখিত হয় বলিয়া সেই প্রবন্ধে তিনি নির্দ্দেশ করেন। মৈথিল পণ্ডিতদিগের অনুমান ও জনপ্রবাদ ভিন্ন তিনি 'পাঞ্জীকে' এই মতের প্রমাণস্থলে উপস্থিত করেন।* তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত রাজ-

* Indian Antiquary (II. 37, IV. 299 and XIV. 188)

অযোধ্যাপ্রসাদের নির্দ্দিষ্ট সময় নির্ণয়ের প্রতি সন্দিহান হইয়া জন্ বিমস্ সাহেব বিদ্যাপতির সুদীর্ঘ জীবন কালের প্রতিও সন্দিগ্ধ হইয়াছেন। বিদ্যাপতি ১৩৮০—১৪৯০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ১১০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই সপ্রমাণিত হইতেছে।

* "পাঠকগণ দেখিবেন যে, রাজা শিবসিংহের দানপত্রে লক্ষ্মণসেনের অব্দ ব্যবহৃত। অনুসন্ধান দ্বারা পরে আমরা অবগত হইয়াছি যে, মৈথিল পণ্ডিতসমাজে অদ্যাপি মহারাজা লক্ষ্মণসেনের অব্দ চলিতেছে। উহার চিহ্ন 'লসং' মাঘমাসের প্রথম দিন হইতে উহার বৎসর

কৃষ্ণ বাবুর এই ভ্রান্ত মত নিরাপত্তিতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কেহই কোন আপত্তি উত্থাপিত করিয়া এই মতের যথোচিত সমালোচনা করিতে প্রয়াস পান নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু বোধ হয় মৈথিল 'পাঞ্জী' এবং তাম্রশাসনের মূল অথবা তাহার প্রতিলিপি দেখিতে পান নাই। কারণ তাহা হইলে তিনি সমগ্র শাসন পত্রের প্রতিলিপি অবশ্যই মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতেন। উক্ত প্রবন্ধের শেষভাগে রাজকৃষ্ণ বাবু বিদ্যাপতির জীবনী সংগ্রহে সাহায্য দানের নিমিত্ত দ্বারবঙ্গের রাজবংশজাত বাবু বংশীধারী সিংহ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয়,এই বংশীধারী সিংহ তাঁহাকে শিবসিংহের নামাঙ্কিত শাসনপত্রের শ্লোক দুইটী প্রেরণ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ "নানাপ্রবন্ধ" নামক পুস্তকে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত অন্যান্য চৌদ্দটী প্রবন্ধের সহিত 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ অবিকল প্রকাশিত হয়। এই শাসন পত্রের শেষে ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ ও ১৩২১ শকাব্দ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকা সত্ত্বেও,রাজকৃষ্ণ বাবু ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দকে ১৩২৩ শকাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তিনি শাসনপত্রের মূল অথবা তাহার প্রতিলিপি সংগ্রহে কখনও বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। এই শাসন পত্রের সমূল প্রতিলিপি সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য ভারতবাসী সুপণ্ডিত গ্রিয়ারসন সাহেবের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে।*

এই শাসনপত্রে শিবসিংহ 'মহারাজাধি-

পরিবর্ত্তন ঘটে। এক্ষণে ৭৬৭ লক্ষ্মণ সংবৎ চলিতেছে। এ সময়ে শকাব্দ ১৭৯৭ ও খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৪ বর্ষ বহমান। সুতরাং শকাব্দ ১০৩০ ও খ্রীষ্টাব্দ ১১০৭ লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কাল হইতেছে। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান দ্বারা ১১০০খ্রীঃ হইতে ১১২০ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব সময় ধরিয়াছেন। মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণাব্দ দ্বারা তাঁহার মতেরই সমর্থন হইতেছে।

১০৩০ শকাব্দে লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ। সুতরাং ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ ১৩২৩ শকাব্দ হইতেছে। যদি শেষোক্ত বৎসর রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি কবিকে ভূমি-দানপত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৩৬৯ শকে শিবসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন, মিথিলার পাঞ্জী গ্রন্থে এরূপ উক্তি কেন দেখা যায়? ইহাতে ত তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে দান করিতে দেখা যাইতেছে। মৈথিল পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই দানপত্র তাঁহার যৌবরাজ্য কালে প্রদত্ত। শিবসিংহ অনেক আয়াসসাধ্য কার্য্য করিয়াছিলেন। এ প্রকার জনশ্রুতি আছে। কিন্তু অত্যল্প কাল অর্থাৎ সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইহাতে প্রতীত হয় যে,সেইকার্য্য সকল তদীয় যৌবরাজ্য কালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মিথিলায় এরূপ কিম্বদন্তীও আছে। পাঞ্জী প্রবন্ধানুসারে শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের রাজত্বকাল ৬২ বৎসর। সুতরাং রাজা হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে শিব সিংহ যুবরাজ ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই বিস্ময়কর নহে।" (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ। ১২৮২, ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা)

* "The following is the deed of endowment granting Bisapi to Vidyapati. It happened that for reasons, which need not be detailed here, I have been unable to get possession of the actual copper plate. I managed however, to get a carefully corrected copy. It has never, I believe, been published." (Dr. G. A. Grierson's article on "Vidyapati and his contemporaries" in 'Indian Antiquary' for 1885, XIV.190.)

গ্রিয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত শাসনপত্রের এই প্রতিলিপিতে ২৯৩ স্থলে '২৮৩' লিখিত রহিয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর উদ্ধৃত শাসনপত্রের শ্লোক দুইটী সারদা বাবুর পুস্তকের ভূমিকায় অবিকল গৃহীত হয়। সারদা বাবুও তাহা সংগ্রহের কোন চেষ্টা করেন নাই। এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর, দারভাঙ্গার কালেক্টর মিঃ Tute সাহেবের সাহায্যে গ্রিয়ারসন সাহেব তাম্র শাসনের যে মূল ১৮৯৫খৃঃ প্রকাশ করিয়াছেন,তাহাতে ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ (সম্বৎ) লিখিত রহিয়াছে। (Proceedings of A. S. of Bengal for 1895. page 143)

রাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা দেবসিংহের জীবিতকালে এই শাসনপত্র দ্বারা কবিচূড়ামণি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে বিসপী গ্রাম প্রদান করা হয় নাই। পিতার জীবিত কালে এই শাসন পত্র উৎকীর্ণ ও প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, দানকর্ত্তা যুবরাজ শিবসিংহ ইহাতে কখনই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পিতৃদেবের নাম পর্য্যন্ত শাসন লিপিতে অনুল্লিখিত রাখিতেন না। পিতার আদেশে এই গ্রাম প্রদত্ত হইতেছে, ইহা অবশ্যই শাসনপত্রে উক্ত হইত। শাসনপত্রের দ্বিতীয় শ্লোকে শিবসিংহদেব 'নৃপতি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ষষ্ঠ শ্লোকে পিতা দেবসিংহের অনুষ্ঠিত 'তুলা পুরুষ' নামে দান ব্যাপার অতীত কালে সম্পাদিত হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শাসনপত্রের সপ্তম শ্লোকে পিতার নাম ও বিষয় অতীত ঘটনার ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকের সহিত 'পুরুষ পরীক্ষার' আরম্ভের প্রথম শ্লোক তুলিত হইতে পারে। শিবসিংহের রাজত্ব কালে 'পুরুষ পরীক্ষা' রচিত হয় বলিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় দেবসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যুবরাজ শিবসিংহের শিক্ষাদানের জন্য ইহা রচিত হয়। এই নিমিত্তই তাহার পঞ্চম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'ভাতি যস্য জনকো' এবং প্রথম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে "শ্রীদেবসিংহ ক্ষিতিপাল" লিখিত রহিয়াছে*। 'পুরুষ পরীক্ষার' ন্যায় এই শাসন পত্রের আটটী শ্লোকও বিদ্যাপতির দ্বারা রচিত হয়। 'পুরুষ পরীক্ষা' রাজা শিবসিংহকে নীতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয়। 'পুরুষপরীক্ষার' রচনা সমাপ্তির পর ১৪০০ খ্রীঃ এই শাসনপত্র বিদ্যাপতির দ্বারা রচিত হয়। 'পুরুষ পরীক্ষার' প্রদত্ত উপদেশে অত্যন্ত উপকৃত হইয়া, নবীন রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি ঠাকুরকে তাঁহার আবাস গ্রাম বিসপী প্রদান করিয়া থাকিবেন। আমাদের বিবেচনায় পিতৃবিয়োগের পরে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মহারাজ শিবসিংহ এই দান পত্রের দ্বারা বিদ্যাপতিকে বিসপী গ্রাম প্রদান করেন। তাহার রাজত্ব প্রাপ্তির ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে এই শাসন-পত্র লিখিত হয় নাই। তাহার রাজত্বের আরম্ভ বৎসরে ১৪০০ খ্রীঃ এই দানপত্র লিখিত হয়। রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই রাজা শিবসিংহ আপনার প্রিয় সভাসদকে স্বাধীন ভাবে বিসপী গ্রাম প্রদান করেন।

সচরাচর পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা* করা হয়। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ শিবসিংহের রাজত্ব আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসন স্পষ্টাক্ষরে ইহা নির্দ্দেশ করিতেছে। এই তাম্রশাসনের উক্তি অনুমান ও জনপ্রবাদ অপেক্ষা অবশ্যই অনেক অধিক মূল্যবান্। 'পাঞ্জী' গ্রন্থে মিথিলার প্রাচীন রাজাদিগের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলে, গ্রিয়ারসন্ স্বরচিত প্রবন্ধে অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিয়া রাজবংশের নামমালার সহিত পাঞ্জীর বর্ণিত সময় নির্দ্দেশ করিতেন। রাজা শিব-

* "কবি বিদ্যাপতি," ২০।২৮।২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* "This grant was translated by me in the Indian Antiquary, Vol XIV (1885) p.190...My attention has again been drawn to the matter by article of Dr. Eggling... In describing a mss. of the *Durga-bhakti-tarangini*, he discusses the whole question of Vidyapati's life and times. There is no doubt that the date of this grant gives rise to serious difficulties in regard to the chronology of Vidyapati's life, and it is desirable that the grant itself should be carefully examined. A reduced fac-simile of the plate is here published, so as to allow of its leisurely examination by experts in epigraphy." (Proceedings of A. S. B. for 1895. p. 143-44)

সিংহের প্রদত্ত ও তাঁহার সভাসদ কবি বিদ্যাপতির লিখিত তাম্রশাসন, অতি আধুনিক অযোধ্যা প্রসাদের উক্তি অপেক্ষা অবশ্যই অধিকতর প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য। পশ্চাৎ আমরা মৈথিল রাজ বংশের সময় যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিলাম।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভে অযোধ্যার অধিপতি সূর্য্যবংশীয় হরিসিংহদেব মুসলমান জাতির আক্রমণে সপরিবারে স্বদেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তিনি দুঃসময় কুলদেবী তুলজা ভবানীকে সঙ্গে লইয়া আগমন করেন। নেপালের দক্ষিণস্থ জঙ্গলাকীর্ণ 'তরাইর' অন্তর্গত সিমরাউনগড়ে তিনি আপনার আবাসস্থল মনোনীত করেন। ঠকুরী বংশীয় জয়জগৎমল্ল তখন নেপালে ও মিথিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। ৮৮০ খ্রীঃ ঠকুরীবংশীয় রাঘবদেব স্বীয় রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে নেপালে নেওয়ারী সংবৎ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ১১৭ বৎসর পর ১০১৯ শকাব্দে মল্লবংশ নান্যদেব দ্বারা নেপাল হইতে বিতাড়িত হইয়া, মিথিলায় পলায়ন ও আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা হরিসিংহদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিথিলায় মল্লবংশের আধিপত্য অব্যাহত থাকে। সিমরাউনগড়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর হরিসিংহদেব মিথিলা আক্রমণ করেন। মল্লবংশীয় জয় জগৎমল্ল পরাক্রান্ত হরিসিংহদেবের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হন। মিথিলায় হরিসিংহদেবের আধিপত্য তদবধি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মিথিলায় বহুসংখ্যক সরোবর খনিত করান। কুলদেবী তুলজা ভবানীর আদেশ ক্রমে তিনি নেপাল আক্রমণ ও অধিকার করেন। ভাটগাঁও নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৪৪ নেপালী সংবতে (১৩২৪খৃঃ) নেপাল হরিসিংহের পদানত হয়। *

১৩২৪ খ্রীঃ হরিসিংহদেব নেপালে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত গ্রন্থকার চণ্ডেশ্বর ঠাকুর এই হরিসিংহদেবের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৪৮ শকাব্দে (১৩২৬ খ্রীঃ) এই হরিসিংহদেবের আদেশে মিথিলার প্রামাণিক বংশাবলী "পাঞ্জ" লিখিত হইতে আরম্ভ হয় †। নেপালের প্রামাণিক বংশাবলীর মতে ২৮ বৎসর কাল হরিসিংহদেব নেপালে রাজত্ব করেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৩২৪ ৫২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজা হরিসিংহদেব নেপালের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন।

মল্লবংশীয় নরপতিদিগের অধিকারকালে অধিরূপ ঠাকুর মিথিলায় উপনিবিষ্ট হন। বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে অধিরূপ ও তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা মিথিলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অধিরূপের চতুর্থবংশধর কামেশ্বর ঠাকুর রাজা হরিসিংহদেবের সভায় রাজ পণ্ডিতের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ বল্লালসেনদেবের রচিত 'দানসাগর' নামক স্মৃতি গ্রন্থের অনুকরণে, রাজ পণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুর দ্বিতীয় এক 'দানসাগর' রচনা করেন। চণ্ডেশ্বর ও কামেশ্বর ঠাকুর সমসাময়িক ছিলেন।

১৩২৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মহারাজ হরিসিংহদেবের আধিপত্য মিথিলায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ে তাঁহার আদেশে তালপত্রে মৈথিল

* Dr G Buhler's "Inscriptions from Nepal" (1885), p 39.

† "শাকে শ্রীহরিসিংহদেব-নৃপতে ভূপার্কতুল্যোঽজনি।
তস্মাদন্তমিতেঽব্দকে দ্বিজগণৈঃ পঞ্জী-প্রবন্ধঃ কৃতঃ"॥
(বঙ্গদর্শন, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী "পাঞ্জ" নামে সঙ্কলিত হইতে থাকে। নেপাল অধিকারের পর হইতে মহারাজা হরিসিংহ তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নেপাল ও মিথিলা শাসন করিতে থাকেন। তিনি আপনার বিশ্বস্ত অমাত্য ও রাজ পণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুরের হস্তে মিথিলার শাসনভার প্রদান করেন। অনুমান ১৩৩০ খ্রীঃ কামেশ্বর ঠাকুর হরিসিংহদেবের অধীনে বা স্বাধীন ভাবে মিথিলার শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই কামেশ্বর ঠাকুরই মিথিলার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রাজ বংশের প্রথম রাজা। ১৩৫২ খ্রীঃ মহারাজা হরিসিংহদেবের মৃত্যু হয়। তৎপর মিথিলা গৌড়ের নবাব সমসুদ্দিন হাজি ইলিয়াস সাহেবের পদানত হয়। এই হাজি ইলিয়াস দ্বারা হাজিপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৩২৩ খ্রীঃ দিল্লীশ্বর মহম্মদ টোগলক দ্বারা মিথিলা দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং হরিসিংহদেবের রাজধানী সিমরাউনগড় বিধ্বস্ত হয়।

মিথিলার এই রাজবংশের রাজত্ব ১৩৩০ খ্রীঃ আরম্ভ হয়। শিবসিংহ ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এই দুইটী ঘটনা হইতে অনুমান বলে এই নৃপতিবংশের রাজত্বকাল অবধারিত হইল এবং প্রচলিত সময় নির্ণয় পূর্ব্বোল্লিখিত নানা কারণে ভ্রান্ত বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল। অযোধ্যা প্রসাদের প্রদত্ত তালিকায় মাত্র দশজন নরপতির নাম প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে আমরা অষ্টাদশ জন নরপতি ও রাজ্ঞীর নাম প্রদান করিলাম। পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী কাল গণনা করিয়া, এই সময় নির্দ্দিষ্ট হইল।

১। রাজা কামেশ্বর ঠাকুর (১৩৩০—৫০)
২। রাজা ভোগেশ্বর ঠাকুর (১৩৫০—৬০)
৩। রাজা ভবেশ্বর ঠাকুর (ভবসিংহ দেব) (১৩৬০—৮০)
৪। রাজা দেবেশ্বর ঠাকুর (দেব সিংহ দেব) (১৩৮০—১৪০০)
৫। রাজা শিবসিংহ দেব (রূপনারায়ণ) (১৪০০—২০)
৬। রাজ্ঞী পদ্মাবতী (১৪২০—২২)
৭। রাজ্ঞী লখিমা দেবী (১৪২২—৩০)
৮। রাজা পদ্মসিংহ (১৪৩০—৩৮)
৯। রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবী (১৪৩৮—৫০)
১০। রাজা নরসিংহ দেব (দর্পনারায়ণ)(১৪৫০—৭০
১১। রাজা রঘুসিংহ দেব (বিজয় নারায়ণ) (১৪৭০—৭২)
১২। রাজা ধীরসিংহ দেব (হৃদয় নারায়ণ) (১৪৭২—৮০)
১৩। রাজা ভৈরবসিংহ দেব (হরিনারায়ণ) (১৪৮০—১৫০০)
১৪। রাজা চন্দ্রসিংহ দেব (১৫০০—১৫০৫)
১৫। রামভদ্র দেব (রূপ নারায়ণ) (১৫০৫-২৫)
১৬। রাজ লক্ষ্মীনাথ (কংশ নারায়ণ) (১৫২৫—৪০)
১৭। রাজা বলভদ্র দেব (১৫৪০—৪৫)
১৮। রাজা প্রতাপরুদ্র দেব (১৫৪৫—৫৫)

উপরি উদ্ধৃত রাজবংশের নামমালা হইতে দেখা যাইতেছে যে, রাজা ভৈরব সিংহ (হরিনারায়ণ) দেব ১৪৮০ খ্রীঃ হইতে ১৫০০ খৃঃ পর্য্যন্ত মিথিলায় রাজত্ব করেন। অযোধ্যা প্রসাদের মতে তিনি ১৫০৬-২০খ্রীঃ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। অতএব তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৮০-১৫২৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিনি মিথিলার অধিপতি রাজা ভৈরব সিংহ (হরি নারায়ণ) দেব ও রাজা রামভদ্র (রূপনারায়ণ) দেবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। সুপণ্ডিত কাউয়েল সাহে-

বের অনুমান * যে একান্ত ভ্রান্ত ও অমূলক, তাহা ইহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হইতেছে।

আমরা উপরে বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাঁহার রচিত কতিপয় গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে আমাদের অনুমানের সত্যতা ও অভ্রান্ততা প্রতিপাদিত হইতেছে। ১৪২৮ সংবতাব্দের (১৪৮৪ খ্রীঃ) লিখিত ও বাচস্পতি মিশ্রের রচিত "তত্ত্বসমীক্ষা" নামে বৈদান্তিক গ্রন্থ ডাক্তার হল সাহেব প্রাপ্ত হন। ৪২৫ লক্ষ্মণাব্দের (১৫৩২ খ্রীঃ) লিখিত "শূদ্রাচার চিন্তামণি" এবং ৪৩৩ লক্ষ্মণাব্দের (১৫৪০ খ্রীঃ) লিখিত "আচার চিন্তামণি" গ্রন্থের প্রতিলিপি ডাক্তর মিত্রের গবেষণায় মিথিলায় আবিষ্কৃত হয় †। এই "শূদ্রাচারচিন্তামণি" রাজা হরিনারায়ণের (ভৈরব সিংহ দেবের) আদেশে রচিত হয়।

আমরা চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী বলিয়া ইতিপূর্ব্বে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে "ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালায়" নির্দ্দেশ করিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্র এই চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের 'বিবাদ রত্নাকর', লক্ষ্মীধর ভট্টের 'কৃত্যকল্পদ্রুম' এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টের 'মদনপারিজাত' প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে, "বিবাদচিন্তামণি" নামে পুস্তক রচনা করেন। ৬০ বৎসর গত হইল, ১৮৩৭ খ্রীঃ 'বিবাদচিন্তামণি' কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। ১৮৬৩ খৃঃ সুবিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দ্বারা ইহা ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়।

"শ্রীকৃত্যকল্পদ্রুম-পারিজাত—
রত্নাকরাদীনবলোক্য যত্নাদ্।
বাচস্পতিঃ শ্রীপতি নম্র-মৌলি
র্বিবাদচিন্তামণি মাত নোতি।" (বিবাদচিন্তামণি)

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, বাচস্পতি মিশ্র খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দাতে মিথিলায় আবির্ভূত হন। তিনি "নির্ণয়" ও "চিন্তামণি" নামে যে সকল স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে "দ্বৈতনির্ণয়", "তিথি নির্ণয়", শ্রাদ্ধচিন্তামণি", "আচারচিন্তামণি", শূদ্রাচারচিন্তামণি", "বিবাদচিন্তামণি" ও "ব্যবহারচিন্তামণি" পাওয়া গিয়াছে। "কৃত্যমহার্ণব" ও "পিতৃভক্তি-তরঙ্গিণী" নামে তাঁহার রচিত অপর দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থের ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৬৫০ সংবতাব্দের (১৫৯৪ খ্রীঃ লিখিত "পিতৃভক্তি-তরঙ্গিণী"র একখানি প্রতিলিপি মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে। 'শ্রাদ্ধ-

* কাউয়েল সাহেব কুসুমাঞ্জলির ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করাচার্য্যের রচিত বেদান্ত সূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহা "ভামতী" নামে পরিচিত। শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক অতএব বাচস্পতি মিশ্র খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। 'কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা উদয়ন আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের কৃত 'ন্যায় বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকার' ভাষ্যরূপে 'ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' রচনা করেন। অতএব উদয়নাচার্য্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

"শঙ্করদিগ্বিজয়" গ্রন্থের পঞ্চদশ সর্গে সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, উদয়নাচার্য্য ও শ্রীহর্ষ শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক দার্শনিক। উভয়েই শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বিচারে পরাজিত হয়। 'শঙ্করদিগ্বিজয়ের ত্রয়োদশ সর্গে লিখিতে আছে যে, স্বীয় শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"বাচস্পতিত্ব মধিগম্য ভবান্
বিধাস্যসি ত্বং মমভাষ্য টীকাং॥ (১৩৭৩)
(নানাপ্রবন্ধ) ১০১ পৃষ্ঠা।

† Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. (VI. 22)

* Dr. F. E. Hall's "Contribution towards an Index to the Bibliography of the Indian Philosopical Systems".

Dr. R. L. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss." (VI. 22)

বিধি" নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থও এই বাচস্পতি মিশ্রেরই রচিত।

"আরাধ্য নন্দনন্দন-মধুসন্ধায় প্রযত্নতো গ্রন্থান্।"
শ্রীবাচস্পতি-বিবুধো ব্যবহৃতিচিন্তামণিং তনুতে ॥
(ব্যবহারচিন্তামণি)

"প্রণম্য পরমং তেজো বিচার্য্যাচার্য্যসংহিতাঃ।
শ্রীবাচস্পতিধীরেণ শ্রাদ্ধস্য বিধিরুচ্যতে ॥"
(শ্রাদ্ধচিন্তামণি)

"প্রণম্য পরমাত্মানং নিবন্ধানবলোক্য চ।
শ্রীবাচস্পতিধীরেণ দ্বৈতনির্ণয়ো উচ্যতে ॥" (দ্বৈতনির্ণয়)

"তীক্ষ্ণত্বিষে নমস্কৃত্য শ্রীবাচস্পতিশর্ম্মণা।
ধর্ম্মশাস্ত্রং সমালোচ্য শূদ্রাচারো বিতন্যতে ॥"
(শূদ্রাচারচিন্তামণি)

বাচস্পতি মিশ্রের রচিত "দ্বৈতনির্ণয়" নামক স্মৃতিগ্রন্থের দুইখানি টীকা মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে 'দ্বৈতনির্ণয়প্রকাশ' মধুসূদন মিশ্রের দ্বারা এবং 'দ্বৈতনির্ণয়জীর্ণোদ্ধার' মধুসূদন ঠক্কুর দ্বারা রচিত হয়। বাচস্পতি মিশ্রের রচিত স্মৃতিগ্রন্থগুলি মিথিলায় অদ্যাপি প্রামাণিক ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া সমাদৃত রহিয়াছে।

বাচস্পতিমিশ্র যেমন স্মৃতিশাস্ত্রীয় বহুতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন, সেইরূপ ষড়দর্শন সম্বন্ধে বহু উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অদ্য পর্য্যন্তও তাঁহার প্রতিপত্তি অব্যাহত রহিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার প্রণীত দর্শনশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করা আবশ্যক।

তিনি সুবিখ্যাত ঈশ্বরকৃষ্ণের রচিত 'সাংখ্যকারিকা'র যে উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করেন, তাহা "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' নামে প্রসিদ্ধ। বাচস্পতিমিশ্রের প্রণীত এই গ্রন্থের যে সকল ভাষ্য ও ব্যাখ্যা বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে ভারতী যতীর "তত্ত্বকৌমুদী-ব্যাখ্যা"* রামচন্দ্র সরস্বতীর 'তত্ত্বার্ণব', নারায়ণ তীর্থযতীর 'তত্ত্বচন্দ্র' স্বপ্নেশ্বরের 'তত্ত্বকৌমুদীপ্রভা' এবং রঘুনাথ তর্কবাগীশের 'শাংখ্যতত্ত্ববিলাস' প্রসিদ্ধ। মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্রের' যে ভাষ্য বাচস্পতিমিশ্র রচনা করেন, তাহা "তত্ত্বসারদী" নামে পরিচিত। এই "তত্ত্বসারদী" অবলম্বনে নাগেশভট্ট উপাধ্যায়ের "ছায়া" এবং শ্রীধরানন্দ যতীর "পতঞ্জলরহস্য" প্রণীত হয়। বাচস্পতিমিশ্র বেদান্তসূত্রের' শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত ভাষ্যের "ভামতী" নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করেন। বারাণসীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বালশাস্ত্রী কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ চতুর্দ্ধর, শঙ্কর, সুরেশ্বর (মণ্ডন) মিশ্র ও পদ্মপাদ আচার্য্য বিশেষ ভাবে "ভামতী'র সমালোচনা করেন। এই সুরেশ্বর ও পদ্মপাদ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইতে অবশ্যই পৃথক্ ব্যক্তি। অমলানন্দ ব্যাসাশ্রমের "বেদান্তকল্পতরু" ও অপ্যয় দীক্ষিতের 'বেদান্তকল্পপরিমল" এই "ভামতীর ভাষ্যরূপে লিখিত হয়। অপ্যয়দীক্ষিত ভারদ্বাজগোত্রজ রঙ্গরাজের পুত্র। তিনি 'ভামতীর' ভাষ্যের ভাষ্য রচনা করেন।

"ইত্থমিহাতিগভীরে কিয়দাশয়বর্ণনং ময়া কুরুতে।
তুষ্যন্তি ততোঽপি কতিপয়রত্নগ্রহাদিরত্ননিধেঃ ॥"

"তত্ত্বচিন্তামণি" নামক সুবিখ্যাত ন্যায়গ্রন্থের প্রণেতা গঙ্গেশ্বর উপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় উদ্যোতকর আচার্য্যের প্রণীত "ন্যায়বার্ত্তিক" গ্রন্থের 'ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য নামে যে উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করেন, বাচস্পতিমিশ্র তাহা অবলম্বনে 'ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা' রচনা করেন। গঙ্গেশ্বর ও বর্দ্ধমান যে বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ব্বে মিথিলার

* ভারতীযতী বোধারণ্যপতির শিষ্য ছিলেন। তিনি বাচস্পতি মিশ্রকে 'আচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত করিয়া, অতি বিনীত ভাবে গ্রন্থের শেষভাগে লিখিয়াছেন
"ক্ব বাচস্পতেঃ সূক্তিঃ, ক্ব মন্দস্য মে মতিঃ।
ন চাপি সম্যক্তং তত্ত্বং, ইতি শোধ্যং মনীষিভিঃ ॥"

আবির্ভূত হন, ইহা হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। অধ্যাপক ওয়েবারের অনুমান মতে গঙ্গেশ্বর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। উদয়ন আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের সমকালে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া চারি অধ্যায়ে 'ন্যায়-বার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি' রচনা পূর্ব্বক বর্দ্ধমানের মত সবিশেষ সমালোচনা করেন। অধ্যাপক কাউয়েল, ডাক্তার হল ও মিত্র উদয়নাচার্য্যের 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিকে, বাচস্পতিমিশ্রের রচিত গ্রন্থের টীকা রূপে নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।* উদয়নাচার্য্যের জীবনীতে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে তাহা সবিশেষ প্রদর্শন করিব।

এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন বাচস্পতি মিশ্রের "তত্ত্বসমীক্ষা" ও "ব্রহ্মতত্ত্বসংহিতা" নামে দুইখানি বেদান্ত,"তত্ত্ববিন্দু" ও "ন্যায়কণিকা" নামে দুইখানি মীমাংসা, এবং "তত্ত্বকৌমুদী" নামে একখানি ন্যায়-দর্শন বিষয়ে পুস্তক বিদ্যমান আছে।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে "খণ্ডনোদ্ধার" নামক একখানি পুস্তক বিদ্যমান আছে। এই পুস্তক বাচস্পতি মিশ্রের রচিত। ইহাতে গ্রন্থকার শ্রীহর্ষের রচিত 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'নামক দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বাচস্পতি মিশ্র শ্রীহর্ষের পরবর্ত্তী গ্রন্থকার। এই শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জের অধীশ্বর রাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের পুত্র বিজয়চন্দ্র দেবের আদেশে মহাভারতীয় নলোপাখ্যান অবলম্বনে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে "নৈষধ চরিত" মহাকাব্য দ্বাবিংশ সর্গে রচনা করেন। ১৩৪৮ খ্রীঃ জৈনাচার্য্য রাজশেখর স্বরচিত "প্রবন্ধ-কোষে" শ্রীহর্ষের এই বিবরণ লিখিয়াছেন।* এই "নৈষধচরিতের" ষষ্ঠ সর্গের শেষ শ্লোক দৃষ্টে, তিনি "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" রচনা করেন বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়।

১২৮১ সনের বৈশাখ মাসের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'শ্রীহর্ষ'শীর্ষক প্রবন্ধে বাবু রামদাস সেনের রচিত প্রবন্ধের সমালোচনা করেন। এই প্রবন্ধের শেষভাগে প্রসঙ্গ ক্রমে কাউয়েল সাহেবের মতের সমালোচনা উপলক্ষে রাজকৃষ্ণ বাবু বাচস্পতি মিশ্রকে মাধবাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহার প্রমাণ স্থলে মাধবাচার্য্যের প্রণীত, শঙ্করদিগ্বিজয় হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী উপস্থিত করেন।

"বাচস্পতিত্বমধিগম্য ভবান্‌
বিধাস্যসি ত্বং মম ভাষ্যটীকাং" ॥ (১৩।৭৩)

মাধবাচার্য্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। অতএব বাচস্পতি মিশ্র খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। মাধবাচার্য্যের পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র মিথিলায় প্রাদুর্ভূত হন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে রাজকৃষ্ণ বাবুর মত যে ভ্রান্ত ও অমূলক, সেই সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সংশয় থাকিবে না। মাধবাচার্য্যের উপা-

* Dr. F. E. Hall's "Contributions" (27) and Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss." (VII. 128)

'শ্রীহর্ষ' নামক প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবুও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। (নানাপ্রবন্ধ, ৯৯-১০০)

* ঐতিহাসিক রহস্য, প্রথমভাগ—৬৯ ও ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং।
ষষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডতোঽপি সহজাৎ ক্ষোদক্ষমে তন্মহা-
কাব্যেঽয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ"

খ্যানময় শঙ্করদিগ্বিজয়ে উক্ত কবিতা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

বিবাদচিন্তামণির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিরোমণি ডাক্তার মিত্র ১৮৭৮ খ্রীঃ মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্রকে সাড়ে তিন শত বৎসরের (১৪২৩ শকাব্দের) প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন *। তিনি স্বীয় উক্তির পরিপোষক কোনও প্রমাণ উপস্থিত করিয়া প্রদর্শন করেন নাই। তিনি মাত্র কোলব্রুক সাহেবের মত নিরাপত্তিতে গ্রহণ করেন। আমরা নানা স্থলে ডাক্তার মিত্রের নানা বিষয়ক ভ্রান্ত মতের যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিয়াছি। এই স্থলে তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারিয়া আহ্লাদিত হইতেছি। সুবিখ্যাত কোলব্রুক ও ডাক্তার মিত্রের মতের সত্যতা ও অভ্রান্ততা নানা প্রমাণ উপস্থিত করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদর্শন করিলাম। বাচস্পতি মিশ্র ও মিসরু মিশ্র একই সময়ে মিথিলার রাজ সভায় বিদ্যমান ছিলেন। মিসরু মিশ্র 'বিবাদচন্দ্র" নামে স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি রাজা চন্দ্রসিংহের সভাসদ ছিলেন। রাজা ভৈররসিংহ (হরিনারায়ণ) দেবের মৃত্যুর পর, অতি অল্প কাল চন্দ্র সিংহ মিথিলায় রাজত্ব করেন। রাজা চন্দ্র সিংহের মহিষী লখিমা মহাদেবীর আদেশে এই স্মৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়া মিথিলা পতির নামে গ্রন্থের নামকরণ হয়। রাজা চন্দ্রসিংহ ও লখিমা মহাদেবী খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মিথিলায় আবির্ভূত হন। কোলব্রুক, ডাক্তার মিত্র ও জলি সাহেবের মতে লখিমা দেবী স্বয়ং এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন *। কিন্তু গ্রন্থের আরম্ভে ও শেষে ইহা মিশরু মিশ্রের রচিত বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতে তাঁহাদের উক্তির অসারতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

"শ্রীচন্দ্রসিংহনৃপতে দয়িতা লখিমা মহাদেবী।
বচস্পতি বিবাদচন্দ্রং মিশরুমিশ্রোপদেশতঃ
বিবাদব্যবহারে চ যা প্রমাণ সাদৃশা।
নিবদ্ধা ... সর্ব্বং মুদ॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়মিশরুমিশ্রকৃতো বিবাদচন্দ্রঃ সমাপ্তঃ।

ডাক্তার জলির মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লখিমাদেবী মিথিলায় আবির্ভূত হইয়া, বিবাদচন্দ্র রচনা করেন। এই মত ভ্রান্ত ও অমূলক। লখিমাদেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র সুপণ্ডিত মিশরুমিশ্র এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক সাহেবের মত অনুসারে, ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাচস্পতি মিশ্রকে ১৪২৩ শকাব্দের (১৫০১ খ্রীঃ) প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৭৯৮ খ্রীঃ কোলব্রুক সাহেব 'বিবাদভঙ্গার্ণব" নামে স্মৃতি সংগ্রহ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই স্মৃতিগ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক সার উইলিয়ম জোন্স

* "The author (Vachaspati Misra) was the son of Kesava, and lived about 350 years ago (Saka 1423) Unlike the generality of Pundits of his country, he devoted his attention both to law and philosophy at the same time, and acquired great distinction in both. He wrote several commentaries on standard works on the Nyaya, the yoga, and the Sankhya systems of philosophy, and a whole series of manuals on law under the title of Chintamani, besides several independant treaties. "All his works" says Colebrooke "are held in high and deserved estimation" His son Lakshmidasa, was also an author of some repute." (Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss. III. 35)

* Dr J Jolly's Tagore Law Lectures for 1883" (1885) page 27).
Dr. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss." (V 122) and Colebrooke's Miscellaneous Essays (1873). I. 47.

সাহেবের অনুরোধে সংগৃহীত হয়। ইহার ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করিয়া, সুবিখ্যাত সংস্কৃতবিৎসার উইলিয়ম জোন্স কালগ্রাসে পতিত হন। ১৭৮৮ খ্রীঃ ১৯শে মার্চ্চ তারিখের গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশ ক্রমে এই প্রামাণিক স্মৃতি সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়। জোন্স সাহেবের মৃত্যুর পর, গবর্ণর জেনারেল সার জন সোর এই গ্রন্থের অনুবাদের ভার সদর দেওয়ানী আদালতের বিখ্যাত বিচারপতি কোলব্রুক সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন। ১৭৯৬ খ্রীঃ কোলব্রুক সাহেব "বিবাদভঙ্গার্ণব" স্মৃতির অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া, তাহার একটী নাতিদীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেন। এই ভূমিকায় তিনি দুইটী বাক্যে বাচস্পতি মিশ্রের পরিচয় প্রদান করেন। "১০।১২ পুরুষ গত হইল ত্রিহুতের অন্তর্গত সেমৌল গ্রামে বাচস্পতি মিশ্র আবির্ভূত হইয়া, বিবাদ চিন্তামণি ও ব্যবহার চিন্তামণি প্রভৃতি যে সকল স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাও চণ্ডেশ্বরের বিবাদ-রত্নাকরের ন্যায় মৈথিল স্মার্ত্তসমাজে সমাদৃত রহিয়াছে *।" চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে, কোলব্রুক সাহেবের মতে বাচস্পতি মিশ্র আড়াই কি তিন শত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থকার। ১৭৯৬ হইতে এই সময় বাদ দিলে, ১৪৯৬ কি ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দ বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব কাল পাওয়া যাইতেছে। ডাক্তর মিত্র কোলব্রুক সাহেবের নির্দ্দিষ্ট সময় শকাব্দে পরিণত করিয়া, আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বাচস্পতি মিশ্র ও অন্যান্য কতিপয় মৈথিল গ্রন্থকারের সময় নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ মৈথিল নৈয়ায়িক গঙ্গেশ্বর উপাধ্যায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। এই দ্বাদশ শতাব্দীতে কনোজের রাজসভাসদ লক্ষ্মীধর ভট্ট "কৃত্যকল্পদ্রুম," লক্ষ্মীধরের পুত্র ভট্টোজী দীক্ষিত "সিদ্ধান্ত কৌমুদী," এবং সুকবি শ্রীহর্ষ "নৈষধচরিত" ও "খণ্ডনখণ্ড খাদ্য" রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ্বরের পুত্র বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায় ও "কুসুমাঞ্জলি"র প্রণেতা উদয়ন আচার্য্য মিথিলায় আবির্ভূত হন। এই শতাব্দীর শেষভাগে কাষ্ঠার রাজা মদনপালের সভাসদ বিশেশ্বর ভট্ট "মদন পারিজাত" নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভে মহারাজ হরিসিংহ দেবের সভাসদ চণ্ডেশ্বর ঠাকুর ও কামেশ্বর ঠাকুর মিথিলায় আবির্ভূত হইয়া, যথাক্রমে "বিবাদ রত্নাকর" ও "দানসাগর" নামে স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই কামেশ্বর ঠাকুর মিথিলায় যে অভিনব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই ব্রাহ্মণ বংশীয় নরপতিগণের আশ্রয়ে মিথিলায় সংস্কৃতের চর্চ্চা সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। অনুমান ১৩৩০ খ্রীঃ হইতে ১৫৫৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই বংশ মিথিলায় রাজত্ব করেন। এই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কেশব মিশ্র ও বিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলায় রাজসভা

* "The *Vivad-ratnakar*, a digest highly esteemed by the lawyers of Mithila or Tirbhukti, was compiled under the superintendence of Chandesvar, minister of Harasinhadeva of Mithila. Chandesvar is reputed author of other tracts. The *Vivada chintamani*, *Vyavahar-chintamani* and other works of Vachaspati Misra, are also in high repute among the lawyers of Mithila. No more than ten or twelve generations have passed since he flourished at Semaul in Tirhut. The *Vivada-chandra* and other works composed by Lakhima devi are likewise much respected in the Mithila school." (*Colebrooke's Miscellaneous Essays* (1873), I. 471)

অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। বিদ্যাপতি ঠাকুর ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৮০কি ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন *। এই সময়ে দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মাবতী দেবী, লখিমা দেবী, পদ্ম সিংহ, বিশ্বাস দেবী, নরসিংহ, রঘুসিংহ, ধীরসিংহ ও ভৈরবসিংহ মিথিলায় শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র এই ভৈরব সিংহের সভাসদ ছিলেন। রাজা ভৈরব সিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতি ঠাকুরের মৃত্যু হয়। অনুমান ১৪৫৫ খ্রীঃ হইতে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাচস্পতি মিশ্র জীবিত ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্রের সমকালে মিশরু মিশ্র বিদ্যমান ছিলেন। রাজা চন্দ্রসিংহের সভাসদ ও আত্মীয় মিশরু মিশ্র "বিবাদচন্দ্র" নামে স্মৃতিগ্রন্থ, রাজমহিষী ও পিতৃস্বসা লক্ষ্মীদেবীর আদেশে রচনা করেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

* "কবি বিদ্যাপতি 'পুস্তকের সমালোচনা ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারতের ২১পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। মাননীয় সমালোচক মহাশয় আমাকে বিদ্রূপপূর্ণ তীব্রভাষায় অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত করেন। তাঁহার মতের সহিত আমার মতের বিশেষ পার্থক্য নাই। তাঁহার মতে বিদ্যাপতি ১৩৭৫-১৪৭৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। আমি ১৩৮২ ১৫০৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির জীবিত কাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। স্বমতের পরিপোষক কোন প্রমাণ সমালোচক মহাশয় কখনও নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি পূর্ব্বমত আংশিকভাবে পরিবর্ত্তিত করিলাম। আমার মত পরিবর্ত্তনের কারণ মূল প্রবন্ধে যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছি। উক্ত সমালোচকের কথা অনুসারে "দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী" কে বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থাবলী হইতে বিনা কারণে ও প্রমাণে খারিজ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইতেছি।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (২)

(জীবনী ও পত্রাবলী)।

শম্ভুচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্যের ভক্ত সেবক ছিলেন। তাঁহার এই আলোচ্য জীবনী-গ্রন্থ, সেই সাহিত্যেরই প্রত্যঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে। ইংরেজী-অনুরাগীর জীবনী ইংরেজ ইংরেজীতে লিখিয়াছেন। যে সে ইংরেজেও নহে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই জীবনী ও পত্রাবলী খাস বৃটিশ-বরণ্ সিনিয়র সিবিলিয়ন ইংরেজ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত। সম্যক সহানুভূতি, প্রীতি, সম্মান ও ভক্তি সহকারেই লিখিত ও সম্পাদিত। অতএব, (এই জীবনী যতই অপূর্ণ বা অঙ্গহীন হউক্) এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী শম্ভুচন্দ্রের নিশ্চয়ই শুভগ্রহ; এবং বাঙ্গালী সাধারণেরও কিছু গৌরবের বিষয় বটে। কিন্তু, আমাদের ইংরেজী-সম্পাদক সম্প্রদায়ের মধ্যে, এই জীবনী-গ্রন্থ আদৌ আদৃত হয় নাই; বরং নিন্দিতই হইয়াছে। কোথায়ও নীরবতার নিন্দা, কোথায়ও বা অভিমত বিশেষের নিন্দা, কোথায়ও বা এই গ্রন্থের অপূর্ণতার নিন্দা রটিত হইতে দেখিয়াছি; উহার সমালোচনা কিন্তু আমাদের ইংরেজী সংবাদ পত্রে আদৌ হয় নাই। যাঁহাদের মধ্যে এই গ্রন্থের অধিক আদর ও আলোচনা উল্লেখ হওয়া উচিত ছিল ও স্বাভাবিক ও শোভনীয় হইত,

তাঁহাদের মধ্যেই অবস্থা এই! * ইহা অবশ্যই আক্ষেপের বিষয়। ইহার অনেক কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু, দুইটী কারণ বড় ক্লেশকর। এক কারণ এই যে, নানা কারণে বা অকারণে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্বদেশীয় সম্পাদক সহযোগীদিগের অপ্রিয় ছিলেন। অপর কারণ,তাঁহার জীবনী লেখক মিঃ স্ক্রাইন নিজেও ঐ সম্পাদক সমাজের অপ্রিয়। কাজেই, এই গ্রন্থ "দ্বিপাদ দোষ" যুক্ত, অতএব উপযুক্ত ক্ষেত্রে আলোচিত হয় নাই। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব সাহিত্যের সাধারণ স্বার্থকে সংস্পর্শ করা অতীব গর্হিত হইলেও, যখন করে, তখন সে সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। †

বাঙ্গালা পত্রের বক্ষে, বাঙ্গালা প্রবন্ধে এরূপ ইংরেজী গ্রন্থের আলোচনা, হয় ত কিছু বিসদৃশ বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু, আমরা সে বিবেচনা করিতেছি না। মুখোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক সঞ্চালিত চিন্তা-স্রোত ইংরেজীতে বা হিন্দীতেই প্রবাহিত হউক, তাহা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীরই বস্তু। তদ্ভিন্ন সাহিত্যের সাধারণ তাত্বিক রাজ্যে, ভাষা ভেদে, তাদৃশ অধিকার ভেদ হয় না। বাঙ্গালার আলোচনা ইংরেজীতে ও ইংরেজীর আলোচনা বাঙ্গালায় হইতে পারে। তবে, বিবেচনার বিষয় এই যে,আমরা এই আলোচনা কার্য্যের আদৌ উপযুক্ত কি না? জীবনী গ্রন্থের রচনার ন্যায় আলোচনাতেও জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সবিশেষ জানা থাকিলেই সুবিধা হয়। সে সুবিধা আমাদের আদৌ নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদের এক দিন মাত্র সাক্ষাৎ ও অল্পক্ষণ মাত্র আলাপ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, এই জীবনী-লেখকের সহিতও আমাদের কখনও সাক্ষাৎ ও আলাপ নাই। অতএব বলা বাহুল্য, সাধারণ সমালোচনার অতি দূর স্থানে দাঁড়াইয়াই আমরা দুই এক কথা বলিতেছি। নতুবা, তথ্যজ্ঞতা বা বহুজ্ঞতা জনিত সবিশেষ জ্ঞান দ্বারা এই গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে আমরা আদৌ সমর্থ নই।

গ্রন্থের পূর্ব্বে গ্রন্থকার সম্বন্ধে একটী কথা বলা যাইতে পারে। ন্যায়ানুরোধেই তাহা বলা। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তদীয় সজাতীয় সহযোগীবৃন্দের তাদৃশ প্রিয় ছিলেন না কেন, তাহা অনুসন্ধান ও আলোচনা করার প্রয়োজন নাই, তাহা বস্তুতঃই বড় অপ্রীতিকর। বিশেষতঃ মিঃ স্ক্রাইন এ সম্বন্ধে ইঙ্গিতে এমন কয়েকটী কথা কহিয়াছেন, যাহা হৃদয়-বিদারক। পক্ষান্তরে মিঃ স্ক্রাইন সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট,এখন কমিসনর ;—সিবিল সার্ব্বিসের সাহেবের ন্যায় দোষ ত্রুটী তাঁহার থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু, তিনি যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী নহেন ; প্রত্যুতঃ প্রাণের সহিত বাঙ্গালীকে ভালবাসিতে পারেন ও ভালবাসেন, তাহা তাঁহার প্রণীত এই গ্রন্থ দেখিয়াই বুঝা যায় ; অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

* শুনিয়াছি, মুখোপাধ্যায়-পরিবারের সহায়তার জন্য এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হওয়াতে গ্রন্থকার উহা সম্পাদকদিগকে উপহার প্রেরণ করেন নাই। এরূপ হইলে নীরব সম্পাদকদিগকে নিন্দা করা যায় না। ফলতঃ যৎসামান্য অর্থ রক্ষার্থে সম্ভ্রান্ত সম্পাদকদিগকে সমালোচনার্থে পুস্তক না দেওয়া সমীচীনতা, সাহিত্য-রীতি ও সুবুদ্ধি, তিনেরই বিপরীত। লেখক—

† বলা উচিত "নেসন"-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ শম্ভুচন্দ্র সম্বন্ধে সবিশেষ সুবিচার ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন।—লেখক

তথাচ তিনি এ গ্রন্থ না লিখিয়া শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অন্য কোন ইংরেজ বন্ধু উহা লিখিলেই শ্রেয় হইত। স্ক্রাইন সাহেব শম্ভুচন্দ্রের জীবনী লেখাতেই এক ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা আদৌ উপেক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহাতে করিয়া শম্ভুচন্দ্রের কিছু ক্ষতি হইয়াছে, ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। শম্ভু বাবু নিজে এরূপ স্থলে বড়ই সাবধান ছিলেন, তাঁহার একখানি পত্রে দেখা যায়। ষ্টেট্‌সম্যানের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সুবিখ্যাত রবার্ট নাইটের স্মৃতি সংস্থাপনার্থে অস্মদ্দেশীয় সমাজে কোনও উদ্যোগ আয়োজন না হওয়াতে, শম্ভু বাবু একান্ত বিষণ্ণ ও ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজে ইহার অগ্রণী হইয়া আলোচনা আন্দোলন করিলে, পাছে ঈর্ষা উত্তেজিত হয় ও আপনার লোক-প্রিয়তার অভাবে, উদ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, এই শঙ্কায় ও সন্দেহে তিনি ইহাতে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। ঐ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বন্ধুকে যে কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা এতই সরল ও শিক্ষাপ্রদ যে, একটু উদ্ধৃত করা অন্যায় হইবে না।

"I have many a time thought of communicating with Narendra nath Sen, the Ghose brothers and others or of issuing a circular, but the fear of spoiling the cause has restrained me I wish to follow, not lead, to do my duty quietly and obscurely without attracting notice * * * I have not even published, as I intended his letters to me, lest I should prejudice my excellent countrymen against a good man for the one sin of loving me"

এই কয়টী ছত্রেই বুঝা যায়, শম্ভুচন্দ্রের অন্তঃপ্রকৃতি, প্রকৃত প্রস্তাবে, কতদূর উদার ও উন্নত ছিল। অন্য আলোচনা বা অনুবাদ অনাবশ্যক।

আলোচ্য গ্রন্থে শম্ভুচন্দ্রের জীবন-কাহিনী ও চরিতাখ্যায়িকা অতি সংক্ষেপেই লিখিত হইয়াছে। সে এত সংক্ষেপ যে, স্বকার্য্য সাধনেও সম্যক প্রচুর নহে। স্ক্রাইন সাহেব সংবাদ-পত্রে শম্ভুচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহাই কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত করিয়া এই গ্রন্থে পরিণত বা উহার অঙ্গীভূত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাতে একদিকে শম্ভুচন্দ্রের জীবন ঘটনা যেমন সবিস্তারে বিবৃত হয় নাই, অপরদিকে তেমনি তদীয় প্রকৃতি ও প্রতিভার সম্যক পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই,—আমরা সমস্ত তথ্যজ্ঞ না হইয়াও, এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত নহি। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র স্বভাব এই জীবনীতে প্রতিবিম্বিত হয় নাই, বিশেষত তদীয় প্রকৃতির আভ্যন্তরীন তেজস্বিতা উহাতে অল্পই স্ফুরিত হইয়াছে। সাহিত্য-জীবী, বার্ত্তাপটী-প্রিয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের জীবন-কাহিনী সাধারণতঃ ঘটনা-বহুল না হইলেও, অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা-স্রোতে শম্ভুচন্দ্রের সংকীর্ণ জীবন তরণী সংসারে বহু দিকে চালিত হইয়াছিল, বহু দুর্যোগে ঠেকিয়াছিল ও বিবিধ পরাক্ষার প্রখর তরঙ্গে পড়িয়াছিল। জীবনীকার সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনীর স্থূল অংশ স্পর্শ মাত্র করিয়া সে কাহিনী অতি অল্প কথায় শেষ করিয়াছেন। আমরা তাহার একটী কথাও কহিব না। উপস্থিত আলোচনার সে উদ্দেশ্যই নয়।

বৈচিত্র্য যতটুকুই থাকুক, শম্ভুচন্দ্রের জীবন-বৃত্ত, সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীরই জীবনবৃত্ত। বৃত্তি-হীন ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম, কৃচ্ছ্র-সাধ্য শিক্ষা প্রাপ্তি ও সমাপ্তি। উহাদের সন্ধিস্থলে সহজ-সাধ্য বিবাহ। "অন্নচিন্তা চমৎকার"—চাকুরির নানা স্তর:—তাহার চেষ্টা ও চিন্তা; তাহা হওয়ার লাঞ্ছনা ও যাওয়ার যাতনা। অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ; যৌবনে বার্দ্ধক্য

রোগের ও রাজনীতির অনুশীলন, তাহাদের সহচর্য্য ও সেবা। সংবাদপত্রে ও শ্বাস কাশে পরমায়ু ক্ষয়। তারপর? তারপর যা হইয়া থাকে তাই! নিঃসম্বল সংসার ও পরিবার রাখিয়া অপরিণত বয়সেই মৃত্যু!! তোমার, আমার প্রায় সকলেরই যাহা; শম্ভুচন্দ্রে তাহার বড় ইতর বিশেষ হয় নাই। দরিদ্র আসিয়াছিলেন, দরিদ্রই গিয়াছেন। তবে তিনি মনোরাজ্যের বিপুল বিস্তার করিয়াছিলেন, এই জন্যই, তোমার আমার সহিত তাঁহার আকাশ পাতাল পার্থক্য। কিন্তু, সে রাজ্যেরও এক রসি ভূমি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই! উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার সংসার যেমন, তোমার সাহিত্যও তেমনি "শূন্য" ভাণ্ড পাইয়াছে!!

আলোচ্য গ্রন্থ প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় পূর্ণ; তাহার একপঞ্চমাংস জীবন-কাহিনী; অবশিষ্ট পত্রাবলী। জীবনী-অংশের অপ্রচুর্য্য পত্রাবলীতে কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছে। পত্রাংশেই শম্ভুচন্দ্রের প্রকৃতি ও প্রতিভা অল্লাধিক পরিমাণে প্রস্ফুট। এরূপ পত্র এবং এত পত্র আর কখনও কোনও বাঙ্গালী লেখকের প্রকাশিত হয় নাই। এবং এরূপ প্রকৃতির পত্র লেখার অভ্যাস এদেশীয় লেখক, সম্পাদক ও রাজনৈতিকদের মধ্যে আর কাহারও ছিল বা আছে কি না, জানি না। প্রবন্ধ ও অনুবন্ধের ন্যায় পত্র লিখিতেও শম্ভুচন্দ্র অতি নিপুণ ছিলেন। সমস্ত হৃদয় খানি খুলিয়া পত্রে, প্রকৃত প্রস্তাবেই, কথোপকথন করিতেন। তিনি নিজেও এ বিষয় একখানি পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।—

"I am irregular and forgetful; but when I do write, I pour out my mind, writing at length and conversing on paper."

অতি বৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিতও তাঁহার পত্র লেখালেখি ছিল। এ সম্বন্ধে, অজ্ঞাতনামা একান্ত অপরিচিত স্কুলের ছাত্র বা নিঃসম্বল নূতন লেখকটী পর্য্যন্তও তাঁহার সবিশেষ মনোযোগের বিষয়ীভূত হইত; এই পত্রাবলীতেই তাহার ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা কেবল উদারতা ও স্নেহশীলতা নয়, শতকর্ম্ম-নিরত, সময়াভাবে কাতর এক জন প্রবীণ সম্পাদকের পক্ষে ইহা একরূপ অসাধ্য সাধন। কিন্তু, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই "অসাধ্য সাধন" সাদরে সর্ব্বদাই করিতেন। বরং গণ্য মান্য, পদস্থ ও পণ্ডিত ব্যক্তি অপেক্ষা নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তি এ বিষয়ে, তাঁহার অধিকতর মনোযোগ ও আদর আপ্যায়িত আকর্ষণ করিত। একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন;—

"But it is not the young or the obscure that are neglected in this office . . . just now I might be addressing more than one noble Lord both here and in England, but I prefer Mr. G. V. Syamala Row. *"

যাহাকেই পত্র লিখুন, প্রাণ খুলিয়া লিখিতেন। দুই তিন দিন ধরিয়া এক একখানি পত্র লিখিতেন। নূতন লেখকদিগকে উৎসাহিত করিতে ও উপদেশ দিতে বড় ভালবাসিতেন। সুদীর্ঘ পত্রে তাঁহাদের রচনার দোষ গুণ সমালোচনা ও সংশোধন করিতেন। বলিতেন "আমাদের মধ্যে সুলেখকের সংখ্যা এত কম যে, এরূপ না করিলে লেখক প্রস্তুত হইবে কেমন করিয়া।"

পক্ষান্তরে, লর্ড রোজবারি, লর্ড ষ্ট্যানলে, লর্ড ডাফারিণ, স্যর অকল্যাণ্ড কলভিন, স্যর

* এই মিঃ রাও একজন অপরিচিত নবীন লেখক।

চার্লস এলিয়ট, লর্ড ল্যান্সডাউন, স্যর ডোনাল্ড ম্যাকেঞ্জী, ওয়ালেস, কর্ণেল এড্রা প্রভৃতি অত্যুচ্চ পদস্থ রাজপুরুষ, পরন্তু প্রোফেসর ভ্যামবেরী, উইলসন, উডমেসন, ডাক্তার হাণ্টার, হল, মেরিডিথ টাউনসেণ্ড, রুটলে, স্যর হাওয়ার্ড রশেল, ডাক্তার উইলিয়ম রাটিগা হিউম, গ্রিফিন, বেল প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিত, লেখক ও রাজনৈতিক, পুনশ্চ এদেশীয় গণ্য মান্য ও পদস্থ বহুব্যক্তির সহিত তাঁহার পত্র চালাচালি হইত। উপরোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনেকেরই সহিত শম্ভুচন্দ্র যে বন্ধুত্বের ঘনিষ্টতা সূত্রে বদ্ধ ছিলেন, তাহা উভয় পক্ষের চিঠি পত্র দেখিয়া বুঝা যায়।

লর্ড ডাফারিণ প্রভৃতি অত্যুচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; রাজনৈতিক কারণে কতকগুলি অপ্রকাশ রাখিতে হইয়াছে। আশা করা যায়, উপযুক্ত সময়ে সে গুলিও সাধারণের চক্ষুগোচর হইবে।

এই পত্রাবলীতে সহযোগী রাজনীতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় ও মনোজ্ঞ কথা আছে। কিন্তু, আলোচনার স্থানাভাব। তথাচ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য মত ও ধর্ম্ম নীতি সম্বন্ধে দুই এক কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহার করা যাউক।

মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-প্রিয়তা অতীব প্রখর,—স্মৃতির আপাদমস্তক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতায় পূর্ণ ছিল। তিনি কবিতার উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। বায়রণ তাঁহার বড় ভাল লাগিত। অনেক সময় অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া চাইল্ড হ্যারোল্ড পড়িতে বসিতেন। তিনি সেক্সপীয়রকে কালিদাস অপেক্ষা এবং একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও পরে করিবেন, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতেন।

"উৎকৃষ্ট ও উচ্চ সাহিত্য, সর্ব্বত্রই, অতি অল্প লোকে বুঝে। কবিতা তাহা অপেক্ষাও কম লোকে বুঝে"—ইহা, (আরও অনেকের ন্যায়) শম্ভুচন্দ্রের অভিমত ছিল। তিনি অত্রস্থ সম্পাদকদিগের সাহিত্য জ্ঞানে ও সমালোচনা-শক্তিতে আদৌ বিশ্বাসবান ছিলেন না।

ব্যাকরণ বিরুদ্ধ পদ যেমন কবি কালিদাসের কর্ণ যাতনা উৎপাদন করিত, রচনায় তেমনি কিঞ্চিন্মাত্রও অসংলগ্ন শব্দ-প্রয়োগ তেমনি শম্ভুচন্দ্রের কর্ণে বাজিত। তিনি, সুবিধা পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার উল্লেখ ও সংশোধন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যানুভূতি তাঁহাকে এসম্বন্ধে এমনি অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আভিজাত্যে উদাসীন ছিলেন না। "ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণ" বলিয়া তিনি সবংশের গৌরব করিতেন। তিনি বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু স্কোবল আইনের সম্যক সমর্থন করিয়া হিন্দু ও অ-হিন্দু বাবুদের বিষম বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ উভয় কার্য্যের একটীও অব্রাহ্মণোচিত নয়। তিনি সার্ব্বজাতিক জাহাজে আরোহী হইতে অসম্মত হইয়াছিলেন, ইহাও ব্রাহ্মণোচিত। কিন্তু তাঁহার কোনও পত্রাংশে দেখি;—

"His (রবার্ট নাইট) was the only European table at which I have sat with the Family as one of them. Friendship got better of my Brahmanic Prudence."

এস্থলে বন্ধুত্ব ব্রাহ্মণত্বকে জয় করিত; তাহা নিজেই বলিয়াছেন।

কিন্তু, য়ুরোপীয় সমাজে সর্ব্বদা মিশিতেও

মুখোপাধ্যায় পছন্দ করিতেন না। লর্ড ডফ্‌রিণের প্রাইভেট সেক্রেটারী সার ম্যাকেঞ্জি ওয়ালেসের বহু পত্রের একখানিতে দেখি;—

"প্রিয় ডক্টর মুখার্জি, য়ুরোপীয়দের সঙ্গে মিশিতে আপনার স্বাতন্ত্র্য এবং উদাসীন্যের বিষয় আমি বেশ বুঝি। কিন্তু, এখন, যখন আপনি খোলা খোলের ভিতর হইতে কতকটা বাহির হইয়াছেন, তখন আমি আশা করি, পুনরায় তাহার মধ্যে গুটি গুটি গুটাইয়া গিয়া প্রবেশ করিবেন না। এদেশীয়দের সঙ্গে যোগ গ্রন্থি স্বরূপ, আপনার মত লোক আমাদের একান্তই আবশ্যক। আমি বিশ্বাস করি, আপনার প্রকৃত মনুষ্যোচিত স্বাধীনতা আপনার স্বদেশবাসীদের উপর কার্য্য করা হইতে কখনই বিপন্ন হইবে না। যেরূপই হউক, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে (আমি অধিবাসী য়ুরোপীয় হইলেও) আপনার জনৈক বন্ধু স্বরূপ স্মরণ রাখিবেন।'

শম্ভু বাবুর উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় পত্রপ্রেরকদিগের অনেকেরই পত্রের এইরূপ ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্ব-বিনম্র সুর। কোন কোন স্থলে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ঘনিষ্ঠ। যেমন স্যর অকল্যাণ্ড কলভিন প্রভৃতির পত্র। রুটলে, নাইট প্রভৃতির পত্র অভিন্নহৃদয় ভ্রাতৃবৎ। হিউমের পত্র সরলতা ও সম্মানে পূর্ণ। লর্ড ডফারিণের পত্রগুলি সুদীর্ঘ ও সৌহৃদ্যময়। শম্ভু বাবুর প্রতি এবম্বিধ ব্যক্তিদিগের শ্রদ্ধা ও সখ্যতা দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হয়।

সনেট সম্বন্ধে শম্ভুবাবু লিখেন—"সনেট" রচনা কেবল কঠিন নয়, অতি কোমল কার্য্য। অনুবাদ সম্বন্ধে লিখেন,—সাহিত্য এক ভাষা হইতে অপর ভাষায় উঠাইয়া লইয়া যাইবার পথেই তাহার সত্তা ও আধ্যাত্মিকতা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। আসল কথা এই যে, অনুবাদ আদৌ অসম্ভব। উহা সাহিত্যকে হত্যা করা।"

কোন একটী পত্রাংশে এইরূপ আত্মপ্রকাশ দেখা যায়,—

"আমার পাঠ্যাবস্থায় এবং তাহার পর আরও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আমি সাম্যবাদী ও অত্যুন্নতশীল ডেমোক্রেটিক মতাবলম্বী ছিলাম। কিন্তু, পরে সে ভাবটা সারিয়া গিয়াছিল। আমার বোধ হয়, এখনি আমি প্রকৃতির অজ্ঞানানুমোদিত পার্থক্য প্রণিধান করিয়া সকল বিষয়ের অধিকতর যথার্থ মর্ম্ম নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু, তাই বলিয়া এমন মনে করিয়া পলায়ন করিবেন না যে, আমি আমার আভিজাত্যাদির জন্য অপরিমিত অহঙ্কারী বা অন্য জাতিকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। অনুদারতা কাহাকে বলে, আমি জানি না। আমি কোনও কিছুতেই অনুদার নহি। আমি সদাই সকল বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে রত এবং ন্যায় ও সুবিচারের সমর্থক। উহারা আমার দেবতা স্বরূপ। আমি জানি, আমার ব্যবহৃত ভাষা বড় প্রবঞ্চনা করে। আমি ভৎসনা করি ও বিদ্রূপ করি। অত্যন্ত সজীব ও উদ্দীপ্ত কল্পনার ক্রিয়া বোধ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, আমি কখনও কাহাকেও অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করি না। আমি আমার বিবেক বুদ্ধির নিকট হইতে, অন্যের প্রতি সুবিচার ও ন্যায্য ব্যবহার অতি কঠিনরূপে নিষ্কাশন করি। আমি আমাকে শিক্ষিত করিয়াছি যে, কোন ব্যক্তিকে বা কোন বস্তুকেই কিছুতেই অবজ্ঞা না করি। সকল পদার্থেরই উপযোগিতা দেখা আমার আসক্তি। আমার যুক্তি এইরূপ, যখন সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং প্রাণীর বা পদার্থ মাত্রের অস্তিত্ব আদেশ ও অনুমোদন করেন, তখন, আমি একান্ত দুর্ব্বল প্রাণী কে যে, তাহা করিব না? অবশ্য এ যুক্তিতে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় না বটে, কিন্তু, তথাচ অহঙ্কার ও আত্মাভিমান দমন করিয়া আমাদিগকে স্ব স্ব স্বরূপ অবস্থায় নত করিয়া আনিতে ও প্রত্যেক পদার্থের উপযুক্ততায় আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে উপরোক্ত চিন্তা অতীব উপকারী। ক্রোধের সহিত চিত্তের আভ্যন্তরিক সংঘর্ষকালে, ঐ চিন্তা আমার বিশিষ্ট উপকারে আসিয়াছে এবং যাঁহারা আমার পরামর্শ অন্বেষণ ও আন্তরিকতার সহিত তাহা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সকলকেই উহা গ্রহণ করিতে আমি অনুরোধ করি। হে, প্রিয় ব্রাহ্মণ যুবক, ইহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান মন্ত্র, আমি ভরদ্বাজ সন্তান আর্য্যাবর্ত্তের এই ভাগীরথী তীর হইতে, তোমাকে প্রেরণ করিতে পারি না।"

ফলতঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বৃহৎ ক্ষুদ্র সকল বিষয়ই দার্শনিক ও দূর দৃষ্টিতে দেখিতেন। নৈকট্যের নীচ স্বার্থে অভিভূত হইতেন না।

দুই এক স্থল ব্যতীত পত্রাবলীর সম্পাদন উত্তম হইয়াছে। শম্ভুচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা ও অবশিষ্ট পত্রাবলী প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণব দর্শন।* (১)

অথবা অনাত্ম আত্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ।

১। আত্মা সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র ও অদ্বিতীয়। আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। এই প্রকট লীলাস্থলে এই আত্মা, স্বকীয় প্রতিবিম্বে ও স্বকীয় স্বরূপে দুই প্রকারে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রতিবিম্বে প্রবুদ্ধাবস্থাও ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টিভূত ভেদে দ্বিবিধ। জীব ব্যষ্টিভূত, ও ঈশ্বর সমষ্টিভূত, প্রতিবিম্বে প্রবুদ্ধ। স্বরূপে প্রবুদ্ধাবস্থাও তাদৃশ ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টিভূত ভেদে দ্বিবিধ। ব্যষ্টিভূত স্বরূপে প্রবুদ্ধকে আত্মতত্ত্ব-সম্পন্ন এবং সমষ্টিভূত স্বরূপে প্রবুদ্ধকে পরমাত্ম-তত্ত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি বা সাধু অভিধান প্রদত্ত হইয়া থাকে। কি প্রকট কি অপ্রকট, সর্ব্বাবস্থায় এই আত্মা সবিষয় অর্থাৎ বিষয়-বিজড়িত। নিত্যধামের অপ্রকট অবস্থায় আত্মার এই উভয়াঙ্গ অভিন্নাত্মক ও সমন্বয় প্রাপ্ত অর্থাৎ উভয়াঙ্গই তদেকাত্ম ও একাকার হইয়া অদ্বৈতভাবে সমাধিস্থ বা নিত্যলীলাভিভূত; কিন্তু লীলাস্থলের প্রকট অবস্থায় এই আত্মা ব্যবহারিকভাবে নানারূপে দ্বিরূপ ধারণ করিয়া কোথায় বা প্রতিবিম্বিত অধ্যাস-গত এবং কোথায় বা স্বরূপাবস্থিত হইয়া পরম নিরঞ্জন প্রেমলীলানুগত। আত্মা যখন নিত্যধামের অপ্রকট অবস্থায় অনির্ভিন্ন ও অদ্বৈতভাবে সমাধি-লীলাভিভূত, তখন তাঁহাকে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। অপ্রকট পরমাত্মলীলাই নিত্যলীলা বা নিত্যধামের সমাধি লীলা। আত্মা যখন এই প্রকট লীলাধামে ব্যক্তিপুঞ্জের সমষ্টিভূত প্রতিবিম্বে ব্যবহারিকভাবে প্রতিবোধিত ও আত্ম-বুদ্ধি-সমন্বিত হইয়া বিরাট লীলানুগত তখন তাঁহাকে 'ঈশ্বর' উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই সমষ্টিভূত সৃষ্টি-লীলাই প্রকট ঐশ্বরিক লীলা। ব্যষ্টিভূত জৈবিকলীলা এই লীলার অন্তর্গত। আত্মা যখন এই প্রকট লীলাধামে পরমাত্মতত্ত্ব সম্পন্ন্য সচৈতন্য ব্যক্তিপুঞ্জের সমষ্টিভূত স্বরূপশায়ী হইয়া ব্যবহারিকভাবে পরম নিরঞ্জন মহাভাবময় প্রেমলীলানুগত, তখন তাহাকে 'প্রকট পরব্রহ্ম' বা পরম নিরঞ্জন পুরুষ' অভিধানে অভিহিত করা যাইতে পারে। পরমাত্মতত্ত্ব-সম্পন্ন সাধুর ব্যক্তিভূত নরলীলা এই লীলার অন্তর্গত বিকাশ।

২। একমাত্র এই প্রকট লীলাস্থলেই আত্মার অন্তর্নিহিত বিষয় ও বিষয়ীর স্বরূপগত ঐক্য লৌকিকভাবে ভঙ্গ হইয়া তাহাদের সাক্ষাৎ মিলন ঘটিয়া থাকে। এইরূপ ব্যব-

* এই প্রবন্ধ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার তত্ত্ববিদ্যা সভার অধিবেশনে পঠিত হয়। বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল অধ্যাপক বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির আসনে অধ্যাসীন ছিলেন।

হাবিক মিলন সংঘটন ব্যতীত এই আত্মার কোন স্থলেই কোনরূপ জ্ঞানোৎপত্তির কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞেয় বিষয়ের অসদ্ভাবে, অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলে, জ্ঞাতা বিষয়ী কুত্রাপি কখনও স্বয়ং জ্ঞান সম্পন্ন বা স্বকীয় জ্ঞানে স্বতঃ প্রকাশ হইতে পারে না। জ্যোতিঃ পদার্থের অবলম্বন চাই এবং ধারণ ও বিকীর্ণ করিবার সামগ্রী চাই, নতুবা তাহা কুত্রাপি কখনও জ্যোতিঃ পদার্থরূপে অভিব্যক্তি-লাভে সমর্থ হয় না। আবার ইহাও প্রসিদ্ধ, সেই বিষয়গত নৈর্ম্মল্যের তারতম্যই সেই জ্যোতিঃ পদার্থের ঔজ্জ্বল্য-বিকাশের তারতম্যের কারণ হইয়া থাকে। সেইরূপ বিষয়ীভূত নৈর্ম্মল্যের তারতম্যানুসারে নিত্য-অব্যক্ত, নিত্য-নির্গুণ, নিত্য নির্ব্বিকার বিষয়ীকে রূপান্তরিত বা ভাবান্তরিত বলিয়া অনুভূত হয়। বস্তুতঃ বিষয়ীতে কোন প্রকার বিকার, বিকাশ, রূপান্তর বা ভাবান্তর নাই। আমরা এখন ব্যবহারিকভাবে, তাহাতে যে বিকার বিকাশ প্রভৃতি উপলব্ধি করি, তাহা আশ্রয়ীভূত ও অভিজ্ঞেয় বিষয়ানুগত—স্বরূপগত বিষয়ীগত নহে, বিষয়-সম্বন্ধ হেতু, বিষয়ী এখন প্রতিবিম্বে এবং স্থলবিশেষে স্বরূপে প্রবোধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিষয় সম্বন্ধ-বিমুক্ত বিষয়ী শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে কল্পিত হইয়া থাকে। অভিজ্ঞেয় বা জ্ঞানভূত বিষয়কে এখন আমরা শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত করিতে পারি। ১ম বহির্ব্বিষয়, ২য় আত্মস্থ বিষয়, ৩য় পরমাত্মস্থ বিষয়। জ্ঞানের উল্লেখ হইলেই সর্ব্বত্র এই ত্রিবিধ বিষয়-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কোন একটী বিষয়ের জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞানের উল্লেখ হইলেই আরও জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, বিষয় ও বিষয়ীর, ইদং পদবাচ্য ও অহংপদবাচ্যের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেখানে কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পিত হয়, সেখানে তাহার একদিকে বিষয় বা ইদং পদবাচ্য এবং তাহার অপর দিকে বিষয়ী বা অহংপদ বাচ্য আছে। প্রাগুক্ত ত্রিবিধ বিষয়ানুসারে জ্ঞানের তিনটী প্রকোষ্ঠ এখানে কল্পিত করিয়া লওয়া যাইতেছে। প্রথমটীকে অনাত্ম প্রকোষ্ঠ বলিলাম; জ্ঞানের এ প্রকোষ্ঠে অনাত্ম বা বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। দ্বিতীয়টী আত্ম প্রকোষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইল; জ্ঞানের এ প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর আত্ম স্বরূপের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তৃতীয়টীকে পরমাত্ম-প্রকোষ্ঠ অভিধানে উল্লিখিত করা গেল; জ্ঞানের এ প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর পরমাত্ম স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয়। তুমি ঘোর অদ্বৈতবাদীই হও, আর ঘোর দ্বৈতবাদীই হও, আর দ্বৈতাদ্বৈত-বাদীই হও,—তোমার দার্শনিক মত যে কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক না, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তুমি এই বিষয়কে বিষয়ীর সহিত অভিন্ন জ্ঞানে সেই বিষয়ীর মধ্যে তাহাকে সংস্থাপিত কর, কিম্বা তাহাকে স্বতন্ত্র জ্ঞানে বিষয়ীর বহির্দ্দেশে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেও, কিম্বা অপর যাহা কিছু নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা কর, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। তোমার জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠেই হউক, আর আত্ম প্রকোষ্ঠেই হউক, আর পরমাত্ম প্রকোষ্ঠেই হউক, সর্ব্বত্রই এই জ্ঞানের এক দিকে বিষয় আছে, এবং তাহার অপরদিকে বিষয়ী আছে, নচেৎ এই জ্ঞানের কোন অর্থই কুত্রাপি কখনও পাওয়া যায় না। নদী বলিলে যেমন সকলে ইহাই বুঝেন যে, তাহার দুই দিকে দুই তীর-ভূমি আছে এবং সেই দুই তীর-ভূমিকে স্পর্শ করিয়া একটী জলস্রোত প্রবাহিত;

'জ্ঞান' বলিলেই লোকে ঠিক এই ত্রিত্যবাদই বুঝিয়া থাকেন। 'জ্ঞান' কিন্তু এই অনাত্ম প্রকোষ্ঠে, সদা সর্ব্বদা জ্ঞাতা বিষয়ীকে তাদৃশ গ্রাহ্য মধ্যে গণনা করে না। সে অনুক্ষণ জ্ঞাতা বিষয়ীকে দূরস্থ রাখিয়া জ্ঞেয় বিষয়াকারগত হইয়া উদয় হইতে থাকে। অন্য ভাবে, অন্যরূপে তাহার প্রকাশ হয় না। এ প্রকোষ্ঠে তাহার স্বতন্ত্র স্বরূপ-গত প্রকাশ সম্ভাবিত নহে। এক্ষণে এই প্রকোষ্ঠত্রয়ে যে যে জাতীয় জ্ঞানের যেস্থলে যেরূপে স্ফূরণ হইয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ হইতেছে।

৩। জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে, বহির্ব্বিষয়ের সঙ্গে স্বকীয় প্রতিবিম্বে প্রবোধ-প্রবণ বিষয়ীর প্রথম সাক্ষাৎ মিলন ও তদাকার প্রাপ্তি হেতু প্রথম ব্যবহারিক প্রবোধ স্ফূর্ত্তি ও জ্ঞানোৎপত্তি হয়। এইরূপ বিবিধ জাগ্রত বা প্রতিবোধিত বিষয় সঙ্গ-হেতু ক্রমাগত জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইতে হইতে বিষয়ীর প্রতিবিম্বিত স্বরূপে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রামে বা দেহ মনাদি ইন্দ্রিয় রাজ্যে আত্ম-বুদ্ধি ও তদ্ভিন্ন যাবতীয় বহিঃপদার্থে অনাত্মবুদ্ধি, এবং বহির্ব্বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-পুত্রাদি যে সকল পদার্থে তাহার সেই দেহ মনাদির সুখ, স্বচ্ছন্দ, প্রয়োজন বা তৃপ্তি অনুভব হয়, তাহাদের প্রতি আত্মীয় বুদ্ধি ও তদ্ভিন্ন যাবতীয় বিষয় ব্যাপারে পর বা অনাত্মীয় বুদ্ধির সংস্কার উদয় হইয়া থাকে। এখানে সেই অদ্বিতীয় পরমবস্তু প্রপঞ্চ দেহ মধ্যে প্রপঞ্চ বদ্ধ স্বকীয় ব্যষ্টি প্রতিবিম্বিত ইন্দ্রিয় গ্রামে বহির্ব্বিষয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হেতু অনাত্ম ঈশ্বর অধ্যাসে দাঁড়াইয়া ব্যবহারিক ভাবে প্রথম প্রবুদ্ধ হইলেন। এইরূপ বিষয়কে আমরা ইংরাজি ভাষায় phenomenal object (প্রতিবিম্বিত বিষয়) নামে নাম-করণ করিয়া রাখিলাম। এই জাতীয় নামরূপ বিশিষ্ট বিষয়কেও তৎসংজাত প্রবোধ ও জ্ঞানের সারত্বানুসারে বহুতর শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত শ্রেণী বিভাগ বিবৃত করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

৪। জ্ঞানের আত্ম প্রকোষ্ঠে, আত্মতত্ত্বসম্পন্ন সদ্‌গুরু বা সাধুরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ মিলন ও সময়ে তৎ-অন্তরঙ্গে পরিণতি বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি-হেতু স্বরাট আত্ম স্বরূপে প্রবোধিত হইয়া তাহার এই অভিনব জ্ঞানোৎপত্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই মিলন হইতে বিষয়ী পূর্ব্বকার প্রতিবিম্বিত অহং অধ্যাসে প্রবোধিত পূর্ব্বকার ইন্দ্রিয়-গ্রামে জাগরিত, পুরাতন অসৎ অসার ব্যবহারিক আত্ম বুদ্ধি সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয় স্বরাট সচ্চিদানন্দময় শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপে আত্মবুদ্ধি এবং সদ্‌গুরু সাধু সজ্জন ভগবজ্জন সমূহে আত্মীয় বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে ইন্দ্রিয় গ্রামে ও অহং অধ্যাসে বিষয়ীর অনাত্ম বুদ্ধি স্ফূরিত হয়, তাহার মোহবন্ধন,দেহ-বন্ধন,সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তক্রমুক্ত নবনীর ন্যায় সে দেহ মনাদি ইন্দ্রিয় রাজ্যে প্রমুক্ত ও স্বতন্ত্র ভাবে বিচরণ করে। সাংসারিক বিষয় ব্যাপারে তাহার ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি তিরোহিত হয় এবং লৌকিক সম্বন্ধে শত্রু মিত্র বুদ্ধি থাকে না। এখানে সেই অদ্বিতীয় পরমাত্ম বস্তু প্রপঞ্চ দেহ মধ্যে থাকিয়াও আত্মতত্ত্ব-সম্পন্ন অভিনব জ্যোতিষ্মান বিষয়ের সাক্ষাৎকার ও তৎসহ সহজ আনুগত্য সম্বন্ধ হেতু তৎ-অন্তরঙ্গ স্বরূপে পরিণত হইয়া স্বকীয় প্রপঞ্চমুক্ত স্বরাট স্বরূপে প্রকৃত অন্তঃপ্রজ্ঞ বা অন্তর্শ্চেতা হইলেন।

জ্ঞানের আত্মপ্রকোষ্ঠের এই বিষয়কে আমরা ইংরাজীতে Noumenal object (আত্মবস্তু) নামে অভিহিত করিতে পারি।

৫। জ্ঞানের পরমাত্ম প্রকোষ্ঠে পরমাত্ম-তত্ত্ব-সম্পন্ন সদ্‌গুরু বা সাধুরূপ নিরঞ্জন বিষয়ের সঙ্গে, বিষয়ীর তৃতীয় সাক্ষাৎ মিলন ও যথা সময়ে তৎপারমাত্মিক স্বরূপে পরিণতি বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি-হেতু স্বকীয় অখণ্ড পারমাত্মিক বিরাট স্বরূপে প্রতিবোধিত হইয়া তাহার নবীনতর জ্ঞানোৎপত্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সুদুর্ল্লভ মিলন হইতে বিষয়ী স্বকীয় ব্যষ্টিপাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত চরাচরব্যাপ্ত পরিপূর্ণ বিরাট স্বরূপে তাহার পরমাত্ম বুদ্ধি এবং আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত যাবতীয় পরকীয় স্বরূপে পরমাত্মবুদ্ধির স্ফুরণ হইয়া থাকে। এখানে পরমাত্ম ও পরমাত্মীয় বুদ্ধি এক মহাভাবের মধ্যে মিশিয়া একাকার হইয়া গেল। এখানে সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় পরমবস্তু প্রপঞ্চ দেহমধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও অভিনব পরমাত্ম-তত্ত্ব সম্পন্ন পরম নিরঞ্জন ও জ্যোতিষ্মান বিষয়ের সাক্ষাৎকার ও তৎসহ সহজ আনুগত্য সম্বন্ধ হেতু তদেকাত্ম হইয়া, অখণ্ড বিরাটভাবে প্রকৃত বহিপ্রজ্ঞ বা বহিশ্চেতা হইলেন এবং অভিনব নিরঞ্জন ইন্দ্রিয় দ্বারে বাহ্যজগৎকে স্বরূপে সন্দর্শন করিলেন। এখানে সেই সমাধি সমুদ্রশায়ী নিত্যবস্তু অন্তর্ব্বাহে প্রকৃত উভয়তঃ-প্রজ্ঞ,—জীবের জাগ্রত স্বপ্ন-সুষুপ্তি তিন অবস্থায় সচেতন হইলেন এবং মহাভাবময় পরম নিরঞ্জনলীলার সূত্রপাত করিলেন। জ্ঞানের পরমাত্ম-প্রকোষ্ঠের এই বিষয়কে আমরা ইংরাজিতে Transcendental বা Absolute object (পরমাত্মবস্তু) নামে উল্লেখ করিলাম। ইহা আমাদের মনঃকল্পিত নাম। কেহ যেন ইংরাজি বা জর্ম্মন দর্শনের কোন নামের সঙ্গে ইহাদিগকে মিলাইয়া ভিন্নার্থে উপনীত হইবেন না।

৬। বক্ষ্যমান বিষয়ী সর্ব্বত্রই একই। তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আশ্রয়ীভূত বিষয় স্বরূপের অবস্থাভেদে, জ্ঞেয় বিষয় স্বরূপের প্রবোধগত তারতম্য বা সারত্বভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান প্রযুক্ত কোথাও প্রযোজ্য হইয়া থাকিলেও সে সমস্ত ভেদাত্মক ভাব মানুষের মনঃকল্পিত ব্যবহারিক সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। বক্ষ্যমান বিষয়ীর ব্যক্তিগত পরিচয়ের (Personal identityর) অভিন্নতা সর্ব্বাবস্থায় অক্ষতভাবে স্মৃতিগত, সংস্কারগত ব্যবহারিক জ্ঞানগত থাকিয়া তাহার এই একত্বের প্রমাণ স্থল হইয়া আছে। ব্রহ্মাত্মা,ভগবতাত্মা সাধু সজ্জন সকল দৃষ্টান্ত স্বরূপে প্রদর্শিত হইতে পারে।

৭। এখানে এককথা স্মৃতি পথবর্ত্তী রাখা কর্ত্তব্য, যে বিষয়ী তৎস্বরূপগত বিষয়াংশের অপরিহার্য্য অভিব্যক্তি বা পরিণামপ্রবণতাতে সেই বিষয়াংশ হইতে স্বতন্ত্র শুদ্ধ চিন্মাত্র বা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তপুরুষ মাত্র নিত্য নির্ব্বিকার, নিত্য অপ্রকট, নিত্য অব্যক্ত, নিত্য অপরিণামীরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, বিষয়ীতে কোন পরিবর্ত্তন, স্ফূর্ত্তি, বিকার, পরিণাম, প্রকারান্তর বা অভিব্যক্তির কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। আশ্রয়ীভূত অথবা অভিজ্ঞেয় বিষয়াংশের পরিবর্ত্তনাদি তাহাতে প্রতিফলিত, আরোপিত ও পরিকল্পিত হয় মাত্র। বক্ষ্যমান প্রস্তাবে যদি বিষয়ীর কোন বিকাশ বা স্ফূর্ত্তির কোন উল্লেখ থাকে, তাহা তাহার আশ্রয়ীভূত অথবা অভিজ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপগত, বিষয়ীগত নহে, ইহা বুঝিতে হইবে।

যাদৃশ "কাচ কাঞ্চন সংসর্গাৎ ধর্ত্তে মারকত দ্যুতিং", সেইরূপ সবিষয় বলিয়া বিষয়ীতে বিষয়-সুলভ বিকাশাদির আরোপ হয় মাত্র।

৮। বক্ষ্যমান বিষয়ীর কোন বিষয় বিশেষের সঙ্গে তদাকারত্ব বা তদেকত্ব প্রাপ্তিকালে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহা শুষ্ক জ্ঞানাঙ্গে বা জ্ঞেয় বিষয়াঙ্গে অপরিণতভাবে বদ্ধ থাকে না। তৎক্ষণাৎ সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানভূত বা জ্ঞেয় বিষয়ের প্রতি তাহার অনুরাগ বা বিরাগ, প্রীতি বা অপ্রীতি, ভক্তি বা অভক্তি প্রভৃতি ভাবোদয় হইয়া তৎসঙ্গপ্রাপ্তীচ্ছা বা পরিহার-সংকল্প তাহার অন্তরে উদিত হয় এবং তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত করে। দৈবক্রমে বা সুকৃতি ফলে সেই জ্ঞেয় বিষয় যদি শুদ্ধসত্ব বা আত্মতত্ব বা পরমাত্ম তত্ব সম্পন্ন বিষয় হয় এবং বিষয়ীর পরম সৌভাগ্য বা সুকৃতি বশতঃ যদি তৎপ্রতি তাহার সহজ স্বতঃসিদ্ধ আসক্তি, অনুরাগ, ভক্তি প্রীতি ভাবের সঞ্চার হইয়া তাহার আনুগত্য যথাবিধানে অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে সময়ে তাহার অবলম্বনীয় অভিজ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপত্ব বা তদেকত্ব লাভ হইয়া তৎসংসর্গে শ্রেয়ঃ লাভ হইতে থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্ঞেয় বিষয় স্বরূপের সারত্ব সর্ব্বত্রই জ্ঞাতা বিষয়ীর জ্ঞান, প্রবোধ ও স্বরূপের সারত্ব ও ঔৎকর্ষ উৎপাদন করে। এ সংসারে এইরূপ তদাকারত্ব, তদেকত্ব বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্তিহেতু বিষয়ীর সর্ব্বদা সদসদ্‌গতি প্রতিলব্ধ হইতেছে। "সংসর্গ যা দোষা গুণা ভবন্তিঃ।" সংসর্গের দোষ গুণ চিরদিন বিষয়ীতে বর্ত্তিতেছে, এরূপ প্রবাদ চিরপ্রসিদ্ধ আছে।

৯। পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, জ্ঞানের অধ্যাত্ম প্রকোষ্ঠে বহির্ব্বিষয়ের সঙ্গে তদেক হইয়া—তদাকারে আকারিত হইয়া বিষয়ীর সেই বিষয় জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। শুদ্ধ এই জ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই বহির্ব্বিষয়ের নিকট বিষয়ী কেবল ঋণী নহে। তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তিও এই বিষয় রাজ্য হইতেই চিরদিন সম্পাদিত হইতেছে। নিত্যধামের অপরিণামী পরমাত্ম বিষয়ীর সমগ্র বিষয়াংশ, তৎসাহিত্য বশতঃ নিত্য পরিণাম-নিষ্ঠ। "ন পরিণম্য ক্ষণমধ্যাপি তিষ্ঠতে।" এই অনতিক্রমণীয় পরিণাম নিষ্ঠতা দ্বিবিধরূপে স্ফূর্ত্তি পায়। সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ ও বিসদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ। এই বিসদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠাংশ কি সৃষ্টি বিকাশের প্রাক্কালে কি তাহার প্রলয়াবসানে সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ বিষয়াঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া অভিন্নদেহে অব্যক্তরূপে নিহিত থাকে। তখন সমগ্র বিষয়াংশ, একাধারে—একাকারে সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ হইয়া বিষয়ীর অঙ্গে তদেকাত্ম ভাবে নিরুপাধি অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় পরমাত্ম অবস্থাতে বিলীন থাকিয়া অনুক্ষণ স্বকেন্দ্রে স্বভাবে স্বরূপে স্বগতনিষ্ঠ আন্দোলনে আন্দোলিত হইতে থাকে। এই অবিশ্রান্ত বিমন্থন হেতু সেই নিখিল বিষয়াংশের অন্তনিহিত ও স্বরূপগত বিসদৃশ-পরিণাম-প্রবণাংশ সেই সদৃশ পরিণামী বিষয়াংশ সঙ্গে তদেকাঙ্গ বা অভিন্ন কলেবর হইয়া সেই মৌলিক সদৃশ পরিণামে নিত্যকাল সুস্থির ও প্রশান্ত ভাবে থাকিতে স্বতঃই অশক্ত হয়। যদি এই নিখিল বিষয়াংশ নিয়তকাল মৌলিক সদৃশ পরিণামে তন্নিষ্ঠ হইয়া স্বকেন্দ্রে স্বরূপে সর্ব্বাঙ্গে সুস্থির প্রশান্ত ও অচ্যুত থাকিতে পারিত, তাহা হইলে সৃষ্টি বা জৈবিক, ঐশ্বরিক বা পারমাত্মিক কোন প্রকার লীলা বিকাশের কিছুমাত্র সম্ভাবনাই থাকিত না। কিন্তু বিষয়ীর সাহিত্যে

বশতঃ সেই বিসদৃশ-পরিণাম-প্রবণাংশে ভিন্ন জাতীয় অভিব্যক্তি-প্রবণ হইয়া যথা সময়ে কেন্দ্র-বিমুখ বিশদৃশ চাঞ্চল্যভাব প্রাপ্ত হইতে এবং বিজাতীয় মলিন সামগ্রীরূপে পরিণত হইতে আরম্ভ করে। মৌলিক বিষয়াঙ্গের নির্ম্মল দেহ হইতে এইরূপে মায়াংশ অগ্নি-সন্তপ্ত শর্করারসজাত মল নির্গমের ন্যায় স্বকীয় মালিন্য হেতু ব্যবহারিকভাবে ক্রমশঃ স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়া দাঁড়াইল। সেই ত্রিগুণাতীত নির্ম্মল মৌলিক বিষয়াঙ্গ এইরূপে বিসদৃশ পরিণামপ্রাপ্ত বিকৃত অংশকে স্বদেহ হইতে বিবর্জ্জন না করিলে—অর্থাৎ এইরূপে বিজাতীয় সামগ্রীপ্রসূ না হইলে, এই মায়াংশে কল্পিত ছায়াদেহ বিশ্বসংসারে কোন প্রকার অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারিত না। আমাদের জ্ঞানে কোন পদার্থ সম্বন্ধে বিকাশ, বিকার, প্রকট, অভিব্যক্তি, স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি অভিধানের কোন অর্থোদয়ই হইতে পারে না, যদি তাহার মূলে বিদেহ, অব্যক্ত, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধি বৈজিক অবস্থা তাহার অন্তরালবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত না থাকে। জগতের সৃষ্টির অভিব্যক্তি বলিলেই, সেই অভিব্যক্তির মূলদেশে বৈজিক অব্যক্ত প্রভৃতি ভাবের সদ্ভাব অপরিহার্য্যরূপে চিন্তনীয় থাকিবেই থাকিবে। এই বিষয়াংশ যখন সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ থাকিয়া তদেকাত্ম বিষয়ীর পরমাত্ম-অঙ্গে প্রতিনিয়ত লীলা-বিহার করিতে ও স্বরূপে ও স্বকেন্দ্রে আলোড়িত হইতে থাকে, তখন সেই বিষয়াংশকে আনন্দাত্মিকা অব্যক্তা, মূলা বা পরাপ্রকৃতি বলে এবং তদঙ্গশায়ী বিষয়ীকে চিদাত্মক অব্যক্ত পরাৎপর পুরুষ বলে। পূজ্যপাদ ভগবান কপিলদেব এই মূলা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জ্ঞানে চিদাত্মক পুরুষকে শুদ্ধ চিন্মাত্র বা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তাত্মারূপে এবং মূলা অব্যক্তা প্রকৃতিকে কেবল মাত্র সৃষ্টির মৌলিক উপাদান উপকরণ স্বরূপ চতুর্ব্বিংশতিতম স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণায় প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ মৌলিক অংশের কোন এক বিশেষ দেশে নিত্যত্ব ও নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা হয় নাই। তাঁহার ধারণায় প্রকৃতির সমগ্র সদৃশ পরিণামনিষ্ঠাংশ পুংসান্নিধ্য নিবন্ধন বিসদৃশ পরিণামনিষ্ঠ আকারে পরিণত হইয়া সৃষ্টির বৈজিক উপকরণে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, এবং মূলাধারে মূলা প্রকৃতির স্থান হয় শূন্য পড়িয়া থাকে, নতুবা সৃষ্টির সেই বৈজিক উপকরণে পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতির যে অংশ নিত্য সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ থাকিয়া সৃষ্টির নিত্য অতীত রহিল—যে অংশ সৃষ্টির মূলাধারে অব্যক্ত বিদেহ বীজরূপে পরমাত্ম-অঙ্গে তদেকাত্ম হইয়া সমাধিস্থ থাকিয়া ক্রমোন্মুখ পুষ্টিবীজের অন্তর্ভূত প্রাণ-রূপে অব্যাহত ও অধিকৃত রহিল, পূজ্যপাদ মহর্ষির ধ্যানক্ষেত্রে এই "সূক্ষ্মাতীত নিরতিশয় সূক্ষ্মতত্ত্ব" উদয় হয় নাই। মূলাধারের অন্যথা করিয়া সৃষ্টির ক্রমবিকাশের অনুসরণ করাতে তিনি নিত্য সমাধিস্থ পরব্রহ্ম সত্তার স্থল দেখিতে পান নাই, অবিভাজ্য আত্মাকে অসংখ্য অনন্ত খণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার সাংখ্যসূত্রানুসারে সৃষ্টির মূল উপকরণ স্বরূপ এই প্রকৃতি সঙ্গ হইতে নির্লিপ্ত হইয়া, শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে অবস্থানই পুরুষের অসঙ্গ মুক্তিলাভ। তাঁহার মতে প্রকৃতি সান্নিধ্যই আত্মার সমস্ত বদ্ধতার নিদান। প্রকৃতি যে তাহার সারাংশে সদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ অবস্থায় তদেকাত্মভাবে পুরুষের নিত্য সাহিত্য অভঙ্গ রাখিয়া জগৎ-ব্যাপারের মূলাধারে তন্নিষ্ঠ থাকিল, ইহা তাঁ-

হার সূত্র মধ্যে পরিস্ফূর্ত্ত হইবার সুযোগ পায় নাই। যাহা হউক, বিসদৃশ-পরিণাম-নিষ্ঠ মায়িক বিকার হইতে যে বিষয়ীকে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। মহর্ষিও এই মতের প্রতিবাদী নহেন।

১০। যেখানে বিষয় ও বিষয়ী, প্রকৃতি ও পুরুষ অপরিচ্ছিন্নভাবে সমন্বয় প্রাপ্ত, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্ম সদৃশ পরিণামিনী প্রকৃতি সঙ্গে অভিন্ন একাত্ম স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া অপ্রকট নিত্যলীলাভিভূত। স্বকীয়া অব্যক্তা আনন্দাত্মিকা প্রকৃতির বরাঙ্গে স্বকীয় অব্যক্ত চিদাত্মক স্বরূপের বরাঙ্গ অপরূপ মিশ্রণে মিশাইয়া, অদ্বৈত তদেকাত্মভাবে সমাধিগত। এখানে বিষয় ও বিষয়ীর প্রকৃতি ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নাই। এখানে বিষয় প্রতিনিয়ত বিষয়ীগত এবং বিষয়ী প্রতিনিয়ত বিষয়গত। ছায়াময়ী সৃষ্টি-বিকাশের সূচনা হইতেই—প্রকৃতির মূলদেহ হইতে মায়াংশের বিরূপ, বিসদৃশ, বিজাতীয় আকার পরিগ্রহ হইতেই দ্বৈতভাব, স্বাতন্ত্র্য ভাবের সূক্ষ্ম বীজ সমুদ্ভূত হইল। এখানে তাহার সম্ভাব ও স্ফূর্ত্তি নাই। এখানে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির মূলদেহে অব্যক্তরূপে নিহিত। পরব্রহ্মের অব্যক্ত আত্মরতি এখানে নিরবচ্ছিন্ন সমাধিভাবে নিত্যলীলাভিভূত। এই অভিন্নাত্মক সমাধি-গত অদ্বৈত অব্যক্ত আনন্দ চৈতন্যই ছায়ারূপিণী সৃষ্টিব্যাপারের মূলাধার সৎস্বরূপ। এই ক্রিয়াত্মিকা ছায়াময়ীর কারণাত্মক স্বরূপ ও স্বত্বা এই খানেই নিদানভূত হইয়াছে। এই অব্যক্তা আনন্দাত্মিকা প্রকৃতির ও অব্যক্ত চিদাত্মক পুরুষের অভেদ-চিদানন্দ ঘন একাত্মক অদ্বৈত পরমাত্ম অবস্থাই সমাধির অবস্থা। ইহাই পরা প্রকৃতির বা অঙ্গশায়ী পরম পুরুষের নিত্য-ধামের—তুরীয় ধামের অপ্রকট অব্যক্ত নিত্য লীলার স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা। এই নিত্য সমাধির অবস্থাই নিখিল লীলা প্রবাহের নিত-প্রস্রবণ স্বরূপ সমস্ত গণনার ও সমগ্র দেশ কালের আরম্ভ স্থল,—সমস্ত সত্বার মূলভিত্তি, সমগ্র কার্য্য-কারণ-প্রবাহে আদি স্থান, কর্ম্মাকর্ম্মের গতি—স্থিতির এবং কালকালের সন্ধিস্থল। ইহাই বিষয়ী ও বিষয়ের পুরুষ ও প্রকৃতির চিৎ ও আনন্দের আমি ও তুমির নিরাকার সাকারের একাকার। ইহাই তদাকার বৃত্তির প্রজ্ঞাপ্রজ্ঞের ও জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার পরম আকরস্থল প্রযুক্ত ব্যবহারিক বা পারমাত্মিক প্রতিবিম্বিত বা স্বরূপগত নিখিল জ্ঞানভাণ্ডারের ভিত্তিভূমি হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। ইহাই ত্রিগুণ তরঙ্গের উৎপত্তি স্থল। প্রকৃতির অঙ্গশায়ী এই পরব্রহ্মের অবস্থা অবিশ্রান্ত চিদানন্দঘন—নিরবচ্ছিন্ন সমাধিসমুদ্র-শায়ী। মাণ্ডুক্যোপনিষদে পরব্রহ্মের অবস্থা এইরূপে চিত্রিত হইয়াছে।—"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞান ঘনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞং।" ইহাই মূলাধারস্থিত পারমাত্মিক সমাধির অবস্থার যথাযথ অবিকল চিত্র। নিত্যধামের এই সমাধির অবস্থা—এই অব্যক্ত আত্মরতির অবস্থাই ভজন, সেবা ও প্রেমতরুর অব্যক্ত ঘনীভূত বিদেহ বৈজিক অবস্থা। ইহাই মহাভাবময় পারমাত্মিক প্রকট প্রেমলীলার মূলাধার পত্তন-ভূমি। সৃষ্টিলীলার বীজও এই অজস্র শাশ্বত বীজের বিদেহ-অঙ্কে অব্যক্ত সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্মরূপে নিহিত। এই সমাধি সমুদ্রস্থ বিষয়াংশের বা ত্রিগুণাতীতা অব্যক্তা প্রকৃতির পরমাত্মদেহ স্বতঃই অনুক্ষণ মন্থিত হইয়া অভিব্যক্তির প্রয়োজনে দেহমল পরিবর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই দেহমল বিসদৃশ স্বাতন্ত্র্য-

ভাব লাভ করিয়া ত্রিগুণাত্মিকা, শক্তি-দেহা, সত্ত্ব-প্রধানা, জগৎ-সৃষ্টির বীজ স্বরূপা মায়া প্রকৃতির উৎপত্তি হইল। এই মায়া প্রকৃতি উৎপত্তি লাভ করিবার পূর্ব্বে পরা প্রকৃতির নির্ম্মলাঙ্গে সৃষ্টির অব্যক্ত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিদেহ বীজরূপে অন্তর্নিহিত ও সমাধিগত ছিল। তখনও সেই বীজগর্ভে সৃষ্টির অপরাপর ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপও সূক্ষ্মাতীত অব্যক্তরূপে নিহিত ছিল। প্রকৃতির সমাধিস্থল হইতে মায়াংশের উৎপত্তি হইলে, তাহাতে নিত্যধামস্থ পরাৎপর সত্তা স্বতঃই তাহার অন্তরাত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়াঙ্গে প্রতিবিম্বিত হইল। ইহাতেই সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিময়ত্ব, পরম সাত্ত্বিকতা, অনন্ত শক্তি, শান্তি ও তৃপ্তির অব্যক্ত বীজস্বরূপ অপরাশক্তির নিকেতন অভিব্যক্ত হইল। ইহাই বিশুদ্ধা সাত্ত্বিকী কামনার অব্যক্ত বৈজিক অবস্থা ও সৃষ্টি লীলার প্রতিবিম্বিত পত্তন ভূমি। এইরূপে এখানে দ্বৈতভাবের বীজ প্রকৃতি গর্ভ হইতে অতি সূক্ষ্মাকারে আবির্ভূত হইল। এই নবাভির্ভূত সৃষ্টি বীজের নাম মহত্তত্ত্ব। সমাধি সমুদ্রে এই দ্বিতীয় স্বরূপের—এই দ্বৈতভাবের বীজ অনভিব্যক্ত ও অস্ফূর্ত্ত ছিল।

১১। এই মহত্তত্ত্বের অবস্থা প্রজ্ঞানঘন। তাহা না সমাধি না প্রসুপ্তি, এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী অস্ফূর্ত্ত প্রশান্তি ঘন, পরিতৃপ্তি ঘন অবস্থা। এই প্রশান্তি সমুদ্রশায়ী ঘনপ্রজ্ঞ মহত্তত্ত্বের মধ্যে সৃষ্টির অপরাপর দ্বাবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপ অপরিব্যক্ত ধ্যান স্তিমিতাবস্থায় নিমগ্ন। বেদান্তে এই মায়াংশে প্রতিবিম্বিত স্বরূপকে 'ঈশ্বর' এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে ইঁহাকে 'বাসুদেব' নামে অভিধেয় করা হইয়াছে। ইহাই বিষয়ীর বিষয়াংশের বিসদৃশ বিজাতীয় প্রতিবিম্বে প্রবোধিত ছায়াময় বিরাট অভিব্যক্তি। এখানে এই সূক্ষ্ম বীজাবস্থায় অভিমান (Consciousness) আপাততঃ কোন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিল না। নিম্নে এই অভিমান স্ফূর্ত্তির ক্রমবিকাশ বেদান্তাদি শাস্ত্রের বিবৃতি অবলম্বনে প্রদর্শিত হইতেছে।

১২। এই ঘন-প্রজ্ঞ মহত্তত্ত্বের অপরাশক্তি-দেহ বা প্রশান্তি-সমুদ্রও বিষয়ীর পূর্ব্বানুরূপে আন্দোলিত ও বিমন্থিত হইয়া সেই মন্থন মল হইতে সেই মহতাধারে ব্যষ্টিপুঞ্জের এবং অপরদিকে সেই ব্যষ্টিপুঞ্জের সমষ্টিভূত স্বরূপের যুগপৎ অভ্যুত্থান হইল। শাস্ত্রাদিতে এই ব্যষ্টিকে 'প্রাজ্ঞ' এবং সমষ্টিভূত স্বরূপকে সঙ্কর্ষণ বলে। এই ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টিভূত স্বরূপ মহত্তত্ত্ব দেহের অন্তর্গত কারণ দেহে আশ্রিত। কারণ দেহ মায়ার পরিত্যক্ত দেহমল বা বিজাতীয় বিকৃতি হইতে পূর্ব্বানুরূপে উৎপন্ন। এই বিজাতীয় দেহ বিকৃতির নাম অবিদ্যা, প্রকৃতি বা অহংকার। প্রাজ্ঞগণের ও তাহাদের সমষ্টিভূত স্বরূপের অবস্থা সুষুপ্তাবস্থা বা 'নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহি প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং' অবস্থা। (Neither internally nor externally nor both internally and externally Conscious state) বেদান্তে এই সমষ্টিভূত অবিদ্যাধিষ্ঠিত স্বরূপকে 'ঈশ্বর' এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে ইঁহাকে কারণাব্ধিশায়ী ভগবান বা সঙ্কর্ষণ বলা হইয়া থাকে। এই অবিদ্যাংশের বা অহংকার স্বরূপের সুষুপ্তদেহও পূর্ব্বানুরূপে আন্দোলিত ও মন্থিত হইয়া, সেই মন্থন মলজাত সূক্ষ্ম প্রপঞ্চে সান্তঃকরণ সূক্ষ্মদেহের উৎপত্তি হইল। এই সান্তঃকরণ সূক্ষ্মদেহের উপাদান অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা তন্মাত্রা। ব্যষ্টিভূত 'তৈজস' ও সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভ

এই সূক্ষ্ম দেহাধিষ্ঠিত। ইহাদের অবস্থা—স্বপ্ন বা তন্দ্রা বা অন্তঃ প্রজ্ঞাবস্থা। (Internally Conscious state) হিরণ্যগর্ভ নামটী বৈদান্তিক নাম। পুরাণাদি শাস্ত্রে এই হিরণ্যগর্ভকে গর্ভোদকশায়ী ভগবান্ বা প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম দেহভূত সূক্ষ্ম পঞ্চের পঞ্চীকরণে স্থূল প্রপঞ্চ স্থূলদেহের উৎপত্তি। ব্যষ্টিভূত বিশ্ব ও সমষ্টিভূত বৈশ্বানর এই স্থূল দেহাধিষ্ঠিত। ইহাদের অবস্থাই জাগ্রত বা বহিঃপ্রজ্ঞাবস্থা। (Externally consciousness state) বৈশ্বানরের অপর বৈদান্তিক নাম বিরাট পুরুষ। পুরাণাদি শাস্ত্রে ইঁহাকে ক্ষীরোদক-শায়ী ভগবান বা অনিরুদ্ধ বলিয়া থাকে। এখানে আসিয়া ব্যষ্টিভূত জীব ও সমষ্টিভূত ঈশ্বর অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়গ্রামে (phenomenal sensoriumএ) বিভূষিত হইয়া জাগ্রত জীব ও জাগ্রত ঈশ্বররূপে অধ্যাস বিশিষ্ট হইলেন। মাণ্ডুক্যাদি কোন কোন উপনিষদে মায়াধিষ্ঠিত ও অবিদ্যাধিষ্ঠিত ঈশ্বরের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য স্বীকৃত হয় নাই।

১২। কিন্তু এই জাগ্রতাবস্থা প্রকৃত স্বরূপগত নহে; ইহা সেই স্বরূপগত প্রবুদ্ধাবস্থার প্রতিবিম্বিত ছায়া মাত্র। ব্যষ্টিভূত জীব এবং জীবপুঞ্জের সমষ্টিভূত ঈশ্বর দেশ, কাল ও অবস্থানুগত হইয়া স্থূলাদি দেহত্রয়ে বিহার করিয়া থাকেন। স্থূলদেহের অপর নাম অন্নময় কোষ। জীবপুঞ্জ যখন স্থূলদেহে বা অন্নময় কোষে অবস্থান করেন, তখন তাঁহাদের ও তাঁহাদের সমষ্টিভূত ঈশ্বর-স্বরূপের এইরূপ বহিঃপ্রজ্ঞ জাগ্রতাবস্থা। যখন তাঁহারা এই স্থূলদেহ বা অন্নময় কোষ পরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্মদেহ বা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষত্রয় আশ্রয় করেন, তখন তাহাদের ও তাহাদের সমষ্টিভূত ঈশ্বর-স্বরূপের তন্দ্রা বা স্বপ্ন বা অন্তঃপ্রজ্ঞাবস্থা। যখন তাহারা স্থূল বা সূক্ষ্মদেহ বা অন্নময়াদি কোষচতুষ্টয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কারণদেহ বা আনন্দময় কোষগত হন, তখন তাহাদের ও তাহাদের সমষ্টিভূত ঈশ্বর স্বরূপের সুষুপ্তাবস্থা অর্থাৎ "নান্তঃপ্রজ্ঞং, ন বহিঃ প্রজ্ঞং, নোভয়তঃ প্রজ্ঞং" অবস্থা।

১৩। বিশ্বগণ ও তাহাদের সমষ্টিভূত স্বরূপ-বৈশ্বানর স্থূলদেহের বা অন্নময়কোষের এবং বহিঃপ্রজ্ঞ জাগ্রতাবস্থার অভিমানী। বিশ্বগণ স্বতঃই পরস্পরের সঙ্গে অথবা বৈশ্বানরের সঙ্গে তদেকাত্মভাবে প্রবুদ্ধ ও অভিমানী নহেন। বৈশ্বানরের সেই তদেকাত্মভাবে সম্পূর্ণ প্রবোধ ও অভিমানের স্বতঃসিদ্ধতা হেতু, তাহার কায়ব্যূহের অন্তর্গত সমগ্র বিশ্বগণের গতির নিয়ামক ও বিধায়ক হইয়াছেন। বৈশ্বানর এই জন্য অন্নময় কোষানুগত যাবতীয় জাগ্রত জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শুভাশুভ ফলাফলের বিধাতা। জীবের তন্দ্রাবস্থায় এবং মৃত্যু বা প্রলয়কালে বৈশ্বানর জাগ্রতাবস্থাপন্ন জীবগণকে ক্রোড়ে লইয়া তদীয় কারণাত্মক সূক্ষ্মদেহশায়ী হিরণ্যগর্ভ স্বরূপে বিলীন হইয়া থাকেন। বিশ্বগণ সহজ-সাধ্য মহৎ-সঙ্গ বা সাধনাদি দ্বারা যে পরিমাণে পরস্পরের সঙ্গে অথবা বৈশ্বানরের সঙ্গে তদেকাত্মভাবসমন্বিত হন, সেই পরিমাণে তাঁহারা উন্নত শক্তিসাধ্য সম্পন্ন ও বহিঃপ্রজ্ঞ হইয়া বৈশ্বানরের বা ঈশ্বরের স্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

১৪। তৈজসগণ ও তাহাদের সমষ্টীভূত স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্ম দেহের বা প্রাণাদি কোষত্রয়ের এবং অন্তঃপ্রজ্ঞ তন্দ্রা বা স্বপ্না-

বস্থার অভিমানী। তৈজসগণ স্বতঃই পরস্পরের সঙ্গে অথবা হিরণ্যগর্ব্ভের সঙ্গে তদেকাত্মভাবে প্রবুদ্ধ ও অভিমানী নহেন। হিরণ্যগর্ব্ভের এই তদেকাত্মভাবে সম্পূর্ণ প্রবোধ ও অভিমানের স্বতঃসিদ্ধতা হেতু তাঁহার কার্য্যব্যূহের অন্তর্গত সমগ্র তৈজসগণের গতির নিয়ামক ও বিধায়ক হইয়াছেন। হিরণ্যগর্ব্ভ এইজন্য প্রাণাদি কোষত্রয়াশ্রিত যাবতীয় স্বপ্নাবস্থিত জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও শুভাশুভ ফলাফলের বিধাতা। জীবের সুষুপ্ত্যাবস্থায় এবং প্রলয়কালে এই হিরণ্যগর্ব্ভ তন্দ্রাবস্থাপন্ন জীবগণকে ক্রোড়ে লইয়া তদীয় কারণাত্মক কারণদেহ-শায়ী ঈশ্বর বা সঙ্কর্ষণ স্বরূপে বিলীন হইয়া থাকেন। তৈজসগণ সহজ-সাধ্য, মহৎ-সঙ্গ বা সাধনাদি দ্বারা যে পরিমাণে পবস্পরের সঙ্গে অথবা হিরণ্যগর্ব্ভের সঙ্গে তদেকাত্মভাব সমন্বিত হন, সেই পরিমাণে তাঁহারা উন্নত শক্তিসাধ্য সম্পন্ন ও অন্তঃপ্রজ্ঞ হইয়া হিরণ্যগর্ব্ভের বা ঈশ্বরের স্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন। এই সূক্ষ্মদেহভূত প্রাণাদি কোষত্রয়কে লিঙ্গশরীর বলা হয়। এই সূক্ষ্মদেহকে সংস্কারদেহও বলা হইয়া থাকে; যেহেতু জীবের জাগ্রতাবস্থার যাবতীয় অর্জ্জিত, জ্ঞাত ও অনুষ্ঠিত কার্য্য কলাপাদি এই দেহে সংস্কারগত হইয়া থাকে এবং তাহার সাত্ত্বিক ও রাজসিক অন্তরঙ্গ বা ভাগবতীতনু এই সংস্কার দেহাবলম্বনে গঠিত হয়। নৈতিক আনুগত্য ও বাধ্যতা (moral obligation or conscience) এই সংস্কার দেহেই নিদানভূত থাকিয়া জীবনে প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকে প্রারব্ধ দেহও বলা হয়, কেননা প্রারব্ধের যাবতীয় কর্ম্মফল অভ্যাস, সাধনা, শক্তি ও প্রতিভা এখানে সঞ্চিত থাকে। এই সমস্ত সঞ্চিত ও অভ্যস্ত শক্তি, সংস্কারাদি জীবকে তদীয় জাগ্রতাবস্থায় নিয়মিত ও পরিচালিত করিয়া থাকে। তৈজস জীবের স্বপ্ন কথনও বদ্ধমূল সংস্কার ও অভ্যাস পুঞ্জকে অতিক্রম পূর্ব্বক উদয় হইতে দেখা যায় না। সেইজন্য সংস্কারদেহের স্বপ্নাবস্থায় জীবের বিশ্বাস, বৈরাগ্য শ্রদ্ধা-ভক্তি, নীতিচরিত্র, সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও জীতেন্দ্রিয়তার প্রকৃত গঠন হইয়াছে কি না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা হইয়া থাকে। অবশ্যই এ পরীক্ষা আত্ম সমক্ষেই সম্পাদিত হয়—সাধারণ জনগণের সমক্ষে নহে।

১৫। প্রাজ্ঞগণ ও তাহাদের সমষ্টিভূত স্বরূপ ঈশ্বর বা সঙ্কর্ষণ কারণদেহের বা আনন্দময় কোষের, এবং নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং সুষুপ্ত্যাবস্থার অভিমানী। প্রাজ্ঞগণ স্বতঃই পরস্পরের সঙ্গে অথবা তৎসমষ্টিভূত স্বরূপ সঙ্কর্ষণের সঙ্গে একাত্মভাবে প্রবুদ্ধ ও অভিমানী নহেন। সঙ্কর্ষণের এই তদেকাত্মভাবে সম্পূর্ণ প্রবোধ ও অভিমানের স্বতঃসিদ্ধতা হেতু তাঁহার কার্য্যব্যূহের অন্তর্গত সমগ্র প্রাজ্ঞগণের গতির নিয়ামক ও বিধায়ক হইয়াছেন। সঙ্কর্ষণ এইজন্য আনন্দময় কোষাশ্রিত যাবতীয় সুষুপ্ত জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং তাহাদের যাবতীয় শুভাশুভ ফলাফল বিধাতা। প্রাজ্ঞগণ সহজসাধ্য মহৎ সঙ্গ বা সাধনাদি দ্বারা যে পরিমাণে সাত্ত্বিকগতি এবং বৈরাগ্য ও ঔদাস্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যভাব আয়ত্ত করিয়া পরস্পরের সঙ্গে অথবা সঙ্কর্ষণের সঙ্গে তদেকাত্মভাব সমন্বিত, সেই পরিমাণে তাঁহারা শুদ্ধ সত্ত্ব ও উন্নত শক্তিসাধ্য সম্পন্ন হইয়া সঙ্কর্ষণের বা ঈশ্বরের স্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন। কোন কোন উপনিষদে এই কারণ দেহকে, নিরন্তিশয় বহনশীল-হেতু আতিবাহিক দেহ বলা

হইয়াছে। সূক্ষ্মদেহের সমস্ত গঠন এখানে প্রোথিতমূল হইয়া বৈজিকভাবে অবস্থাপিত। প্রাজ্ঞগণের এই ব্যষ্টিভূত কারণদেহ এক্ষণে প্রসুপ্ত মনবুদ্ধির বিশ্রামাগার—সমস্ত প্রসুপ্ত চিন্তা, ভাব ও কামনার সুগুপ্ত নিবাস ভূমি—সমস্ত সুষুপ্ত স্মৃতি, শিক্ষা, অভ্যাস, জ্ঞান, সংস্কার, শক্তি ও প্রতিভা এখানে পুঞ্জীকৃত ও ভাণ্ডারজাত হইয়া থাকে, এবং প্রয়োজনানুসারে সূক্ষ্ম বা স্থূল দেহগত হইয়া জীবনে উদিত হয়। সঙ্কর্ষণের এই কারণ দেহে যাবতীয় ব্যষ্টি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ কালে অব্যক্ত বীজাবস্থায় অবস্থিত থাকে এবং প্রলয়কালে তিনি যাবতীয় সূক্ষ্মদেহ তাঁহার কারণ দেহে অঙ্গীভূত করিয়া তদীয় কারণাত্মক উপাদান ঘনপ্রজ্ঞ মহত্তত্ত্বের প্রশান্তি বা পরিতৃপ্তি সমুদ্রে বিলীন হইয়া থাকেন।

১৬। এই অবিদ্যা কল্পিত কারণ দেহ, সূক্ষ্মদেহের আবরণের অভ্যন্তরে এবং সূক্ষ্ম দেহ স্থূলদেহের আবরণের অভ্যন্তরে ওতঃপ্রোতভাবে এবং প্রাণরূপে অবস্থাপিত। মহতাধারগত বা মায়াধিষ্ঠিত ঈশ্বর এইরূপে যাবতীয় স্থূলাদি দেহে এবং তন্মধ্যে কোথায় বা ব্যক্ত কোথায় বা অর্দ্ধব্যক্ত এবং কোথায় বা অব্যক্ত ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-সংস্থান বিশিষ্ট এবং জাগ্রতাদি ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন অসংখ্য অনন্ত জীবাভিমানের ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টিভূত স্বরূপে একাত্মভাবে সমন্বিত ও সম্পূর্ণ প্রবুদ্ধ হইয়া ত্রিগুণাত্মক সর্ব্বগত মহান্ ও বর্দ্ধনশীল অভিব্যক্তি লাভ করিলেন এবং যাবতীয় জীবের যাবতীয় সংসারের নিয়ামক ও বিধায়ক হইয়া পরাৎপর শুদ্ধসত্ত্ব যাবতীয় জ্ঞান ও শক্তির ছায়াময় আধাররূপে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হইলেন। এইরূপে এই ছায়াময় জগৎরূপ অধ্যাসে (phenomenal Universe এ) কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া ছায়াময় জগতের ঈশ্বর সমষ্টিভূত ইন্দ্রিয়গ্রাম (phenomenal sensorim) সম্পন্ন প্রতিবিম্বে প্রতিবোধিত ও আত্মবুদ্ধিসমন্বিত হইয়া ছায়াময়ী স্ফূর্ত্তি লাভ করিলেন। ঈশ্বরের এই ঐশ্বরিক সত্ত্বা, পরব্রহ্ম সত্ত্বার প্রতিবিম্বিত অধ্যাসে প্রবুদ্ধ (phenomenal) সত্ত্বা মাত্র। এই প্রতিবিম্বিত সত্ত্বার উপরে সৃষ্টি পরিকল্পিত। মূলাধার সত্ত্বার প্রতিবিম্বই সৃষ্টির কারণ ও সত্ত্বা। সুতরাং মূলাধারস্থিত চিদানন্দঘন সমাধি-সমুদ্রশায়ী পরমাত্ম-সত্ত্বাই সমস্ত সত্ত্বার সত্ত্বা, সমস্ত কারণের কারণ—"সর্ব্ব কারণঃ কারণং তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।"

ক্রমশঃ

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

শ্রীভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শুদ্ধ স্থানে আপনারে করি প্রতিষ্ঠিত
স্থিরাসনে—নহে অতি উচ্চ কিম্বা নীচ,
যাহা বস্ত্র চর্ম্ম কুশ—ক্রমেতে রচিত। ১১

(১১) শুদ্ধ স্থানে—স্বভাবতঃ বা সংস্কার জন্য শুদ্ধ, (শঙ্কর, মধু)। অশুচি ব্যক্তি বা বস্তু দ্বারা অস্পৃষ্ট—পবিত্র (রামানুজ)। জনহীন ভয়হীন গঙ্গাতট বা গিরি গুহাদি স্থানে (মধু)। বেদান্তসূত্রে আছে "যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ (৪।১।১১) যে স্থান চিত্তের একাগ্রতা জন্মাইবার উপযোগী, তাহাই যোগের উপযুক্ত স্থান—তাহাই শুদ্ধ স্থান।

শুদ্ধস্থান সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম আছে :—

শুভ দেশস্ততোগত্বা ফলমূলোদকান্বিতং।
তত্রস্থে চ শুচৌ দেশে নদ্যাং বা কাননেঽপিবা॥

স্বশোভনং মঠং কৃত্বা সর্ব্বরক্ষাসমন্বিতং।
ত্রিকাল স্নান সংযুক্ত শুচিভূত্বা সমাহিতঃ॥
বাশিষ্টসংহিতা।

দূর দেশে তথারণ্যে রাজধান্যৌ জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ॥
অবিশ্বাসং দূরদেশে অরণ্যে ভক্ষ্যবর্জ্জিতং।
লোকারণ্যে প্রকাশস্তু তস্মাৎ ত্রীণি বিবর্জ্জয়েৎ॥
সুদেশে ধার্ম্মিকে রাজ্যে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটীরং কৃত্বা প্রাচীরং পরিবেষ্টয়েৎ॥
নাত্যুচ্চং নাতি নিম্নং কুটীরং কীটবর্জ্জিতং।
সম্যক্ গোময় লিপ্তঞ্চ কুড্যরন্ধ্র বিবর্জ্জিতং॥
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ॥
ঘেরণ্ড সংহিতা।

স্থির—নিশ্চল।

আসন—যোগশাস্ত্রমতে "স্থিরসুখাসনং (পাতঞ্জল দর্শন ২।৪৬ সূত্র, ও সাংখ্যপ্রবচন ৬।২৪ সূত্র) যোগ অভ্যাস কালে এরূপ ভাবে উপবেশন প্রয়োজন, যে তাহাতে কোনরূপ ক্লেশ না হয়, ও স্থির হইয়া বসিয়া থাকা যায়। উপবেশনকালে কর চরণাদি অঙ্গ বিন্যাস নানা ভাবে হইতে পারে। এজন্য আসনও নানারূপ। আসন ৮৪ প্রকার। তন্মধ্যে চারি প্রকার শ্রেষ্ঠ। আর সিদ্ধাসন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

চতুরশীত্যাসনানি শিবেন কথিতানি চ।
তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় সারভূতং ব্রবীম্যহং॥
সিদ্ধং পদ্মং তথা সিংহং ভদ্রঞ্চেতি চতুষ্টয়ং।
হঠযোগ প্রদীপিকা।

যোগশাস্ত্রমতে এই আসন অভ্যাস দ্বারা শরীরের আরোগ্য, দৃঢ়তা, স্থিরতা ও সমাধির সাহায্য হয়।

বস্ত্র চর্ম্ম কুশ—কুশের উপরে চর্ম্ম, তাহার উপরে বস্ত্র বিছাইতে হইবে (স্বামী, শঙ্কর)। যোগ সংহিতায় আছে "মৃদ্বাসনোপরি কুশান্ সমাস্তীর্য্য অথবা অজিনং"। কিন্তু যোগ চিন্তামণিমতে গীতার অনুযায়ী—অগ্রে—কোমল কুশ তদুপরি মৃগ চর্ম্ম ও তাহার উপরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হয়। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২।৬ দ্রষ্টব্য)।

উচ্চ কিম্বা নীচ—পতন ভয়পরিহারার্থ আসন উচ্চ করিবে না। আর ভূতল পাষানাদির সংস্পর্শে বাতক্ষোভ অগ্নি মান্দ্যাদি সম্ভব জন্য নিম্ন স্থানে আসন করিবে না। (গিরি)

বসি সে আসনে, মন একাগ্র করিয়া,
ইন্দ্রিয় চিত্তের ক্রিয়া করিয়া সংযত,—
আত্ম-শুদ্ধি তরে যোগ হইবে করিতে। ১২

(১২) একাগ্র করিয়া—সকল বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া (শঙ্কর)। বিক্ষেপ রহিত করিয়া (স্বামী)। অব্যাকুল হইয়া (রামানুজ)। রাজস্ তামস ও ব্যুত্থান নামক অবস্থাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া, মনে ধারাবাহিক রূপে এক বিষয়ের ভাবনা অভ্যাস করিলে মন একাগ্র হয়। (মধু)।

যোগ—সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাস (মধু)।

আত্ম শুদ্ধি তরে—অন্তঃকরণের শুদ্ধি জন্য (শঙ্কর)। অন্তঃকরণ সকল বিক্ষেপ শূন্য হইলে ও নির্ম্মল হইলে তবে অতি সূক্ষ্ম ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগ্য হয় (মধু, বলদেব)। শ্রুতিতে আছে—

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"

পাতঞ্জল দর্শনে আছে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" এই চিত্তবৃত্তি যখন নিরোধ হয়, তখন আত্ম স্বরূপে অবস্থান হয়, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং।" যোগ শাস্ত্র মতে আমাদের চিত্তবৃত্তি পাঁচরূপ—প্রমাণ, বিকল্প, বিপর্য্যয়, নিদ্রা, স্মৃতি। যোগ অনুষ্ঠান কালে এই সকল বৃত্তিরই নিরোধ করিতে হয়। ইহাই চিত্তর ক্রিয়া সংযত করা। তাহার পর মনকে কোন এক বিশেষ ধ্যেয় বিষয়ে ধারাবাহিক রূপে নিবিষ্ট করিতে হয়। আত্মশক্তি এইরূপে কেন্দ্রীভূত হইলে তবে প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয় (তজ্জয়াতে প্রজ্ঞালোকঃ) তাহার কারণ যোগশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। যথা—

যথার্করশ্মি সংযোগাৎ অর্ককান্তো হুতাশনম্।
আবিষ্করোতি নৈকঃ সন দৃষ্টান্তঃ সতু যোগিনাম্।

অর্থাৎ সূর্য্য রশ্মিসকল যেমন Lense বা সূর্য্যকান্ত মনি দ্বারা কেন্দ্রীভূত হইয়া অগ্নিকে প্রকাশ করে—যোগের দ্বারা আমাদের সমুদয় শক্তি সেইরূপে একীভূত হইয়া আত্মাকে প্রকাশ করে।

যোগ চারি প্রকার—মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ ও হঠযোগ। ইহার মধ্যে রাজযোগ শ্রেষ্ঠ। অন্য যোগ ইহারই অন্তর্গত।

যোগ সাধনা ফলে মুক্তি হয়, অথবা বিভূতি লাভ

ধরিয়া সমান ভাবে কায় গ্রীবা শির,

অচল সুস্থির হয়ে, নাসাগ্রে আপন
রাখি দৃষ্টি, না নেহারি কোন দিক্ পানে, ১৩
শান্তচিত্ত—ভয়হীন—সংযত অন্তর,
ধরি ব্রহ্মচর্য্যব্রত, হবে যোগরত
হয়ে আমাগত চিত্ত—আমা পরায়ণ। ১৪

হয়। যোগের দ্বারা নির্ম্মল প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। কিন্তু গীতার এই স্থলে বলা হইয়াছে যোগের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। অর্থাৎ তাহার দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়—তখন সেই নির্ম্মল চিত্তে জ্ঞানসূর্য্য আপনিই প্রকাশিত হয়—প্রজ্ঞা লাভ হয়।

যোগের আট অঙ্গ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

অহিংসা, সত্য,অস্তেয়, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, মিতাহার ও দয়া—ইহাই যম।

জপ, তপ, দান,বেদান্ত শ্রবণ,আস্তিকভাব,ব্রত,ঈশ্বর পূজা,যথালাভে সন্তোষ,সুমতি ও লজ্জা —এই দশ নিয়ম।

এই যম নিয়ম অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। ইহা গীতায় বারবার উল্লিখিত হইয়াছে।

যম নিয়ম অভ্যাসের পর আসন আয়ত্ব করিতে হয়। 'ততোদ্বন্দ্বানভিঘাতঃ'—অর্থাৎ তাহা হইতে শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ববোধ দূর হয়। তাহা হইলেই পূর্ণ চিত্ত শুদ্ধি আয়ত্ব হয়।

ইন্দ্রিয় দিয়া সংযত করা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করা। "স্ব স্ব বিষয় সম্প্রযোগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইতি ইন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারঃ।" "ততঃ পরম বশ্যতে ইন্দ্রিয়ানাং"। (পাতঞ্জল-যোগ সূত্র)।

আসনের পর যে প্রাণায়াম সাধনা করিতে হয়—তাহা এস্থলে আর উল্লিখিত হয় নাই। চতুর্থ অধ্যায় ২৭, ২৮,২৯ শ্লোকে তাহার বিবরণ আছে। ঐ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

বেদান্তমতে যাহা নিদিধ্যাসন তাহাই যোগ। ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তি প্রবাহই নিদিধ্যাসন (মধু)। শাস্ত্রে আছে—

"ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তি প্রবাহো২পস্কৃতিং বিনা।
সংপ্রজ্ঞাত সমাধি স্যাদ্ধ্যানাভ্যাস প্রকর্ষতঃ॥"

এই ধ্যান সম্বন্ধেই গীতায় 'যোগী যুঞ্জীত সততং' "যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে" "যুক্ত আসীত মৎপর" প্রভৃতি বারবার বলা হইয়াছে (মধু)।

(১৩) সমান ভাবে কায় গ্রীবাশির—কায়-দেহ মধ্যভাগ; কায় গ্রীবাশির অর্থাৎ মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মূর্দ্ধ পর্য্যন্ত। ইহা ঋজু ভাবে ও নিশ্চল ভাবে স্থির ও দৃঢ় রাখিতে হইবে। (স্বামী, মধু)

যোগশাস্ত্র মতে আসনে উপবেশনের নিয়ম এইরূপ:—সমকায়, ও সমাসন হইয়া, চরণ দ্বয় সংহত করিয়া, মুখ-বিবর সংবৃত করিয়া, লিঙ্গ ও মুখ স্পর্শ না করিয়া, যোগরত ও স্থির হইয়া, মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া, দন্তে দন্তে স্পর্শ না করিয়া, কোন দিক না দেখিয়া, স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, পৃষ্ঠবংশ উড্ডীয়ান করিয়া পদ্মাসনে কি সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইবে।"

অচল—অকম্প (মধু) কার্য্য কারণের বিষয় পরবশ শূন্য (গিরি)।

নাসাগ্রে রখি দৃষ্টি—অর্থাৎ দৃষ্টি এরূপ ভাবে রাখিতে হইবে, যেন নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির হইয়া আছে। বাস্তবিক নাসিকা দেখিতে হইবে না। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে—না নেহারি অন্য দিক পানে। (শঙ্কর)। অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্র হইতে হইবে (স্বামী, মধু)।

(১৪) শান্ত চিত্ত—রাগাদি দোষ রহিত অন্তঃকরণ (মধু)।

ভয়হীন—শাস্ত্রে নিশ্চয় জ্ঞান বা পূর্ণ বিশ্বাস জন্য সকল সন্দেহবিহীন বুদ্ধি (মধু)। অথবা সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ দ্বারা আত্মা যোগযুক্ত হওয়ায়—সিদ্ধি সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়ায় ভয়হীন (মধু)।

সংযত অন্তর—মানসবৃত্তি উপসংহৃত (শঙ্কর)। সম বিষয়াকারাবৃত্তি শূন্য (মধু)।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত—গুরুশুশ্রূষা ভিক্ষা ভোজনাদি ব্রহ্মচারীর ব্রত (শঙ্কর, মধু), ইহা 'যমের এক অঙ্গ। পাতঞ্জল দর্শনে আছে "ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ"। এই ব্রহ্মচর্য্য কি, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"কর্ম্মনা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বথা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥

অথবা কায় মন বাক্যে মৈথুন বা স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগই ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ। ইহার জন্য

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পো২ধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেব চ॥'

এই রূপে সদা আত্মা করি যোগরত
সংযত অন্তর হয়ে—যোগী করে লাভ
আমাতে সংস্থিতি—শান্তি পরম নির্ব্বাণ।১৫

কিন্তু অতিভোজী যেই, কিম্বা নিরাহারী,
অতি নিদ্রাশীল, কিম্বা সদা জাগরিত,—
হে অর্জ্জুন, ইহাদের নাহি হয় যোগ। ১৬

মৈথুনের এই অষ্ট অঙ্গই ত্যাগ করিতে হয়। ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্ত্রীলোকের চিন্তাও পরিত্যাজ্য।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে আছে, যাহাকে যজ্ঞ বলে, ইষ্ট বলে,সত্রায়ণ বলে, মৌন বলে, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।

হয়ে আমাগত চিত্ত—পরমেশ্বরগতচিত্ত (শঙ্কর)। সগুণ বা নির্গুণ আত্মাতে চিত্ত সমাহিত —অথবা আত্মা বিষয়ক ধারাবাহিক চিত্তবৃত্তিযুক্ত (মধু)।

আমা পরায়ণ—আমিই পরম পুরুষার্থ যাহার (স্বামী)। শ্রুতিতে আছে "স্ত্রী পুত্র ধন প্রভৃতি সকলের অপেক্ষা যিনি প্রিয়, যিনি সকলের অপেক্ষা অন্তরতম তিনিই আত্মা।"

(১৫) সংযত অন্তর—(মূলে আছে"নিয়ত মানসঃ) নিরুদ্ধ অন্তর (স্বামী, মধু), আত্মার স্পর্শ দ্বারা শুদ্ধি হেতু নিশ্চল চিত্ত (বলদেব)।

আমাতে সংস্থিতি—শান্তি পরম নির্ব্বাণ—যে শান্তি বা উপরতিতে মোক্ষই পরম নিষ্ঠা, তাহা আমার অধীনস্থ (শঙ্কর)। অর্থাৎ তাহা আমার স্বরূপ (গিরি)।

শান্তি বা উপরতি=সর্ব্ব সংসার নিবৃত্তি। আর আমাতে সংস্থিতি=ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান (গিরি)।

আমাতে সংস্থিতি, অর্থাৎ আমার স্বরূপে অবস্থিতি (স্বামী)। সর্ব্ববৃত্তি উপরতিরূপ প্রশান্তবাহী, তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইতে উৎপন্ন, অবিদ্যা নিবৃত্তি হেতু পরম মুক্তি পরিণাম, পরমাত্ম স্বরূপ পরমানন্দরূপ শান্তি তাহাই প্রাপ্ত হয়। নতুবা সংসারিক ঐশ্বর্য্য, যাহা অনাত্ম বিষয়ে সমাধি হেতু উৎপন্ন তাহা প্রাপ্ত হয় না, কেন না সে সকল উপসর্গ-মুক্তি পথের অন্তরায় (মধু)।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে,যোগ লাভ হইলে বা সমাধি হইলে দ্রষ্টা স্বরূপে বা আত্ম স্বরূপে অবস্থিতি হয়। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

এই সমাধির লক্ষণ যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।—

"সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মা পরমাত্মনোঃ।
নিত্যব্রহ্ম পদপ্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিনী॥
নিশ্বাসোচ্ছ্বাস মুক্তো বা নিস্পন্দোহচললোচনঃ।
শিবধ্যায়ী সুনীলশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে॥
ন শৃনোতি যথা কিঞ্চিৎ ন পশ্যতি ন জীঘ্রতি।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি স সমাধিস্থ উচ্যতে॥"

এই শ্লোকোক্ত সমাধিকে মধুসূদন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়াছেন। সমাধি দুইরূপ। সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ ও অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিচার বিতর্ক আনন্দ ও অস্মিতাতে চিত্তের অভিনিবেশ হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সকল চিন্তার বিরাম হয়, মনোবৃত্তির লয় হয়। 'অহং ইদং' এক হইয়া যায়। তখনই সর্ব্ব নিরোধ হইয়া যায়। সমাধিকে আবার সবিচার নির্ব্বিচার, সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক এইরূপেও বিভক্ত করা হয়। সমাধি সিদ্ধিও নানারূপে হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—জন্ম, ওষধি মন্ত্র তপঃ সমাধিজা সিদ্ধয়ঃ।" ইহার মধ্যে সমাধিজ সিদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক এস্থলে তাহার বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

(১৬) অতিভোজী নিরাহারী—যাহা ভুক্ত হইলে জীর্ণ হয় ও শরীরে কার্য্যক্ষমতা সম্পাদন করে, তাহাই আত্মসম্মিত অন্নের পরিমাণ(মধু)। গিরি বলেন, ইহা অষ্ট গ্রাস। ইহার অধিক বা অল্প আহার করা দোষ। শতপথব্রাহ্মণে আছে—

"যদু হ বা আত্ম সংমিতমন্নং তদবতি তন্নহিনস্তি।
যদ্ভূয়োহিনস্তি তদ্ যৎ কনীয়ো ন তদবতি॥"

মধুসূদন বলেন—অধিক আহারে অজীর্ণ দোষ হেতু ব্যাধি পীড়া উৎপন্ন হয়। আর অল্প আহারে শরীরের উপযুক্ত পোষণ অভাবে তাহা অক্ষম হইয়া পড়ে। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে—

দ্বৌভাগৌ পুরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপুরয়েৎ।
বায়োঃ সঞ্চারনার্থায় চতুর্থ মবশেষয়েৎ॥"

(৪ অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

নাহি হয় যোগ—মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে—

"নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তোনচ ব্যাকুলচেতসঃ।
যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র যোগী সিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ।
নাতিশীতে ন চৈবোষ্ণে ন দ্বন্দ্বে নানিলাত্মিতে।
কালেষ্বেতেষু যুঞ্জীত ন যোগংধ্যানতৎপরঃ।"

নিয়মিত হয় যার আহার বিহার,
নিয়মিত কর্ম্ম চেষ্টা, স্বপ্ন জাগরণ
নিয়মিত—যোগ তার হয় দুঃখহারী। ১৭
যখন সংযত চিত্ত,—হয় অবস্থিতি

যোগ সম্বন্ধে অন্য নিয়ম যোগশাস্ত্রে এইরূপ আছে,—
পুষ্টং সুমধুরং স্নিগ্ধং গব্যং ধাতু প্রপোষনং।
মনোঽভিলাষিতং যোগ্যং যোগী ভোজন মাচরেৎ॥
ত্যজেৎ কট্বম্ল লবনং ক্ষীরভোজী সদাভবেৎ॥

* * *

"অম্লং রুক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সর্ষপং কটু।
বাহুল্যং ভ্রমণং প্রাতস্নানং তৈলং বিদাহকং॥
কাঠিন্যং দূষিতঞ্চৈব মুক্তং পর্য্যুষিতং তথা।
অতি শীতোষ্ণাতিচোগ্রং ভক্ষং যোগী বিবর্জ্জয়েৎ॥
প্রাতঃ স্নানোপবাসাদি কাযক্লেশবিধং তথা।
একাহারং নিরাহারং প্রাণান্তেঽপি ন কারয়েৎ॥

(১৭) নিয়মিত আহার—পরিমিত আহার। পবিমিত আহার কি তাহা উপরেব উল্লিখিত হইয়াছে।

বিহার—গতি, পাদক্ষেপ (শঙ্কর, স্বামী)। বিহারস্তু নিযতত্বং যোজনান্ন পরং গচ্ছেৎ (গিরি, মধু)। অর্থাৎ এক যোজন বা চারি ক্রোশের অধিক এক কালে যাইবে না।

কর্ম্ম চেষ্টা—প্রণব যপ, উপনিষৎ আবর্ত্তনাদি কর্ম্ম (মধু)। লৌকিক পারমার্থিক কর্ম্মে বাক্য প্রভৃতি ব্যাপার পরিমিত (বলদেব)।

স্বপ্ন জাগরণ নিয়মিত—রাত্রিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ও শেষ ভাগ জাগরণ করিতে হয়, আর মধ্যে নিদ্রা যাইতে হয়। ইহাই যোগ শাস্ত্রের নিয়ম (মধু)। প্রথমতঃ দশ ঘটিকা পরিমিত কাল জাগরণ,মধ্যে দশঘটিকা বা দশ দণ্ডকাল নিদ্রা, পুনর্ব্বার দশ ঘটিকা পরিমিতকাল জাগরণ ইহাই নিয়ম (গিরি)।

দুঃখহারী—সর্ব্বসংসার দুঃখ ক্ষয়কারী (শঙ্কর) আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখহারী (গিরি) সর্ব্বদুঃখ কারণ অবিদ্যার উন্মূলনের হেতু (মধু)।

এই স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, যোগ অভ্যাস জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন নাই। তাহার জন্য আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি ত্যাগ বা অত্যন্ত অল্প করিবার আবশ্যক নাই। সাধারণ বিশ্বাস আছে যে, যোগ অভ্যাস জন্য হিন্দুদের কঠোর সাধনার নিয়ম ছিল। বুদ্ধদেব সেই নিয়মে ছয় বৎসর সাধনা করিয়া শরীর মন নিস্তেজ ও অবসন্ন করেন। তাহার পর সেইরূপ কঠোর সাধনা ত্যাগ করেন। গীতার এই শ্লোক হইতে সেই বিশ্বাস দুর হইতে পারিবে।

(১৮) সংযত চিত্ত—চিত্ত একাগ্রতা প্রাপ্ত (শঙ্কর)। নিরুদ্ধ (স্বামী)। মধুসূদন বলেন, চিত্তের একাগ্রতা অবস্থায় যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়—পূর্ব্বে তাহার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি চিত্ত একেবারে নিরুদ্ধ হইলে যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়—এস্থলে তাহার বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

আত্মাতে কেবল,—হয়ে সর্ব্ব কাম হতে
স্পৃহাহীন—সেই কালে কহে যোগরত।১৮
দীপ নহে বিকম্পিত বায়ুহীন দেশে,—
উপযুক্ত এ উপমা যোগীজন প্রতি
যিনি চিত্তজয়ী আত্মযোগেতে নিরত। ১৯
যাহে চিত্ত উপরত—নিরুদ্ধ হইয়া
যোগের সেবায়; যাহে সুধু আত্মবলে
আত্মাকে হেরিয়া রহে সন্তুষ্ট আত্মাতে; ২০

যখন পরা বৈরাগ্য বশতঃ চিত্তকে বিশেষ রূপে নিয়মিত বা সর্ব্ববৃত্তি শূন্য করা যায়, যখন চিত্তের রজস্তম মলা দূর হওয়ায় অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হয়—সর্ব্ব বিষয়াকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধবৃত্তি হইয়া আত্মাতেই চিত্ত স্থির হয়, বিষয়ের প্রতি আর অনুরক্তি থাকে না তখন সংযতচিত্ত হওয়া যায় (মধু)।

সর্ব্বকাম হতে—সর্ব্ব দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় হইতে স্পৃহা বা তৃষ্ণা বিরহিত (শঙ্কর, মধু)।

সেই কালে—সেই সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ কালে (মধু)।

(১৯) উপযুক্ত এ উপমা—যেমন বাতাস বন্ধ হইলে দীপ স্থির হয়, তেমনি চিত্ত সংযত হইলে তাহার চাঞ্চল্য দূর হয় (স্বামী)।

চিত্তজয়ী আত্মযোগেতে নিরত—যে যোগী সম্প্রজ্ঞাত সমাধিযুক্ত হইয়া অভ্যাস বলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিয়াছেন, তিনি ক্রমে সর্ব্ব চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত সামাধি রূপ যোগ অনুষ্ঠান করেন। তিনি চিত্তের একাগ্রতা অবস্থা হইতে নিরোধের অবস্থা লাভ করেন। (মধু)।

(২০) যোগের সেবায়—যোগ অনুষ্ঠান দ্বারা (শঙ্কর), যোগ অভ্যাস দ্বারা (মধু, স্বামী)।

নিরুদ্ধ—একবৃত্তিপ্রবাহ রূপ একগ্রতা প্রাপ্ত(মধু)।

যাহে—(মূলে আছে "যত্র") যেই কালে (শঙ্কর) যেই যোগে (রামানুজ) যে অবস্থা বিশেষে (স্বামী, মধু)। যেই সমাধি কালে(গিরি)। মধুসূদন বলিয়াছেন, এ স্থলে "যেই কালে" ব্যাখ্যা অসাধু। তিনি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যকে প্রায়ই সর্ব্বত্র অনুগমন করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন "আমার সহিত কি ভাষ্যকারের তুলনা হয়? এক তুলাদণ্ডে স্বর্ণ ও কুচ পরিমিত হইলেও কি তাহারা তুল্য? (৬।১৪ শ্লোকের মধুসূদন কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এস্থলে মধুসূদন ভাষ্যকারের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

উপরত—সর্ব্ব বৃত্তিনিরোধরূপ—পরিণতি (মধু)।

আত্মবলে—সমাধি পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে (শঙ্কর, স্বামী বলদেব)।

বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখ অত্যধিক
যাহে হয় অনুভূত; যাহে স্থির হলে,
তত্ত্ব হ'তে আর নাহি হয় বিচলিত; ২১
যাহে লভি জ্ঞান হয়, নাহি ইহা হতে
অন্য লাভ গুরুতর; যাহে স্থির হলে,
দারুণ দুঃখেও নাহি হয় বিচলিত;—২২

জান' তাহে কহে যোগ,—দুঃখের সংযোগ
নাহি তাহে: হেন যোগ নিশ্চয় হইয়া,
নির্ব্বেদ-বিহীন-চিত্তে হইবে করিতে। ২৩

ক্রমশঃ

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

আত্মাকে হেরিয়া—সর্ব্বত্র জ্যোতিস্বরূপ পরা-চৈতন্যকে হেরিয়া (শঙ্কর), সচ্চিদানন্দঘন, অনন্ত, অদ্বিতীয়, চৈতন্যময় পরমাত্মাকে বেদান্ত প্রমাণজ বৃত্তি দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া (মধু)।

এই শ্লোক হইতে ২৩ শ্লোক পর্য্যন্ত একত্র গ্রহণ করিতে হইবে। স্বামী বলেন, পূর্ব্বে কর্ম্ম প্রভৃতিকে যোগ বলা হইয়াছে—সে গৌণার্থে, এস্থলে মুখ্য যোগ যে সমাধি, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

মধুসূদন বলেন, পূর্ব্বে সামান্য বা সাধারণ ভাবে সমাধির কথা বলিয়া এস্থলে নিরোধ (অসম্প্রজ্ঞাত) সমাধির বিষয় বিস্তারিত বলা হইয়াছে। গিরিও বলেন, পূর্ব্বে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা উক্ত হইয়াছিল, এই স্থলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

(২১) বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়—যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা কেবল বুদ্ধির দ্বারাই উপভোগ করা যায় (শঙ্কর)। যাহা বিষয় সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের অতীত। কেবল আত্মাকার বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য (স্বামী বলদেব)। যাহা রজস্তম মলা রহিত সত্ত্বমাত্র বাহিনী বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়। সুষুপ্তিতে চিত্ত বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয়। সেই সময় যে সুখ অনুভব হয়, সেইরূপ (মধু)।

সুখ অত্যধিক—পূর্ব্ব শ্লোকে যে আত্মাতে সন্তুষ্ট থাকিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে (মধু)। অনন্ত সুখ (শঙ্কর)। নিত্য সুখ (স্বামী) নিরতিশয় ব্রহ্মরূপ অনন্ত সুখ (মধু)। এখানে সুখ অর্থে আনন্দ বোধ হয়। ব্রহ্ম আনন্দময়। ব্রহ্মে অবস্থান করিতে পারিলে এই অসীম আনন্দ অনুভব হয়। শ্রুতিতে আছে—

"সমাধি নির্দ্ধুতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎসুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
যদেতদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥"

সর্ব্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই এই সুখ লাভ হয়।

তত্ত্ব হতে—তত্ত্ব বা আত্মস্বরূপ হইতে (শঙ্কর)।

(২১) দুঃখ—শস্ত্র নিপাতাদি লক্ষণ যুক্ত মহৎ দুঃখ (শঙ্কর, মধু)। শীতোষ্ণাদি দুঃখ (স্বামী)। সাংখ্য-মতে দুঃখ ত্রিবিধ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(২৩) যোগ—চিত্তবৃত্তি নিরোধাত্মক যোগ (শঙ্কর), দুঃখের সংস্রব—দুঃখ অর্থে এস্থলে বৈষয়িক দুঃখ মিশ্রিত সুখকেও বুঝাইতেছে (স্বামী)। দুঃখের সংস্পর্শমাত্র বিরহিত (স্বামী)। যে অবস্থায় দুঃখের সংযোগ ধ্বংশ হইয়াছে (বলদেব)। সাংখ্যদর্শন মতে ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। যোগ সিদ্ধি হইলে সেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

নিশ্চয় হইয়া—অধ্যবসায় দ্বারা (শঙ্কর)। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত নিশ্চয় বুদ্ধিতে (মধু, স্বামী)।

নির্ব্বেদ বিহীন চিত্তে—(মূলে আছে, ('অনি-র্ব্বিণ্ণ চেতসা')। যোগ সাধনার ন্যায় কষ্টকর কিছু নাই, এতদিন সাধনায়ও সিদ্ধ হইল না—এইরূপ অনুতাপকে নির্ব্বেদ বলে (মধু)। মনে করিতে হইবে যে সাধনায় এ জন্মে সিদ্ধ না হয় ক্ষতি নাই, জন্মান্তরে সিদ্ধ হইতে পারে (মধু)। গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রে নৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেৎ অপরিখেদতঃ॥"

মধুসূদন এস্থলে পক্ষী কর্ত্তৃক অণ্ডাপহারী সমুদ্রের শোষণ বিষয়ে পৌরাণিক গল্প উল্লেখ করিয়া এই কথা বুঝাইয়াছেন।

অধিকারীভেদে যোগ সাধনার নিয়মের প্রভেদ আছে। সাধনার কালেরও প্রভেদ আছে। কেহ যত্ন করিয়া অল্প কাল মধ্যে যোগসিদ্ধ হইতে পারেন। কাহারও অধিক কাল লাগে। কাহার একজন্মে সিদ্ধই হয় না। যোগসূত্রে আছে, 'তীব্রসংবেগানাম্ আসন্নঃ।" অমৃতসিদ্ধি গ্রন্থে আছে—যোগের কোন একটী অবস্থা লাভ করিতে কাহার ১২ বৎসর, কাহার ৮ বৎসর, কাহার বা ৬ বৎসর লাগে; কাহার তিন বৎসর মধ্যেই সিদ্ধি হয়। আর যাহারা

'ব্যাধিতা দুর্ব্বলা বৃদ্ধা নিঃসত্ত্বা গৃহবাসিনঃ।
মন্দোৎসাহা মন্দবীর্য্যা জ্ঞাতব্যা মৃদবো নরাঃ॥

এরূপ লোকে সহজে যোগ সাধনা করিতে পারে না। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিরক্ত হইয়া যোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে (মধু)।

পারস্য ভাষা এবং ফার্দ্দোশী।

বাঙ্গালীর অনেক দোষের মধ্যে একটী প্রধান দোষ এই যে, প্রাচীন সাহিত্যের (classics) আলোচনায় বাঙ্গালী বড়ই অমনোযোগী। বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমান সময়ে বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত (Linguist) নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কেবল বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিখিযাই বাঙ্গালী সন্তুষ্ট থাকেন, পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে তিনি অন্ধ। ইহা বড়ই বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় বলিতে হইবে। ঔদাস্য বা অপটুতা ইহার কারণ। অপটুতা শব্দটা ব্যবহার করিলে বোধ হয় অন্যায় ও অসত্য কথা বলা হয়; যে দেশে সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা ফরাসী ভাষায় অতুল পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া ফ্রেঞ্চ ভাষায় কাব্য লিখিতে পারেন, যে দেশে অষ্টাদশ বর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালক ৬২ পৃষ্ঠা পূর্ণ এক সংস্কৃত কবিতা গ্রন্থ অনর্গল লিখিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, যে দেশে তের বৎসরের বালিকা পারস্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে শিখিয়াছে, যে দেশের পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা হিন্দী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকার কার্য্য করিতে সক্ষমা হইয়াছে, সে দেশের লোককে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় বা প্রাচীন ভাষার শিক্ষায় "অপটু" বলিলে বোধ হয় অসত্য ও অন্যায় কথা বলা হয়। বাঙ্গালীর আলস্য ও অমনোযোগীতাই প্রাচীন সাহিত্যের অনালোচনার মুখ্য কারণ। স্পেন্সার বলেন,—

"যে দেশে মাতৃভাষার সহিত পুরাতন ও প্রয়োজনীয় ভাষা সমূহের আলোচনা হয় এবং দেশের লোকেরা সমকীয় ভাষায় অধিকার লাভের জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করে, সে দেশের নানা কারণে অল্পকাল মধ্যে উন্নতি হইয়া থাকে। বহু ভাষায় পণ্ডিত হইলে বহুজাতির চরিত্র ও সমাজ বুঝিতে পারা যায় এবং আপনার ভাষা, সাহিত্য, দেশ, সমাজ ও ধর্ম্মকে পরিশুদ্ধ ও প্রোন্নত অবস্থায় রাখিতে সক্ষম হওয়া যায়।"

রাজনীতিশাস্ত্র-বিশারদ মেকিয়াভেলিরও ইহাই মত ছিল। সার উইলিয়ম হণ্টার লিখিয়াছেন "বিদেশীয় ভাষার মধ্যে ইংরাজী ভিন্ন আর কোনও ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করার জন্য বাঙ্গালা বিখ্যাত হয় নাই।" হণ্টার সাহেবের মন্তব্য সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। রেভরেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা পাদ্রী গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভিন্ন কতকগুলি ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্গ সমাজে অতি বিরল। বাঙ্গালীর মধ্যে গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, মালায়ালম (মালাবার উপকূলের) ভাষায় একজনও পারদর্শী দেখি নাই। অধিক কি, উর্দ্দু ভাষা— যাহা এক্ষণে সমগ্র ভারতের 'সাধারণ ভাষা' (জবান্-এ-আম্ অর্থাৎ Lingua Franca) বলিয়া পরিগণিত—তাহাতেও বাঙ্গালীর বিশেষ মনোযোগ দেখি নাই। বাঙ্গালা দেশে ইংরাজী এবং বঙ্গভাষা ও তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ সংস্কৃতের আলোচনা ব্যতীত অন্য ভাষার চর্চ্চা একেবারেই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর প্রত্নতত্ত্ব ইংরাজী গ্রন্থের সীমায় নিবিষ্ট। বাঙ্গালা দেশে তের সহস্র লোকের মধ্যে একজনও হিন্দী বা উর্দ্দু জানে না, ২৬ সহস্রের মধ্যে একজন মাত্র অতি অবিশুদ্ধ ও জঘন্য হিন্দী বলিতে পারে। ৪০ সহস্রের মধ্যে একজন বিশুদ্ধ হিন্দী জানে এবং ৫৬ সহস্রের মধ্যে একজন

ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করিয়া উর্দ্দু বলিতে পারে। সাত লক্ষের মধ্যে একজনও পারস্য ভাষায় পারদর্শী নহে। ৩৫ লক্ষের মধ্যে এক জনও আরব্য জানেনা। উপরে যে হিসাব দেওয়া গেল, ইহা বঙ্গদেশের সীমান্তবর্ত্তী বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের একত্র সমষ্টিতে প্রয়োজিত হয়। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে যাঁহারা বাস করেন (যথা অযোধ্যা, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যভারত, প্রভৃতি) তাঁহাদের হিসাব স্বতন্ত্র, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থাও অতীব লজ্জাজনক। বাঙ্গালা দেশের সীমাভ্যন্তরে বাঙ্গালী হিন্দু আদৌ উর্দ্দু বলিতে পারেনা; হিন্দীতে যাহা কিছু বলে, তাহা অবিশুদ্ধ এবং অর্দ্ধ হিন্দী ও অর্দ্ধ বাঙ্গালা, ইহাকে "দবোয়ানী হিন্দী" বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের শতকরা এক জন বিশুদ্ধ উর্দ্দু এবং শতকরা দুইজন বিশুদ্ধ হিন্দী বলিতে সক্ষম হয়। সংখ্যায় এত কম হইবার কারণ এই যে, বাঙ্গালী (ইংরাজী ভিন্ন) পরকীয় ভাষায় মনোযোগী নহে। তিন চারি পুরুষ হইতে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাস করিতেছে, অথচ শুদ্ধ উর্দ্দু বলিতে পারে না, এমন শত সহস্র বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। পশ্চিমে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের ৫শতের মধ্যে একজনও পারস্য শিখিয়াছেন কি না সন্দেহ। এখনকার বিদেশী বঙ্গযুবারা কলেজে উর্দ্দু ও পারস্য শিখিতেছে বটে, কিন্তু কথোপকথনে এখনও বিশেষ পটু হয় নাই। যাহারা কথোপকথনে পটু, তাহাদের অনেকে আবার উর্দ্দু বা পারস্যভাষা লিখিতে পটু নহে। স্কুল কলেজ ভিন্ন লেখার অভ্যাস বড়ই কম থাকে। বাঙ্গালী যুবাকে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় প্রায় সকল কাজই করিতে হয়, সুতরাং লেখার অভ্যাস কিরূপে থাকিতে পারে?

এক সময়ে পারস্য ও উর্দ্দু বাঙ্গালা দেশে বিশেষ প্রচার ছিল। সে সময়ের লোক এখন প্রায়ই নাই। তখনকার বাঙ্গালীরা কথায় কথায় গোলেস্তা ও দেওয়ান হাফেজের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দৃষ্টান্ত দিতেন। ইংরাজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা দেশে পারস্য ও উর্দ্দুর চর্চ্চা বন্ধ হইয়াছে। ইহার পুর্ব্বে উর্দ্দু ও পারস্য, বাঙ্গালা দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের "ভাষা" (Court language) ছিল। এখন বাঙ্গালায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা আদালতে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যবন ভাষার চর্চ্চা বন্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের মাতৃভাষা এখন বাঙ্গালা, ইহাঁদের সহস্রের মধ্যে; বোধ হয়, দশজনও আরব্য ভাষায় কোরাণ বুঝেন না। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা মাদ্রাশায় পড়িয়াছেন, অথবা সহরে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য অনেকে ভাল উর্দ্দু বলিতে পারেন এবং 'মৌলবী' সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন পারস্য ভাষার চর্চ্চা বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যেও নাই। ইহা বড়ই লজ্জার কথা বলিতে হইবে। পারস্য ভাষার চর্চ্চা নানা কারণে আমাদের পক্ষে হিতকারিণী। মুসলমানের সহিত হিন্দুর এত দৃঢ় সম্বন্ধ যে, মুসলমানের ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্র, সামাজিক চরিত্র, সাহিত্য ও ইতিহাস না বুঝিলে আমরা আমাদের নিজের অনেক কথা বুঝিতে পারি না। মুসলমানেরা এ দেশে প্রায় এক সহস্র বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, আমাদের সমাজের অস্থিতে অস্থিতে মুসলমান সমাজের ছায়া এখনও লাগিয়া রহিয়াছে। মুসলমানের সাহিত্য না বুঝিলে, মুসলমানের সাহিত্য না পড়িলে,

"মুসলমান"কে আমরা বুঝিতে পারি না। মুসলমানের সাহিত্য পারস্য ভাষায় লিখিত, এই ভাষা প্রাচীনা, মধুময়ী এবং নানা বিপুল ও বিশিষ্ট গ্রন্থের ভাণ্ডার। এই সুবিশাল সাহিত্যকে বুঝিলে মুসলমানকে বুঝা যায়। এই ভাষার আলোচনায় আমরা জগতের অনেক প্রাচীন ইতিহাসতত্ত্ব প্রাপ্ত হই; এই ভাষার আলোচনায় আমরা প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ সহায়তা লাভ করিতে পারি। পারস্য, আরব্য, তুর্ক, তাতার, মিশর, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, সোয়াট, কুর্দ্দীস্থান, জাঞ্জীবার, আফ্রীগার, বোগদাদ প্রভৃতি জগতের সভ্য জনপদ সমূহের ঐতিহাসিক বিবরণী এবং এই বীরপ্রসবিনী ভূমি সমূহের ভৌগলিক বৃত্তান্ত জানিতে হইলে, বিশেষতঃ অগ্নি উপাসক "ফার্শী"দিগের ইতিহাসে অধিকার লাভ করিতে হইলে, মধ্য আসিয়ার (জগতের মানবজাতির উৎপত্তি স্থানের) অতি প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হইলে, পারস্য ভাষার চর্চ্চা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য বলিতেছি, পারস্য সাহিত্যের আলোচনা বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই শ্রেয়স্কর। এই পারস্য ভাষা আরব্য ভাষা হইতে সমুৎপন্না; পারস্য বহুল ভাষার প্রসূতি। তুর্কী, তাতারী, উর্দ্দু, পস্তু, কাফিরিস্থানী, কুর্দ্দী, দাত্রী, পশিয়ারী, বেলুচী, বিরায়ী, প্রভৃতি নানা প্রকারের ভাষা পারস্য ভাষাতরুর শাখা মাত্র। এইরূপে দেখান যাইতে পারে, পারস্য ভাবায় অধিকার লাভ করিলে বহুভাষায় অধিকার জন্মিয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, বঙ্গ সমাজে এই ভাষার চর্চ্চা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া "পারস্য সাহিত্যের উপকারিতা ও সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে সহজে এখন বুঝাইয়া উঠা কঠিন। বলা বাহুল্য, পারস্য ভাষা কঠিন নহে, শিখিতে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে; কিঞ্চিৎ উর্দ্দু—অন্ততঃ কিঞ্চিৎ হিন্দী—শিখিয়া পার্শী শিখিলে সহজেই পারস্যভাষা আয়ত্ত হইয়া উঠে।

পারস্যভাষায় অনেক ভাল ভাল লেখক আছেন। ইহার সাহিত্য অতি বিশাল এবং প্রাচীন। ফার্শী সাহিত্যে কবি ফার্দ্দোশী মহা প্রসিদ্ধ। ফার্দ্দোশীর গ্রন্থাবলী আদ্যন্ত পদ্যে রচিত। পারস্য সাহিত্যাকাশে ফার্দ্দোশী মধ্যাহ্ন সূর্য্য। আমরা এই প্রস্তাবে কবিবর মোলানা সেখ ফার্দ্দোশীর জীবন চরিত্র এবং অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। *

ফার্দ্দোশীর কাব্যের আকার লইয়া বিচার করিলে, তাঁহাকে ইরাণের হোমর বলা যাইতে পারে। মামুদ গজনির সভায় তিনি যেরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিলেন, সেই ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহাকে স্পেন্সার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কুইন আলিজাবেথের সভায় লর্ড শিশিলের প্ররোচনায় স্পেন্সার যেরূপে ব্যবহৃত হয়েন, হোসেন মেমি-

* সেখ সাদির ও ফার্দ্দোশীর গ্রন্থাবলী নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাতেও তাঁহাদের কয়েকখানি গ্রন্থ অনুবাদিত দেখা যায়। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফরিণ পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন "ফার্দ্দোশীর কাব্যের কোনও কোনও অংশ মিলটনের সমতুল্য। কোনও কোনও চরিত্রের বর্ণনা সেক্‌স্‌পিয়রের বর্ণনাপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও স্বাভাবিক।" আগ্রার মুন্সী আবদুল করিমের নিকট মহারাণী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়া সেখ সাদির 'গোলেস্তা' ও 'বোস্তা' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন "যে দেশে এরূপ গ্রন্থাবলী আছে, সে দেশের সমাজ ও সাহিত্যকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বলা যাইতে পারে।"

দির প্ররোচনায় ফার্দ্দোশী গজনি সভায় ঠিক সেইরূপে ব্যবহৃত হয়েন। গজনি সভা হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি যে অবস্থায় পতিত হন, তাহা ঠিক ইটালীর ডান্টে কবির জীবনের সহিত মিলে। আদিরসে তিনি বিদ্যাপতি, বিরহ বর্ণনায় তিনি ভারতচন্দ্র এবং করুণ রসে তিনি বাল্মিকী। ফর্ব্বিশ সাহেব লিখিয়াছেন "নানা ভাষায় অধিকার থাকায় ফার্দ্দোশীর গ্রন্থে নানা দেশের নানা ভাব আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক জ্ঞানে তিনি বড়ই পণ্ডিত ছিলেন।" হামিলটন বলেন "অত্যুক্তি বর্ণনার দোষ বাদ দিলে ফার্দ্দোশী অতি উচ্চশ্রেণীর কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।" মণ্ডর বোর্ডো বলেন কবিতাদেবী ফার্দ্দোশীর মিত্র ছিল।" ফার্দ্দোশী শব্দের অর্থ "স্বর্গজ"†। ইহার অন্য নাম তুশী †। ইনি খ্রীষ্টীয় ৯৩৯ অব্দে কিয়ানিয়ান বংশে খোরাসান প্রদেশের তুশ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আরব্য ও পেলবী ভাষায় তাঁহার পিতা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই দুই ভাষা তিনি শিক্ষা করিয়া অতুল পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "সাহনামা" কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমাগত ৩৫ বৎসর কাল চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে ফার্শী মৌল মাসের ২৫ তারিখে (খ্রীষ্টীয় ১০১০ অব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে) সাহানামা সমাপ্ত করেন। গ্রন্থের প্রথমে তিনি জোহাক ও ফরিদোণ নামক দুই ব্যক্তির বর্ণনা লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থ হইতেই সার ওয়ালটর স্কট সাহেব তাঁহার বিখ্যাত "টালিশ্‌মান" পুস্তকে উহাঁদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী গ্রহণ করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্যের সভার কালিদাসের ন্যায় মামুদের সভায় ফার্দ্দোশী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। ফার্দ্দোশীর ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমে সম্রাট মামুদের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মামুদের উৎসাহে তিনি সাহনামা সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গ্রন্থের কবিতার সংখ্যা ৬০ সহস্র। গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে সম্রাট, রাজকবিকে (ফার্দ্দোশীকে Poet Laureate) ৬০ সহস্র আষ্‌কাল্‌ দিনার (স্বুবর্ণ মোহর) অর্থাৎ এখনকার প্রায় ৭॥০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবার অনুমতি দেন, কিন্তু মন্দবুদ্ধি মন্ত্রী হোসেন মেমেদির পরামর্শে ফার্দ্দোশীর ভাগ্যে কেবল ৩ লক্ষ টাকা মিলিয়াছিল। কবিবর স্পেন্‌সারের ভাগ্যেও তাহাই ঘটে। একদিন কুইন আলিজাবেথ স্পেন্‌সারের কবিতা শ্রবণ করিয়া সন্তোষ সহকারে তাঁহাকে একশত পৌণ্ড পুরস্কারের আদেশ দেন, লার্ট শিশিল হিংসাপরবশ হইয়া তাহা দিতে দেন নাই। প্রথিত আছে, স্পেন্‌সার এক সপ্তাহ কাল পরে রাজ্ঞী আলিজাবেথের নিকটে গিয়া কবিতায় বলেন—

I was promis'd on a time
To have reason for my rhyme
From that time unto this reason
I received nor rhyme nor reason".

আলিজাবেথ ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হয়েন

* "The Muses were, so to speak, his own bosom friends, to whom he opened all his heart. With them he conversed perpetually on the various events of his life into their ears he poured forth constantly the tale of his joys and sorrows of his hopes, his fears, his distresses."

† "He was called Firdusi, *i.e.* heavenly, from the fact that King Mahmud, who was much pleased with his poetical compositions, once observed that the poet had turned his court into a paradise. He was also called Tusi from the fact of his being born in that country.' অন্যত্রে—

"Many titles were given to Firdusi by the King and his courtiers, but he is most popularly called under the title Firdusi which means divine and indeed the people believed that he was a divine poet".

এবং শিশিলকে ধমকাইয়া দেন। স্পেন্সারের হস্তে প্রতিশ্রুত অর্থ আসিযা পৌছে। মেমেদি যখন ৩ লক্ষ টাকা ফার্দ্দোশীর নিকট পাঠাইয়া দেন, তখন ফার্দ্দোশী জিজ্ঞাসা করেন "বাকী টাকা কোথায়?" মেমেদি উত্তর না দেওয়ায় তিনি ৩ লক্ষ টাকা তিন জন ভৃত্যকে দান করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হয়েন; সম্রাটের সাক্ষাৎ না পাইয়া গজনি পরিত্যাগ করেন। যাইবার সময় মামুদের বিরুদ্ধে কয়েকটী তীব্র ব্যঙ্গোক্তিব্যঞ্জক কবিতা লিখিয়া যান। কবি ডান্টের এই অবস্থা হইয়াছিল। ডান্টে যখন পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে, গ্রামে গ্রামে, ঘুরিতে ছিলেন পোলেণ্টা (Guide de Polenta) যেমন তখন তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন, তাবিরস্তানের যুবরাজ ফার্দ্দোশীর তেমনি সহায় ছিলেন। ইটালীর লোকেরা ডান্টের মহাকাব্য (Divine comedy) পাঠ করিয়াও তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে সম্মানিত করেন নাই, এইজন্য বাইরণ লিখিয়াছেন—

> "Ungrateful Florence! Dante sleeps afar
> Like Scipio buried by the upbraiding shore". *

এই কথা পড়িয়া ফ্লোরেন্সের লোকেরা ডান্টের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। † ফার্দ্দোশী জীবিতাবস্থায় দুই একজন নরপতির সাহায্য ভিন্ন সাধারণের নিকটে সাহায্য বা সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই। গজনি হইতে পলাইয়া তিনি খালিফের রাজসভায় পৌছেন এবং "ইয়ুাক জোলেখাঁ" কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। ইউরোপে প্রাচীন কালে পোপকে যেমন সমুদয় রাজাগণ মান্য ও ভয় করিত, ফার্দ্দোশীর সময়ে মামুদকে মধ্য আসিয়ার সমগ্র নরপতিগণ সেইরূপ ভয় ও মান্য করিত, সুতরাং খালিফের সভায় আর গুপ্ত ভাবে থাকা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। তিনি খালিফের রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তাবিরস্তানের পাদসাহ মামুদ গজনি সমীপে ফার্দ্দোশীর সুপারিশ করিয়া পাঠান; মামুদ মেমেদিকে তিরস্কার করেন এবং ফার্দ্দোশীর নিকটে ৭॥০ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিবার হুকুম দেন। যে দিন ফার্দ্দোসীর মৃত্যু হয়, ঠিক সেইদিন মামুদের নিকট হইতে টাকা লইয়া সম্রাটের লোকেরা পৌছে এবং যে সময়ে কবিবরের মৃতদেহ কবরস্থানের অভিমুখে বাহকেরা লইয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ৭॥০ লক্ষ টাকা আসিয়া উপস্থিত হয়। সাড়ে সাত লক্ষ টাকা কবির নামে জমা হইল বটে, কিন্তু একটী কড়িও সঙ্গে গেল না!

"সাহনামা" অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ, মুদ্রিত পুস্তক ৪০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ*। ইহার আদ্যন্ত প্রাচীন, পরিশুদ্ধ, মৌলিক অথচ কঠিন পারস্যে বিরচিত। ইহাতে আরব্য, পেহলবী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সাহনামায়' ২৩৭ 'বাব' (অংশ বা অধ্যায়) আছে। সমগ্র গ্রন্থে পারস্যের ইতিহাস প্রাচীন পাদসাহদিগের জীবনচরিত, সমগ্রদেশের সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক বিবরণ, সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির সমালোচনা, পারস্য ভাষার মাহাত্ম্য বর্ণন, নানা যুদ্ধের বিবরণী, নানা দেশের বিবৃতি, নানা বীরের বর্ণনা ইত্যাদি অতি সুন্দর ভাষায় বিরচিত হইয়াছে। সাহ-

* Childe Harold. 3rd. Canto.

† "It was only after what Byron wrote as a reprimand, that Florence gave Dante a monument".—Gibb's History of Italy. p. 621.

* বাজারে সম্পূর্ণ সাহনামা কম পাওয়া যায়। অন্য ভাষায় সম্পূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ প্রায়ই নাই।

নামা কাব্যে নানা প্রকারের ছন্দ ও নানা প্রকারের অলঙ্কার সন্নিবিষ্ট। পারস্য ভাষানভিজ্ঞের কাছে সে সৌন্দর্য্যের বিবৃতি দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ফর্দ্দৌশীর সাহনামায় রুস্তম পালোয়ানের জীবনচরিত, যুদ্ধের বিবরণ,বীরত্বের ইতিহাস ইত্যাদি অতীব মনোমোহক ও কৌতুকোদ্দীপক। এই বর্ণনায় অবশ্য অতিরঞ্জন আছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা জগতের প্রধান প্রধান কবিতাময়ী বর্ণনার সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ। সাহনামা পৃথিবীর সভ্য জাতির সাহিত্যে এক অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কার। যতদিন কাব্যের আদর থাকিবে, যতদিন পারস্য ভাষা জীবিতা থাকিবে, ততদিন 'সাহনামা" আমরা ভুলিতে পারিব না।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

পরিচয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বাহ্ণ কালে ফুটিল নলিনী
ধাতার মানস-সরোবরে;
রঞ্জিত সহস্র দল কাঁপিল অমনি
আপনারি সৌরভের ভরে।
প্রফুল্ল কমলদলে সুরভির শ্বাসে
জনমিলা প্রণয়ী যুগল,
সাবিত্রী গায়ত্রী দেবী প্রজাপতি পাশে
যেন ছুটী নবীন উৎপল।
পদ্মের চুম্বনে পদ্ম ফোটে চারি ভিতে
সরোবর উথলে উল্লাসে,
সেই আদি প্রেমরাগ ফুটিল মহীতে
সেই আদি প্রণয় বিলাসে।
প্রণয়ের শুভ্র হাসে লয়ে শুভ্রদল
ফোটে চারু নলিনী সুন্দরী,
প্রেমের সঙ্গমে ফোটে রমণী-উৎপল
শুভ্ররূপা দেবী বাণীশ্বরী।
শ্বেত পদ্মাসনে দেবী লইলা আসন
গীতিস্বর বাজিয়া উঠিল,
নীরব নিস্পন্দ বিশ্বে জাগিল জীবন
জগতের জড়তা ঘুচিল।
সেই দেবী গীতিস্বরে লভিলা জনম
ছুটীপুত্র কুলের তিলক,
তাঁদের যশের গীতি সাগর জঙ্গম
নিত্য গায় বাড়ায়ে পুলক।
বল্মীকের স্তূপতলে শ্যামচ্ছায় বনে
একজন ছিলেন শায়িত,
তিনিই জনক মম; একেলা গহনে
তাঁরি কোলে হইনু পালিত।
সরিৎ পুলিনে পড়ি ছিল আর জন
ধীবর পালিল তাঁরে ঘরে;
পিতৃহীনা অনাথিনী বালিকা যখন
বাড়িলাম তাঁহারি আদরে।
অপরূপ রূপে আর অনন্ত যৌবনে
বিধাতা করিলা মোরে ধনী।
কারে দিব বরমাল্য? ভাবিলাম মনে
স্বয়ম্বরে করিব বাছনি।
হইল বিরাট সভা, পুরুষ সুজন
কত আসি সভা উজলিল;
ভজিয়া কাহারে আমি জুড়াব জীবন
এই চিন্তা মনেতে উদিল।
রাজনীতি বিশারদ পণ্ডিত প্রবর
যাচিলেন প্রণয় আমার,
আততায়ী জানি তাঁরে হইনু অন্তর,
সসঙ্কোচে করি নমস্কার।

তর্কে পটু দার্শনিক মীমাংসা তৎপর
হইলেন প্রেমপ্রার্থী আসি,
হেরি শুষ্ক মুখ তাঁর রুক্ষ কলেবর
দূরে গেনু সভয়ে নিঃশ্বাসি।
"শাস্ত্র পারদর্শী আমি ধর্ম্মতত্ত্বে পটু,
কর মোর জীবন সফল ;"
বলিয়া কহিল এক ব্রাহ্মণের বটু,
হৃদিশূন্য মস্তিষ্ক সম্বল।
সভয়ে নমিয়া তাঁয় হনু অগ্রসর,
ভাবিলাম, কি হবে আমার ;
বুঝি মিলিল না আর অনুরূপ বর,
বৃথারূপ যৌবন অসার।
চতুর্থ সুজন এক হেরিনু সম্মুখে
নাম তাঁর কুবের পণ্ডিত ;
নানাছন্দে রচি ঘর বিরাজেন সুখে
শব্দরাশি ভাণ্ডারে সঞ্চিত।
ভুলাতে রমণী চিত্ত কত অলঙ্কার
এনেছিল গাঁথিয়া যতনে,
কহিলা সম্ভাষি মোরে "লও উপহার,
সাজ ধনী নব আভরণে।
"চল মোর ছন্দগৃহে রচিত কৌশলে
দুজনা করিব সুখে ঘর।"
বুঝিলাম ধনী মোরে বাঁধিয়া—শৃঙ্খলে
লতে চায় ; উপজিল ডর।
জনম নলিনীকুলে বাড়িনু কাননে
পুলিনে প্রান্তরে সুখ পাই ;
শাব্দ-ছন্দ-করা গৃহে পশিব কেমনে
স্বাধীনতা যথা মোর নাই ?
ধাতব এ অলঙ্কারে ভোলে নাকো মন
তৃপ্তি সুধু পুষ্প আভরণে।
কহিলাম, ক্ষমা কর পণ্ডিত সুজন,
যেতে নারি তোমার ভবনে।

হেরিলাম তার পর যুবা একজন
ধন রত্ন কিছু নাই তার ;
দারিদ্র্য সম্বল ; তবু সুধু অনুক্ষণ
বনে আর পর্ব্বতে বিহার।
মানবের সুখ দুঃখ হরষ যাতনা
প্রাণমাঝে করে অনুভব,
তাই লয়ে করে সদা সঙ্গীত রচনা
তাই তার সমগ্র বিভব।
সুধাময় হৃদয়ের প্রেম অনুরাগ
নয়নের জ্যোতিতে বিম্বিত,
প্রশান্ত ললাটে চারু কল্পনার দাগ
পরিস্ফুট রয়েছে চিত্রিত।
স্থিরনেত্রে মোর পানে রহিল চাহিয়া—
মুখে নাহি সরিল বচন ;
সে দৃষ্টিতে প্রাণ মোর গেল বিগলিয়া—
তাহাকেই করিনু বরণ।
পরশিয়া কর মোর অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে
কহিল, "জান কি তুমি রাণী
"চিরদিন ভ্রমিয়াছে পর্ব্বতে প্রান্তরে
কার তরে আমার পরাণী ?
"একেলা কল্পনা সাথী ছিল সাথে সাথে,
লহ তারে তোমার সেবায় ;
"চল মোরা ভ্রমি বিশ্ব ধরি হাতে হাতে
অন্য সুখ কি আছে ধরায় ?
"দরিদ্র দম্পতি মোরা তাহে দুঃখ নাই
ধন রত্ন লয়ে কি করিব ?
"যথায় সৌন্দর্য্য ফোটে বসি সেই ঠাঁই ?
দুজনায় সঙ্গীত গাহিব।"

৩রা কার্ত্তিক, ১৯৫৩। } শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

জড়বাদ।

জড় আপনার অন্তর্নিহিত আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির প্রভাবে ক্রমে উন্নত হইয়া উদ্ভিদ্ ও জীবে পরিণত হইয়াছে, এবং যাহাকে আত্মা বা চৈতন্য বলা যায়, তাহা মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া মাত্র। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন না কোন পেশী বিকম্পিত হয়; ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহাকে মানসিক ক্রিয়া বলা যায়, তাহা ঐ কম্পনেরই ফল মাত্র; অতএব আত্মা বলিয়া জড়াতীত কোন বস্তু নাই।

১। জড় কাহাকে বলে? আমরা জড়কে রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের সমষ্টি বলিয়াই জানি। চক্ষুর সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই রূপ; রসনার সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই রস; নাসিকার সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই গন্ধ; ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই স্পর্শ; আর কর্ণের সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই শব্দ। একটুকু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা আমাদেরই জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং জড়ের জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব নহে। যাহা জ্ঞানেরই বিষয়, তাহা জ্ঞানকে ছাড়িয়া থাকে কি প্রকারে? অতএব, জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হওয়া ত দূরে থাকুক, পক্ষান্তরে জড়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যময় আত্মা বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে।

বিজ্ঞান নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে; আলোক-রশ্মি চক্ষুর সংস্পর্শে না আসিলে রূপের জ্ঞান হয় না; কোন পদার্থ রসনার সংস্পর্শে না আসিলে রসের জ্ঞান হয় না; বস্তুর পরমাণু নাসিকার সংস্পর্শে না আসিলে তাহার গন্ধ পাওয়া যায় না; বায়ু তরঙ্গ কর্ণকে স্পর্শ না করিলে স্পর্শ জ্ঞান হয় না। কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের জ্ঞান কি? কোন বস্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য করিতেছে, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা ক্রিয়াশীল, তাহা কি জড়? সাধারণ লোকে যাহাকে জড় বলে, তাহার একটা গুণ নিষ্ক্রিয়তা; সুতরাং যাহা ক্রিয়াশীল, তাহা আবার জড় অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হইবে কি প্রকারে? অতএব যাহাকে জড় বলিতেছ, তাহা চৈতন্য বস্তুতেই নানা রূপে অবস্থিতি করিতেছে, এবং সেই বস্তুই তাহার বিবিধ রূপ আমাদের আত্মাতে প্রকাশ করিয়া, অন্তরে বিচিত্র লীলা করিতেছে, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। জ্ঞাননিরপেক্ষ জড় বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র। যাহা জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অবশ্য জ্ঞানেতেই আছে, নতুবা তাহা কখনই আমাদের জ্ঞান-গোচর হইতে পারিত না; কারণ যাহা জ্ঞানেতে নাই, তাহার জ্ঞানেতে থাকিবার সম্ভাবনাই নাই, সুতরাং তাহা কখনই জ্ঞেয় হইতে পারে না।

২। শুদ্ধ জড় শক্তি দ্বারাই কি জগতের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাখ্যা হইতে পারে? পরমাণু সকল পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে—এই আকর্ষণী শক্তিই জড়ের মূল শক্তি। যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকার্ষণ প্রভৃতি অন্যান্য সব শক্তিই এই এক মূল শক্তির রূপান্তর মাত্র। এই মহতী শক্তির প্রভাবেই পরমাণুপুঞ্জ কখনও পর্ব্বত, কখনও

নদী, কখনও বায়ু, কখনও বাষ্প প্রভৃতি বহু-বিধ আকার ধারণ করিতেছে। ইহারা সকলই পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগের ফল মাত্র; এবং সংযোগ ও বিয়োগ ব্যতীত জড়-শক্তির অন্য কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না।

নির্জীব জড়রাজ্য অতিক্রম করিয়া যখন উদ্ভিদ্ ও প্রাণিরাজ্যে প্রবেশ করি, তখন সংযোগ বিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য বহুবিধ ক্রিয়া দেখি, যাহা কখনই কেবল সংযোগ-বিয়োগাত্মিকা জড়-শক্তির ক্রিয়া হইতে পারে না। এখানে এক অত্যাশ্চর্য্য একত্ব ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, তাহার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম সূত্রবৎ পদার্থ সকল, ও কোষ নিচয়, প্রত্যেকেই স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, অথচ সকলের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে বৃক্ষ-জীবন রক্ষিত হইতেছে, সকলে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্য্য করিতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া এক, কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ এক অথবা পূর্ণ নহে। প্রাণী সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। এই অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য একত্ব, স্বাধীনতা ও সামঞ্জস্য নিশ্চয়ই কোন জড়াতীত শক্তির ক্রিয়ার ফল; কারণ যাহা জড়ে নাই, তাহা জড় কি প্রকারে প্রদান করিবে? রাসায়নিক শক্তিতে দুই বা তদধিক বস্তু মিলিত হইয়া এক হইয়া যায় বটে, কিন্তু যে যে বস্তু মিলিত হইয়া অপর কোন বস্তুর আকার ধারণ করে, তাহাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশাইলে এক প্রকার লোহিত বর্ণ পদার্থ উৎপাদিত হয়; কিন্তু এই মিশ্রণে পদার্থ-দ্বয়ের কোন চিহ্নই থাকে না, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অভিনব লোহিত বর্ণ পদার্থে বিলীন হইয়া যায়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সম্বন্ধে কদাপি এরূপ ঘটে না। এই বিস্ময়কর রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বহু অংশ স্বীয় স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াও সকলে মিলিয়া এক হইয়াছে। সুতরাং এই অত্যদ্ভুত একত্ব ও সামঞ্জস্য কখনও রাসায়নিক শক্তির ফল হইতে পারে না।

অতঃপর যখন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করি, ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর ও অধিকতর বিস্ময়-কর একত্ব ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই; এখানে দেখি, বিষয় ও বিষয়ী মিলিয়া এক হইয়াছে, পার্থক্যের লেশমাত্র নাই। নির্জীব জড়রাজ্যে কোন বস্তুকে বহু অংশে বিভক্ত করিলেও প্রত্যেক অংশই এক পূর্ণ পদার্থ; কোন কাষ্ঠ খণ্ডকে কাটিয়া অসংখ্য অংশে বিভক্ত করিলেও প্রত্যেক অংশই পূর্ণ; কারণ তাহারা পরস্পরের বাহিরে, একের সঙ্গে অন্যের কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। উদ্ভিদ্ ও জীবদেহেরও ভিন্ন ভিন্ন অংশকে চিন্তাতে ভিন্ন বলিয়া ধারণা করা যায়; আমার হস্তকে আমি শরীর হইতে পৃথক করিয়া ভাবিতে পারি। কিন্তু আত্মজ্ঞানে, বিষয় বিষয়ীর মিলনে এরূপ চিন্তাও অসম্ভব; আপনাকে জানিতে হইলে অবশ্যম্ভাবিরূপে বিষয়কেও জানিতে হয়। জড় অপরিহার্য্য কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বহু আকার ধারণ করিতেছে; আত্মা স্বাধীন ভাবে বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে —আত্মা কখনও জ্ঞানী, কখনও প্রেমী, কখনও কর্ম্মী এবং এসকলই তাহার আত্ম শক্তির প্রকাশ। ঈদৃশী মহতী প্রকৃতি সম্পন্ন আত্মা কি কখনও কেবল সংযোগবিয়োগাত্মিকা জড়-শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? বস্তুতঃ কোন অনন্ত জ্ঞানে অবস্থিত এক পরম সুন্দর পূর্ণাদর্শ যে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টিরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহা স্বীকার না করিলে

জগতের কোন বস্তুর সহিত অপর কোন যোগ থাকে না, এবং এরূপ কোন আদর্শ আছে বলিয়াই জগতে এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য ও এত শৃঙ্খলা। জ্ঞানেতেই সকলের যোগ, জ্ঞান ব্যতিরেকে সকলই অসংলগ্ন ও বিশৃঙ্খল। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। এক দোকানে ইষ্টক আছে, আর এক দোকানে সুরকি আছে, আর এক দোকানে কড়ি আছে। ইহারা সকলেই বিক্ষিপ্ত ও অসম্বদ্ধ। কিন্তু যখনই অট্টালিকার আদর্শ মনে উপস্থিত, তখনই ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল,এবং আদর্শের সহিত যুক্ত হইল বলিয়াই ইষ্টক-কাষ্ঠ-সমম্বিত সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া চক্ষুর তৃপ্তি সম্পাদন করিল। জ্ঞানে যুক্ত না হইলে কি ইহা সম্ভব হইত?

৩। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের পেশী কম্পিত হয় বলিয়া মানসিক ক্রিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়ারই ফল, এ কথা প্রামাণ্য নহে। দুইটী ঘটনা এক সময়ে হয় বলিয়াই কি একটী অসম্ভাবিরূপে অপরটীর কারণ? কখনই নহে। যখনই কাকটী আসিয়া তাল বৃক্ষে বসিল, তখনই ফলটী পড়িল। ইহাতেই কি প্রমাণ হইল যে,কাকের উপবেশনই ফল পতনের কারণ? ইহা কি হইতে পারে না যে, ফল স্বাভাবিক নিয়মে সেই সময়েই পড়িত,ঘটনা ক্রমে ঠিক পতনের সময়েই কাক আসিয়া বসিল? বিশেষতঃ মস্তিষ্কের পেশীর কম্পনের সহিত মানসিক ক্রিয়ার যখন বিন্দু মাত্রও সাদৃশ্য নাই,তখন মানসিক ক্রিয়া যে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল, তাহা প্রামাণ্য নহে। এতদ্ব্যতীত জড়ের অস্তিত্ব যখন জ্ঞানসাপেক্ষ, তখন জ্ঞানময় আত্মা কখনও জড় মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল হইতে পারে না। জড় স্বীকার করিলেই, তাহার আধারস্বরূপ আত্মাকে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হয়। যে ক্রমোন্নতির নিয়মে মস্তিষ্কের উদয় হইয়াছে, জ্ঞানেতেই তাহার সম্ভাবনা এবং ইহার সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল; সুতরাং জ্ঞানবস্তু আত্মা কখনও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল হইতে পারে না।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (৩)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, বেদান্তদর্শন ব্রহ্মকেই এই জগতের উপাদান কারণ বা Material cause বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্তই যে অপেক্ষাকৃত উত্তম, তাহা আমাদের এই প্রবন্ধের বিগত দুই সংখ্যা যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। এইরূপে সুন্দর সুন্দর মীমাংসা আছে বলিয়াই বেদান্তের এত প্রশংসা। এই জন্যই বেদান্তদর্শন এক সময়ে এত popularity লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যাহা হউক, বিগত সংখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি যে, বেদান্তের ঐরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। সেই আপত্তিগুলির মধ্যে আমরা প্রধান প্রধান আটটী আপত্তির উল্লেখ ও মর্ম্ম প্রদান করিয়াছি। আজ সেই আপত্তিগুলির কোন সঙ্গত উত্তর আছে কি না, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, সৃষ্টি সম্বন্ধে আর দুই চারিটী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। হিন্দুদর্শন বহু বিস্তৃত।

এরূপ প্রবন্ধে সেই সমস্ত দুরূহ দার্শনিক-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং সংক্ষেপেই সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের বিদেশীয় ও ভারতীয় স্থূল স্থূল মত সমূহ প্রচারিত হয়, আমাদের এ সমস্ত প্রবন্ধ অবতারণা করিবার ইহাই উদ্দেশ্য। সে অভিপ্রায় কতদূর সিদ্ধ হইতেছে, বলিতে পারি না। দর্শনশাস্ত্র বড় কঠিন; বিশেষতঃ বঙ্গভাষায় দার্শনিক শব্দের পরিভাষা নাই বলিয়া, এই তত্ত্বগুলি বিশদরূপে বুঝাইতে অনেক সময়ে বড়ই বিব্রত হইতে হয়;—এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, এখন আমরা প্রকৃত কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি।

পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধে যে আটটী আপত্তির উল্লেখ করা গিয়াছে,এখন সেই আপত্তিগুলির উত্তর প্রদান করিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্নগুলির সংখ্যানুসারে, শ্রেণীবদ্ধ ক্রমে, উত্তরগুলি প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

(১) কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলেই যে, তাহার প্রত্যেকের এক একটী করিয়া প্রয়োজন থাকিতে হইবে, এরূপ কিছু নিয়ম নাই। যেমন কোন রাজা বা রাজামাত্যের কোনরূপ প্রয়োজনানুসন্ধান ব্যতিরেকেও ক্রীড়াবিহারাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদি কার্য্য,বাহ্যিক কোনরূপ প্রয়োজনান্তর অনুসন্ধান করিয়া প্রবৃত্ত হয় না,—উহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে,—সেইরূপ ঈশ্বরেরও, কোন প্রয়োজনসিদ্ধির অপেক্ষা না থাকিলেও, স্বভাবতঃ 'লীলা' রূপ প্রবৃত্তি হইবে,ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই জগৎ রচনা আমাদের নিকটে অতীব গুরুতর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু অপরিমিত শক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকটে ইহার গুরুত্ব কিছুই নাই। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক লীলা মাত্র। আর যদি সাংসারিক কার্য্যে লীলাদিতেও কোনরূপ সূক্ষ্ম প্রয়োজন থাকে; তথাপি ঈশ্বরে সেরূপ কোন প্রয়োজন থাকা অসম্ভব, কেন না তিনি পূর্ণকাম। অতএব এরূপ আপত্তি অসঙ্গত।

(২) সুখ দুঃখাদি বৈষম্য সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোনরূপ দোষ আসিতে পারে না। মঙ্গলময় বিধাতা কেন তোমাকে অনর্থক দুঃখ প্রদান করিয়া সংসারে প্রেরণ করিবেন? এবং নির্লিপ্ত পরমেশ্বর কেনই বা আর একজনকে সমস্ত সুখের ভাজন করিয়া পাঠাইবেন? এরূপ বৈষম্যের কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রাণীর "অদৃষ্ট"*। অতএব এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর।

(৩) বাহ্যিকসাধন না থাকিলেও, পদার্থ সৃষ্ট হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুগ্ধ ও জল, বাহ্যিক কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই, স্বভাবতঃই দধি ও হিমভাবে পরিণত হয়। যদি বল জলাদি, হিমাদিভাবে পরিণত হইতে, বাহ্যিক শীতলাদি সাধন বা কারণের অপেক্ষা করে; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না। শীতলাদি সহায় মাত্র; শীতলাদি দ্বারা, জলাদি শীঘ্র শীঘ্র হিমাদিভাবে পরিণত হয়, এই মাত্র। যদি দুগ্ধাদির, দধ্যাদিভাবে পরিণত হইবার স্বাভাবিক আন্তরিকশক্তি না থাকিত, তবে শীতলাদি সংযোগেও বলপ্রযুক্ত

* যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যায় নব্যভারতের আমাদের লিখিত "সুখদুঃখ" নামক প্রবন্ধ দেখুন্—প্রবন্ধলেখক।

কদাপি দধ্যাদিভাবে পরিণত হইতে পারিত না। সাধন-শক্তি দ্বারা, স্বাভাবিক শক্তির পূর্ণতা সম্পাদিত হয় মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তির পূর্ণতার জন্য বাহ্যসাধনের আবশ্যকতা নাই। কেননা তিনি সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ-শক্তিমান্। সুতরাং এ আপত্তিও টিকিতেছে না।

(৪) এরূপ আপত্তিও উত্থাপিত হইতে পারে না। যেহেতু, স্বপ্ন-দর্শন সময়ে, একই আত্মাতে নানাবিধ বিচিত্র বস্তুজাতের সৃষ্টি বা আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়েও, সেই আত্মার পূর্ব্ববিনাশ বা উপমর্দ্দ হয় না। পূর্ব্বেই দেখা হইয়াছে যে, স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া বস্তন্তরের উৎপত্তির নাম "বিবর্ত্ত"। সুতরাং এক অদ্বিতীয় চৈতন্যে জাগতিক নানাবিধ বস্তন্তরের উৎপত্তি কদাচ অসঙ্গত বা অসম্ভব নহে। আরও দেখ, একমাত্র অন্ন-রস হইতে রক্ত, কেশ, লোমাদি বিবিধ পদার্থ জন্মিতেছে এবং একমাত্র পৃথিবী হইতেই মহার্হ বৈদুর্য্যাদি মণি, মধ্যমার্হ সূর্য্যকান্তাদি ও হীনতম ও হীনমূল্য পাষাণাদি জন্মিতেছে। সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্ম হইতে বিবিধ বস্তু জন্মিবে ও বৈচিত্র্য হইবে, আশ্চর্য্য কি!

(৫) বেদান্তমতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্ম। জীবাত্মা জগৎস্রষ্টা নহে। ব্রহ্মের হিতকর বা অহিতকর কোন কার্য্য কর্ত্তব্য বা পরিহর্ত্তব্য নাই। কেননা,তিনি নিত্যমুক্ত। কিন্তু শরীরী জীবাত্মা সেরূপ নহে। বরং জীবাত্মাকে জগৎ স্রষ্টা বলিলে ঐরূপ আপত্তি প্রযোজ্য হইতে পারে। আকাশ ও ঘটাকাশের ন্যায়, ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ কল্পিত হয় মাত্র; কিন্তু জীব, বাস্তবিক ব্রহ্ম নহে। হিতাহিতাদি ভ্রান্তি মাত্র,উহা পারমার্থিক নহে। সুতরাং "ব্রহ্ম নিজের অহিত কেন করিবেন"—এরূপ উক্তিও ভ্রান্তিপূর্ণ।

(৬) এই যে 'ভোগ্য ভোক্তা' বিভাগ, ইহা ব্যবহারিক মাত্র। পরমার্থতঃ উহাদের কোনও বিভাগ নাই। সুতরাং পরমার্থতঃ অভিন্ন হইলেও, ব্যবহারিক অবস্থায়,ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ নষ্ট হইবে কেন? সমুদ্রের জল, ফেণ-তরঙ্গ-বুদ্বুদ-বীচী প্রভৃতি হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। তথাপি লোকে ঐরূপ পৃথক্ ভাবেই উহাদের "ব্যবহার" করিয়া থাকে। সুতরাং এই বিভাগ উপাধিজন্য মাত্র। অতএব অভিন্ন হইলেও ব্যবহারিক দশায় ভোক্তা ও ভোগ্য বিভাগ নষ্ট হইবে কেন? সুতরাং তোমার ঐ আপত্তি নিতান্ত অসঙ্গত।

(৭) কার্য্য, সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেমন কারণের সহিত একান্ত সম্পৃক্ত ছিল;—সৃষ্টির পরেও কার্য্য, সেইরূপ কারণের সহিত লগ্নই রহিয়াছে। কারণ ব্যতিরেকে, কার্য্যের পৃথক্ অস্তিত্ব সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলনা এবং সৃষ্টির পরেও থাকে না। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য "অসৎ"হইবে কেমন করিয়া* ? সত্য বটে, শব্দাদিহীন ব্রহ্ম, এই জগতের কারণ। কিন্তু তাই বলিয়া এই শব্দাদি বিশিষ্ট জগৎ, উহার কারণছাড়া হইয়া, কখনও ছিল না এবং এখনও বর্ত্তমান নাই। কেননা, কার্য্য ও কারণ সর্ব্বদাই এক ও অভিন্ন। আবার দেখ, কার্য্য কারণে মিশিলেই, কার্য্যের গুণ বা ধর্ম্ম কারণে লগ্ন হইবে কেন? কার্য্য, কারণে বিলীন হইলেও, স্বকীয়-ধর্ম্মদ্বারা কারণের দোষ উৎপাদন

* এ সমস্ত কথা আমরা "কার্য্য-কারণ বাদ" নামক অন্য এক প্রবন্ধে আরো বিশদরূপে বলিব, ইচ্ছা রহিল।

করায় না। ঘটশরাবাদি কার্য্য, উৎপত্তির পর উচ্চনিম্নাদিভেদে অবস্থিত থাকে ; কিন্তু উহারা ভাঙ্গিয়া—ধংশ হইয়া—যখন মৃত্তিকায় মিশিয়া যায়, কৈ তখন ত উহারা, উহাদের কারণীভূত মৃত্তিকায় কোন দোষ উৎপাদিত করে না। সুতরাং এই দ্বিবিধ আপত্তিই অকিঞ্চিৎকর।

(৮) এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণধর্ম্ম বিশিষ্ট। অর্থাৎ ব্রহ্ম শুদ্ধ ও চেতন এবং জগৎ অশুদ্ধ ও অচেতন। সুতরাং তুমি আপত্তি করিতেছ যে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারেন না ; কেন না বিকারে প্রকৃতির ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। এ নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না। চেতনপুরুষ হইতে তদ্বিলক্ষণ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট কেশ নখাদির উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অচেতন গোময়াদি হইতে তদ্বিলক্ষণ বৃশ্চিকাদি জন্মিয়া থাকে। তুমি বলিতেছ যে, উপাদান ও তাহার বিকার—এ উভয়ে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ সাদৃশ্য কিরূপ ? যদি আত্যন্তিক সাদৃশ্য বল, তবে প্রকৃতি-জ্ঞানবিকার, এই দুই কথাই থাকে না। কেন না, দুইই যদি অত্যন্ত সদৃশ হয়, তবে কে কাহার বিকার এবং কে কাহার উপাদান, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। আর যদি বল যে, বিকারে উপাদানের অত্যন্ত সাদৃশ্য না থাকুক, কিন্তু উভয়ে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকা চাই ;—অর্থাৎ জগতে ব্রহ্মের কোন না কোন গুণ বা ধর্ম্মের সত্বা থাকা আবশ্যক। আমি বলি, তা ত আছেই।—এই দেখ, আকাশাদিতে ব্রহ্মের সত্বারূপ ধর্ম্ম রহিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঐরূপ আপত্তি আপাতমধুর মাত্র।

অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব্বোত্থাপিত আপত্তি কয়েকটীর কোন মূল নাই। উহারা একান্ত অসঙ্গত। অতএব স্থিরীকৃত হইল যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ।

এতদূরে আমরা জগৎ-সৃষ্টির "কারণ" সম্বন্ধে ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত, এই দর্শন-ত্রয়ের মতগত ঐক্য ও পার্থক্য দেখিয়া আসিলাম। এখন এই ত্রিবিধ দর্শনের মতে সৃষ্টির "প্রণালী" সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া, অদ্য এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। এই প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যায় সৃষ্টি সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনের যেরূপ মত-বিশ্লেষ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই ন্যায়ের "প্রণালী" বুঝা যাইবে। এখন সাংখ্য ও বেদান্তের প্রণালী দেখা যাউক্।

সাংখ্যমতে সৃষ্টির প্রণালী এইরূপ ;—
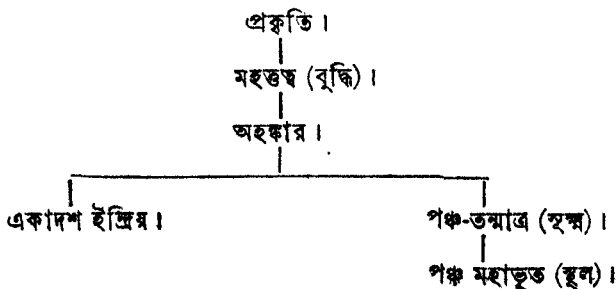
"সাংখ্যকার মূল প্রকৃতি হইতে পুরুষসান্নিধ্যে কিরূপে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহান্ (বুদ্ধিতত্ত্ব) উৎ-

পন্ন হয়। তৎপরেই এই মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকার উদ্ভূত হয়। এই অহঙ্কারের ষোড়শ পরিণাম হয়; তন্মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে ৫ স্থূলভূত সৃষ্ট হইয়াছে। এই অহঙ্কার অভিমানাত্মক। ইহা হইতে দুইরূপ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার রাজসিক অংশে ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। সর্ব্বশেষে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র তামস ও রাজসিক উভয়বিধ অহঙ্কার হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—ইহারাই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক্, পাণি, পায়ু, পাশ, উপস্থ—ইহারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়াত্মক। এই বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও ১০টী ইন্দ্রিয়—এই ১৩টীকে "করণ" বলে। প্রাণাদি ৫ বায়ু এই ত্রয়োদশ করণের সাধারণ ধর্ম্ম।"

বেদান্তকারমতে সৃষ্টি প্রণালী এইরূপ;—
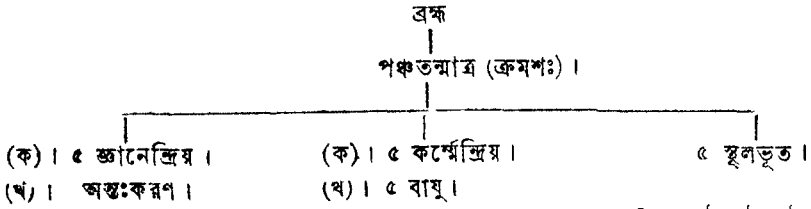
বেদান্তকারমতে মায়াশক্তিসহকৃত ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম) উৎপন্ন হয়। যথা,—প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে পৃথিবী। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টীর কি কি গুণ, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

তন্মাত্র	গুণ।
আকাশ	শব্দ।
বায়ু	শব্দ স্পর্শ।
অগ্নি	শব্দ স্পর্শ রূপ।
জল	শব্দ স্পর্শ রূপ রস।
পৃথিবী	শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ।

এই ভূত সকল ত্রিগুণময়ীর মায়ার পরিণাম বলিয়া ইহারাও ত্রিগুণময়। ইহারা যখন সত্ত্বগুণোপেত হয়, তখন ইহাদের হইতেই "পৃথক পৃথকভাবে" যথাক্রমে চক্ষুরাদি ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মে। আবার ইহাদেরই সত্ত্বগুণাধিক্যে এই ৫ তন্মাত্রে "একত্র মিলিত" হইয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত জন্মে। ইহাদিগকেই সমষ্টি ভাবে অন্তঃকরণ বলে। আবার রজোগুণ আধিক্য হইলেই এই ৫সূক্ষ্ম ভূত হইতেই পৃথকভাবে বাক্‌পণি প্রভৃতি ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও একত্রমিলিতভাবে,সেই রজোগুণাধিক্যেই, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান নামক ৫ বায়ু উৎপন্ন হয়। আবার তমোগুণের আধিক্যে ঐ ৫ সূক্ষ্মভূত হইতেই "পঞ্চীকৃত" ও স্থূলভূত জন্মে। পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম) হইতে এইরূপে পঞ্চীকৃত ৫ স্থূলভূত জন্মে, যথা:—

স্থূল আকাশ = ½ সূক্ষ্ম আকাশ + ⅛ সূক্ষ্মবায়ু + ⅛ সূক্ষ্মতেজ + ⅛ সূক্ষ্মজল + ⅛ সূক্ষ্ম পৃথিবী।

এইরূপ নিয়মে স্থূল বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টিও বুঝিতে হইবে (পঞ্চদশী, ২।২৬—২৭ শ্লোক দেখ)।

অতি সংক্ষেপে আমরা জগৎসৃষ্টির দার্শনিক "কারণ" ও "প্রণালী" দেখিয়া আসিলাম। প্রাচীনকালে ভারতীয় দর্শনকারগণ এইরূপেই ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ বুঝিয়াছিলেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব, দরিদ্র-বন্ধু মনোমোহন।

বিজয়ার মহা উৎসবময় অথবা মহাবিষাদময় দিন বঙ্গভূমিকে পরিত্যাগ করিতে না করিতে, বঙ্গে এই নিদারুণ হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে যে, বঙ্গের সুসন্তান মনোমোহন আর ইহজগতে নাই! ঘরে ঘরে হাহাকার এবং ক্রন্দনের রোল, দেশময় শোকের উচ্ছ্বাস! বিনা মেঘে বঙ্গে বজ্রাঘাত হইয়াছে!!

আজ এই দুর্দ্দিনে আমাদের ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা স্মরণ হইতেছে। তখন আমরা ভবানীপুর পড়িতাম এবং চেতলায় থাকিতাম। ভবানীপুর, চেতলা এবং কালীঘাট মক্কেলদিগের প্রধান আড্ডা। তখন হাইকোর্ট কলিকাতার বর্ত্তমান নূতন বাটীতে আইসে নাই, গড়ের মাঠের দক্ষিণ ধারে ছিল। এই সময়ে আমরা বালক। সেই বাল্যকালে, আমাদের সেই যৌবন-উষায় একজন মহামহিমান্বিত বাঙ্গালীর কথা সর্ব্বদা দরিদ্র, অসহায়, বিপন্ন মক্কেলদিগের মুখে প্রাতে ও সন্ধ্যায় শুনিতে পাইতাম। সেই মহাত্মা আমাদের পূজ্য, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও মহাত্মা কেশবচন্দ্রের কথা তারপর এবং তারও পর পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়াছিলাম। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র পাপী তাপীর কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতে, এবং বিদ্যাসাগর বিধবার অশ্রু মুছাইতে এই বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর মহাত্মা মনোমোহন যেন ন্যায়ের রাজ্য সংস্থাপন করিতে, প্রভাত-কালীয় নবীন সূর্য্যের ন্যায়, প্রতিভা-বিস্ফারিত, প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রে দরিদ্রের দুঃখ-কাহিনীর সহানুভূতি-অঞ্জন লেপন করিয়া এই বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এদেশে ব্যারিষ্টার হইয়া অনেকে বড় লোক হইয়াছেন, ভবিষ্যতে আরো হইতে পারেন। কিন্তু এ পথের প্রথম প্রদর্শক, আমাদের মনোমোহন। উকীল ব্যারিষ্টারের কাজ অতি সম্মানিত। দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ধনীদিগের ভীষণ অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে এবং বিচার-বিভ্রাটের তীব্র কশাঘাত হইতে উদ্ধার করিতে উকীল এবং ব্যারিষ্টার ভিন্ন আর কেহ নাই। মৃত্যুর করাল গ্রাস এবং দুর্ব্বিসহ রোগ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়া চিকিৎসক যদি পূজা পাইবার যোগ্য, তবে অন্যায় বিচারের নিপীড়ন হইতে, মিথ্যা মকদ্দমার তীব্র আঘাত হইতে লোকদিগকে মুক্ত করিয়া, আইন-ব্যবসায়ীগণ কেন পূজ্য হইবেন না, বুঝি না। এই এক শ্রেণীর প্রতি সর্ব্বদা অযথা নিন্দা বর্ষিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই নিন্দুকশ্রেণীও দায়ে ঠেকিলে আবার আইন-ব্যবসায়ীদিগের দ্বারস্থ হন। যত দিন দেশ রাজার অধীন, সমাজের অধীন, ততদিনই আইন, নিয়ম ও শাসন বিদ্যমান থাকিবে। যতদিন মানুষ হিংসাবিদ্বেষ ও কাম ক্রোধের অধীন, ততদিনই অত্যাচার উৎপীড়ন থাকিবে। যতদিন ন্যায়ের রাজ্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ না হইবে, ততদিনই আইন-ব্যবসায়ী থাকিবেন। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই আইনব্যবসায়ীর আবির্ভাব। জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া, মনোমোহন সাগরপারে যাইয়া, ব্যারিষ্টার হইয়া প্রথম এদেশে কাজ আরম্ভ করেন। একটী সুন্দর মহত্বের পথ খুলিয়া দিয়া মনোমোহন এদেশের যে উপকার করিয়াছেন, শ্রোতাই তাহা জানেন।

বিলাতে ব্যারিষ্টারি পদ অতি সম্মানের পদ। ইটালীতে এক সময়ে নব্য উকীলকে দরিদ্র মক্কেলদিগের জন্য টাকা না লইয়া খাটিতে হইত। মহাত্মা ম্যাটসিনিকেও এক সময়ে এই কাজ করিতে হইয়াছিল।* বুঝিবা স্বাধীনতা এবং ন্যায়ের সম্মান অপ্রতিহত প্রভাবে বজায় রাখিতে ব্যারিষ্টার ভিন্ন আর কেহ নাই! ভারতে আইন-ব্যবসায়ীগণই স্বাধীনতার গৌরব রাখিতেছেন। ভারতের কংগ্রেসের মূল আইন-ব্যবসায়ীগণ। কেবল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তহবিল পূর্ণ করার জন্য এই সম্মানিত ব্যবসায় নহে। দরিদ্রকে রক্ষা করা এবং বিপন্নকে উদ্ধার করার জন্যই ব্যারিষ্টারের সৃষ্টি। মনোমোহনের পদানুসরণ করিয়া পরে এদেশে অনেক ব্যারিষ্টার হইয়াছেন, তাঁহারা বিপুল ধন উপার্জ্জন করিয়া, জাতীয় ভাষা এবং ধর্ম্ম ভুলিয়া মহানন্দে দিগ্বিজয়ী গৌরবে প্রমত্ত হইয়াছেন, কিন্তু পরদুঃখমোচন, পরের উদ্ধার সাধনকে তাঁহারা ঘৃণা করেন—তাঁহারা মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করেন, কেবল অসার অর্থের খাতিরে। যে ব্যক্তি পরের উদ্ধার-সাধন-ব্রতে-ব্রতী হইয়াও তাহা করিল না, তাঁহার ন্যায় কৃপার পাত্র আর কে? এদেশের আইন-ব্যবসায়ীদিগের অনেকেই অর্থের গোলাম; সাধারণ কথা—"টাকা ঢালো, বিচার পাইবে, দরিদ্র হও, জেলে যাও, ঐ ফাঁশি-কাষ্ঠ তোমাদের জন্য!!" হায়, দরিদ্রদিগের উদ্ধার সাধন যে ব্যবসায়ের মূল মন্ত্র, তাহা এখন স্বার্থ-সাধনের অমোঘ অস্ত্র! মনোমোহন, বুঝি বা, দুঃখী, দরিদ্র এবং বিপন্নদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই এই সম্মানিত আইন-ব্যবসা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি লিন্কন্-ইনে ব্যারিষ্টাররূপে বরিত হন। তৎপর দেশে প্রত্যাগমন করেন। আমরা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা স্মরণ করিতেছি। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই মনোমোহনের নাম বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ছুটিয়াছে! নিপীড়িত ব্যক্তিগণ শুনিয়াছে, এই বঙ্গে এক ন্যায়ের অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়াছে—দরিদ্রদিগকে, অত্যাচার এবং অবিচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে এক মহাত্মা অভ্যুদিত হইয়াছেন। দলে দলে পল্লী হইতে দরিদ্র মক্কেল আসিতেছে—দলে দলে লোক মনোমোহনের বাড়ীতে ছুটিতেছে। সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। দেনা পাওনার কোন কথা নাই, মনোমোহন দরিদ্রদিগের জন্য অক্লান্ত অন্তরে পরিশ্রম করিয়া কত জনকে উদ্ধার করিতেছেন। মৃত্যু ও নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত কত পিতা-পুত্র, ভাই বন্ধু যে তাঁহার দয়ায় উদ্ধার পাইয়াছে, তাহার ইতিহাস কে লিখিতে পারে? পত্রিকায় দুটী চারিটী মকদ্দমার কথা উল্লিখিত হইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস,—শত শত মকদ্দমার কথা অলিখিত এবং অকথিত রহিয়াছে। দরিদ্র পল্লীর মৃণ্ময়, পত্রময় প্রাচীর মধ্যে অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-অক্ষরে তাহা লিখিত রহিয়াছে। মনোমোহন নাম, দরিদ্রের গৃহে, সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপে মনোমোহনের নাম শুনিয়া আমরা যেন সুপ্তোত্থিত হইয়াছিলাম।

* "The first two years of a young advocate's life in Italy, in those days, were spent in the Ufficio dei Poveri, where they pleaded gratis the causes of the poor. During the short time that Mazzini performed that office, he distinguished himself by the patient attention he gave to the often wearisome details of his duty; the zeal with which he entered into the cases of his poor clients, his logical accuracy, quick and ready wit, and extraordinary facility of language and illustration."

দরিদ্রের জন্য খাটে, দরিদ্রের জন্য ভাবে—দরিদ্রকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়, এমন লোকও এ দেশে আছে? আমাদের মনে, যৌবন-উষায়,এই প্রশ্ন সমুদিত হইল। মনোমোহনের গুণ স্মরণ করিয়া, কি এক আশ্চর্য্য শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যেন আমরা জীবন-পথে অগ্রসর হইলাম। আর আজ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ অংশে সেই মহাত্মার গুণ স্মরণ করিয়া অশ্রুতে ভাসিতেছি। এই ২৭ বৎসর আমরা মনোমোহনের অকথিত এবং অলিখিত গুণ স্মরণ করিয়া আসিতেছি। এ দেশের অনেক মহৎলোকের সহবাস লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা,দেবেন্দ্র নাথের গভীর বিশ্বাস, কেশবচন্দ্রের ভক্তি, বিদ্যাসাগরের দয়া, এ সকলের পবিত্র সহবাস-লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—নিন্দা অল্পাধিক সকলেরই শুনিয়াছি,কিন্তু মনোমোহনের তেমন নিন্দা শুনি নাই। সদা প্রফুল্ল,মাতৃভক্ত,ভ্রাতৃবৎসল মনোমোহন বুদ্ধি এবং প্রতিভার রাজা, জাতীয় মহাসমিতির অন্যতর নেতা, দরিদ্রের পরম বন্ধু। মনোমোহন বঙ্গের সকলেরই যেন প্রিয়। এমন সুকৃতি যে জননীর সন্তানের, সে জননী ধন্যা!

মনোমোহন কাহার ছিলেন,এবং কাহার ছিলেন না? তিনি কি কেবল দরিদ্র মক্কেলদিগের আশ্রয় ছিলেন? না—তাহা নহে। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বেথুন বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন; স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য আজীবন ভাবিয়াছেন এবং খাটিয়াছেন। জাতীয় মহাসমিতি এবার কলিকাতায় বসিবে; মনোমোহনের অভাব সকলের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিবে। গতবার যখন কলিকাতায় বসিয়াছিল, তখন তিনি অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হইয়া সকল প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করিয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এবার তাঁহাকে হারাইয়া,জাতীয় মহাসমিতি বঙ্গের অযোধ্যা নাথ-হারা হইলেন। জাতীয় মহাসমিতিতে তাঁহার ন্যায় স্বদেশপ্রিয়,মিষ্টপ্রকৃতি, বাঙ্গালী নেতা আর কে রহিলেন? ব্যারিষ্টার বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃদ্বেষী—ইংরাজিতে বলেন, ইংরাজি মতে আহার করেন,ইংলণ্ডে তাঁহার বিহার। তিনি বাঙ্গালা ভাষার বিদ্বেষ্টা,বাঙ্গালা আচার ব্যবহারের ঘোরশত্রু,তাঁহাকে যদি মহাসমিতির বাঙ্গালী-নেতা বল,আমরা তাহাতে সায় দিই না। পাঁচ কোটী দরিদ্র বাঙ্গালীর দুঃখের কথা যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না, তাহাকে বাঙ্গালার নেতা বলিতে পারি না। মনোমোহন ধনে ও গুণে,দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় এবং অধ্যবসায়ে,মিষ্ট ব্যবহারে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন, দয়ায়, মমতায় ও সহানুভূতিতে সকলের বন্ধু ছিলেন। বাহিরে সাহেবী পোষাক,অন্তরে কিন্তু খাটী বাঙ্গালী। তিনি যখন যে কাজে হাত দিয়াছেন, ফিলিপের অত্যাচার বা মণিপুরের বিচার-বিভ্রাট-নিবারণ চেষ্টা,সে সকল কাজের জন্যই প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে সকল শ্রেণীর পত্রিকা সমাদর পাইয়াছে। যে পত্রিকা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে,তিনি তাহা যত্নে রক্ষা করিয়াছেন। বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর এমন বন্ধু কি আর আছে? এমন বন্ধু কি আর মিলে? পাওনিয়ার হইতে কাশীপুরনিবাসী পর্য্যন্ত * তাঁহার টেবেলে শোভা পাইত। তিনি সম্পাদক এবং বন্ধুবর্গকে সাহায্য করা জীবনের মহাব্রত মনে করিতেন। মাইকেলের সন্তানদিগের জন্য তিনি যাহা, করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি

* Indian Mirror, 20th Oct. 1896

কি কেবল মক্কেলদিগের ছিলেন? না—তাহা নহে। তিনি সকলের। তিনি পরিবারের, পিতামাতার, ভাই ভগ্নীর,পুত্র কন্যার যেমন—তিনি আমাদের সকলের তেমনি। তিনি মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, এবং বন্ধুর অনুরক্ত। বঙ্গের দরিদ্র মক্কেলের তিনি, বঙ্গের মহিলাগণের তিনি, জাতীয় মহাসমিতির তিনি। সংবাদপত্রের অকৃত্রিম বন্ধু তিনি। যাঁহারা বিলাত প্রত্যাগত হইয়াছেন, মনোমোহনের গৃহ তাঁহাদিগের নিজ গৃহ। তিনি বঙ্গের গৌরব—তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

দেশের প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি কে? যাঁহারা জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান, এবং যাঁহারা তাঁহাদিগের রক্ষক, আমাদের মতে তাঁহারাই প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি। বহুবার আমরা লিখিয়াছি যে, জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ভিন্ন এই ধরায় কোন জাতির উন্নতি হয় নাই। আমাদের দীনা বাঙ্গালা-ভাষার উন্নতির জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, সেই মহিমান্বিত, সাধারণের উপেক্ষিত,দেশের নগণ্য ব্যক্তিগণ আমাদের প্রণম্য এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে ঘোর দরিদ্রতার হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছেন,তাঁহারাও প্রণম্য। মনোমোহন জাতীয় ভাষার সেবা করেন নাই—কিন্তু গ্রন্থকারদিগকে, সম্পাদকদিগকে সাহায্য করিয়া প্রকারান্তরে জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি আমাদের দেশের প্রকৃত বন্ধু।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মহর্ষির ভবনে একত্রে থাকিতেন, একত্রে বিহার করিতেন। এই সময়ে (১৮৬১ খ্রীঃ)তিনি পাক্ষিক মিরার বাহির করেন। * তারপর দুই বন্ধু একত্রে বিলাত গমন করেন(১৮৬২খ্রীঃ)। এই সময়েই বুঝিবা, দেশ-সংস্কার ব্রতে তিনি ব্রতী হন। বাল্য বিবাহ যাহাতে বঙ্গ হইতে উঠিয়া যায়, তজ্জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন এবং নিজ পরিবার সেই ভাবে গঠন করিয়াছেন। জাত্যভিমান ডুবাইয়া নিজে বিলাত গিয়াছেন, ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন,এবং এ দেশের কত ব্যক্তিকে বিলাত-গমনে উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়াছেন। তিনি একজন প্রধান সমাজ-সংস্কারক।

মহাজনের জীবনী বিশ্লেষ করিলে কি পাওয়া যায়? এখানে মহাসমরের বিবরণ নাই,রাজ্যাভিষেকের উজ্জ্বল বর্ণনা নাই,আছে কি? থাকে কি? কেবল চরিত্র,দয়া,দাক্ষিণ্যপূর্ণ অশেষ কার্য্যরাশি-সম্বলিত মহা জীবন। তাহার বর্ণনা কোথায় পাওয়া যায়? কেবল লোকের জীবনে—যাঁহারা তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের চরিত্রে। ম্যাট্‌সিনি অমর—কোন দুই চারিটী ঘটনায় নহে, পার্কার অমর কোন যুদ্ধে নহে;—তাঁহারা কেবল অসংখ্য সৎকাজের দ্বারা লোকের জীবনে জীবিত। বংশ পরম্পরায় যতদিন মানবদেহে রক্তবিন্দু চলিতে থাকিবে, তাঁহারা ততদিন অমর। লোক পরম্পরায়, বংশপরম্পরায় পার্কার, ম্যাট্‌সিনি যেরূপ অমর,আমাদের বংশ পরম্পরায়, সেইরূপ,—এই হতভাগ্য বঙ্গে—রামমোহন,বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ও রামগোপালের পার্শ্বে, তেমনই, চিরদিন, মনোমোহন অমর হইয়া থাকিবেন। তাঁহার বিচার এবং শাসন বিভাগ পৃথক করা সম্বন্ধীয় যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ এবং মণিপুর সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পুস্তিকার জন্য নহে—কিন্তু পরদুঃখ-মোহনের গভীর সহানুভূতির জন্য তিনি

* Unity and the Minister, 25th Oct. 1896.

এদেশে অমর হইয়া থাকিবেন। পরদুঃখ-কাতর,ধীর,স্থির, সংযত, প্রফুল্ল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবিচলিত-চিত্ত এবং প্রতিভা-মণ্ডিত মনোমোহনমূর্ত্তি বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে অক্ষয় ও অচল কৃতজ্ঞতার-সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

তিনি ত অমর হইলেন, আর হতভাগ্য বঙ্গদেশ? বঙ্গের উপায়? এই হতভাগ্য বঙ্গ কেবল কাঁদিতেই জন্মেছে। অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের শোক নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে,—তাঁহাদের চিতার আগুন নিবিতে না নিবিতে, আবার নবদ্বীপ, প্রজ্জলিত চিতার মহা অগ্নি এই বঙ্গে প্রজ্বলিত করিলেন!!

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে যে মহাত্মা, ঢাকার অধীন বয়রাগাদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিগত ২রা কার্ত্তিক, ১৭ই অক্টোবর,শনিবার, সেই মহাত্মার চিতা প্রজ্জলিত করিয়া নবদ্বীপ বঙ্গে নিদারুণ শোক-কালিমা লেপন করিলেন! হা বঙ্গদেশ, তোমার এই গভীর দুঃখ কে বুঝিবে? তুমি অতি কষ্টে, বহু তপস্যায় যে মহা রত্ন লাভ করিয়াছিলে, তাহার সমতুল্য রত্ন আর কি পাইবে? যাহা গিয়াছে, বুঝি বা এ বঙ্গে তাহা আর মিলিবে না। বিধাতা শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তি বর্ষণ করুন। তাঁহার মহান ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ভারতের দারিদ্র্য। (১)*

ভারতের দিন দিন অবনতি হইতেছে। এই অবনতির প্রধান কারণ দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের কারণ কি, ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় আছে কি না, তাহা আমাদের সকলেরই বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কয়জন সে কথা বুঝিতে পারেন, অথবা বুঝিতে চেষ্টা করেন?

যাঁহারা ভারতের হিতৈষী, যাঁহারা ভারতের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করেন, অথবা ভারতের উন্নতির উপায় চিন্তা করেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, এই ভীষণ দারিদ্র্যের প্রতিবিধান ব্যতীত ভারতের উন্নতির উপায় নাই। দাদাভাই নাওরোজী-প্রমুখ কয়েকজন ভারতের সুসন্তান এই কথা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু যে কারণে ভারত দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, যে কারণে ভারত-সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ, সংক্রামক পীড়ায় জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, যে কারণে ভারত দুর্ভিক্ষের লীলাভূমি হইয়া ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে—তাহার প্রতিবিধান করা মানুষের সাধ্যের অতীত হইয়া পড়িয়াছে। বুঝি, বিধাতার বিশেষ বিধান ব্যতীত সে দারুণ দারিদ্র্য দূর হইবার উপায় নাই।

যাহা হউক, যাঁহারা ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের এই ভীষণ দারিদ্র্যের প্রতিবিধানকল্পে কোন উপায় আছে কিনা, তাহা চিন্তা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আর সেই জন্য এই দারিদ্র্যের কারণ কি, তাহাও বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য। পৃথ্বীশ বাবু ভারতের সুসন্তান। তিনি ভারতের দারিদ্র্য সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই সকল বিষয়ের বিশিষ্ট আলোচনা করিয়া-

* The Poverty Problem in India by Prithwis Chandra Roy; Thacker, Spink & Co.

ছেন। তাঁহাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বড়ই উপকৃত হইয়াছি।

দুঃখের বিষয়, তাহার এই পুস্তক ইংরাজী ভাষায় লিখিত। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাহারা এই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে বঞ্চিত হইবেন। এজন্য আমাদের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার পুস্তকের সারাংশ লইয়া ভারতের দারিদ্র্য বিষয়ক সমস্যার আলোচনা করিব। কিন্তু, সংক্ষেপে সে আলোচনা সম্ভব নহে। বিষয় বড়ই গুরুতর। যাহা হউক, সংক্ষেপে আমরা সে সম্বন্ধে দুই এক কথা এস্থলে উল্লেখ করিব মাত্র। এবং তাহা বুঝিবার জন্য প্রথমে অর্থ শাস্ত্রের দুই একটী মূল সত্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মানুষের তিনটী মূল বৃত্তি আছে ;—জ্ঞান বৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি। এই তিনের উপযুক্ত অনুশীলন ও উন্নতির দ্বারা মানুষের উন্নতি হয়। অতএব মানুষের উন্নতির জন্য জ্ঞানের উন্নতি করিতে হয়, কর্ম্মবৃত্তি বিশেষ স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধি করিতে হয়, আর দুঃখের পরিমাণ হ্রাস করিয়া সুখের বা আনন্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। মানুষের সমষ্টিতেই জাতি সংগঠিত। অতএব কোন জাতি বা সমাজের উন্নতি করিতে হইলে, সেই জাতীয় মানব সমষ্টির জ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নতি করিতে হয়, কর্ম্মবৃত্তির অনুশীলন ও উন্নতি করিতে হয়, আর চিত্তবৃত্তির অনুশীলন ও উন্নতি করিতে হয়।

জ্ঞানের উন্নতিতে ধর্ম্ম ও দর্শন এবং বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। কর্ম্মবৃত্তির উন্নতিতে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও জাতির রক্ষার উপায়ের উন্নতি হয়। আর প্রধানতঃ সুকুমার বিদ্যার উন্নতিতে জাতীয় সুখস্বচ্ছন্দের বৃদ্ধি হয়। যে জাতি পূর্ণরূপে উন্নত, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি, জাতি রক্ষার উপায় বা রাজনীতি এবং সুকুমার বিদ্যা, এ সকলই বিশেষরূপে অনুশীলিত ও পরিণত। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কোন জাতি এতদূর উন্নত হয় নাই—যাহাদের এই সকল গুলিই পূর্ণরূপে অনুশীলিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। প্রাচীন আর্য্যজাতি কতক পরিমাণে এই আদর্শে উন্নত জাতি ছিল, ইহা বলিতে পারা যায়। সাধারণতঃ কোন এক বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়াই জাতি বিশেষের উন্নতি হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীসে দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। প্রাচীন রোমে রাজনীতির বিশেষ উন্নতি ছিল। আধুনিক ইতালীতে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। ইংলণ্ড বাণিজ্যবলে উন্নত।

যেমন কোন বিশেষ জাতি—কোন বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়া থাকে, তেমনি যুগবিশেষে, ইহার কোন বিশেষ বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করে। বর্ত্তমান যুগ বাণিজ্য-প্রধান। যে জাতি বাণিজ্যে বড়, সেই জাতি এখন সর্ব্ব প্রথম হইয়াছে। অতএব এই যুগে জাতীয় উন্নতির জন্য বাণিজ্যের উন্নতির প্রয়োজন। কিন্তু এস্থলে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা অন্যদিক হইতে এই জাতীয় উন্নতির মূল কারণ অনুসন্ধান ক— চেষ্টা করিব।

মানুষ, শক্তিকেন্দ্র। সেই শক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ইচ্ছা শক্তিরূপে অভিব্যক্ত। সেই শক্তি যদি কেবল মানুষের নিজের বৃদ্ধি ও পোষণ জন্য ব্যয়িত হয়, তবে তাহার দ্বারা সেই মানুষের নিজের উন্নতি মাত্র হইতে পারে। কিন্তু যদি নিজের উন্নতি করিয়াও,

আরও শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই শক্তি সঞ্চয় দ্বারা ক্রমে মানুষ আরও উন্নত হয়— অন্যকে উন্নত করে। যে মানুষের শক্তি যত অধিক, সেই পরিমাণে তাহার মনুষ্যত্ব তাহার মহত্ত্ব। তবে শক্তির অপব্যয় করিলে অন্য কথা। এ স্থলে আমরা কেবল কর্ম্ম শক্তির কথাই আলোচনা করিব।

এই কর্ম্ম-শক্তি বলে মানুষ কর্ম্ম করিতে পারে। এই কর্ম্মশক্তি আমাদের জ্ঞান ও ইচ্ছা-শক্তি চালিত। এই কর্ম্মশক্তি বলে মানুষ আপনার রক্ষণ ও পোষণ জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করে। বলিয়াছিত,সেই কর্ম্ম কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আত্মরক্ষা ইত্যাদি। আমরা এস্থলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিষয়ই উল্লেখ করিব।

মানুষের জীবন রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। মানুষ অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্যতর অবস্থায় আসিলে কৃষি গোরক্ষণাদি দ্বারা সেই খাদ্য সংগ্রহ করে। খাদ্য ব্যতীত মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুর প্রয়োজন হয়। মানুষ তাহা শিল্প দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লয়। সুতরাং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ চেষ্টা হইতে মানুষের কর্ম্মশক্তির বিকাশ হয়। মানুষ যদি সমাজবদ্ধ না হইয়া একাকী থাকিত, তবে তাহাকে একাই পরিশ্রম দ্বারা তাহার জীবনযাত্রা উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইত। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যে কার্য্য বিভাগ হইয়াছে। কেহ কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্য উৎপাদন করে। কেহ বস্ত্র বয়ন করে। যে কৃষিকার্য্য উৎপাদন করে, সে শস্যের বিনিময়ে অন্যের নিকট বস্ত্র গ্রহণ করে। এইরূপে সমাজে বিনিময় প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিনিময়ের সুবিধার জন্য টাকার প্রয়োজন। যে শস্য উৎপাদন করে,তাহার বস্ত্রের প্রয়োজন, কিন্তু যে বস্ত্র প্রস্তুত করে, তাহার শস্যের প্রয়োজন নাই। সে অবস্থায় বিনিময় চলে না। কিন্তু যদি শস্য বা বস্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে, তবে শস্য উৎপাদনকারী কৃষক মূল্য দিয়া বস্ত্র কিনিয়া লয়। আর সেই মূল্য দিয়া পরে আবশ্যক মতে বস্ত্র-প্রস্তুতকারী তন্তুবায় শস্য কিনিতে পারে। এইরূপে সমাজমধ্যে টাকা দিয়া দ্রব্যাদির খরিদ বিক্রয় প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এখন মনে করা যাউক,আমার যতটুকু কর্ম্ম শক্তি আছে, তাহার দ্বারা কৃষি বা কোনরূপ শিল্পকর্ম্ম করিয়া আমি যথা শক্তি শস্য বা বস্ত্রাদি উৎপাদন করিলাম। আমার প্রয়োজন মত শস্য বা বস্ত্র রাখিয়া বাকী শস্য বা বস্ত্র বিক্রয় করিলাম। বিক্রয় করিয়া আমার যে টাকা আয় হয়, সেই টাকা দিয়া আমার জীবনযাত্রার উপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া কিছু টাকা অবশিষ্ট রহিল। সেই টাকা আমার সঞ্চয় হইল। আমি যদি পীড়া বা অন্য কোন কারণে কোন সময় পরিশ্রম করিতে না পারি, তবে সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে সেই সময় আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব। আবার অর্থ সঞ্চিত হইলে আবার কতকগুলি সখের জিনিস প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে তখন আমি সেই সকল সখের জিনিস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব।

অতএব কর্ম্ম শক্তি পরিচালনা করিয়া আমরা জীবনযাত্রার উপযোগী খাদ্যাদি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লই। আর কর্ম্ম শক্তির সমধিক স্ফূর্ত্তি হইলে সেই শক্তি পরিচালনা দ্বারা, আমরা সেই সকল দ্রব্য সংগ্রহ অপেক্ষা

অধিক পরিমাণে কর্ম্ম করিতে পারি। যে কর্ম্ম অধিক করি,তাহাই সঞ্চিত হয়। যদি এরূপ অধিক কর্ম্ম না করি, তবে কেবল মাত্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। আর তাহারও উপযুক্ত পরিমাণে কর্ম্ম না করিতে পারিলে, আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কর্ম্মশক্তি পরিচালনা দ্বারা আমি যাহা উৎপাদন করি, তাহার মধ্যে আমার প্রয়োজন মত সেই উৎপন্ন দ্রব্য রাখিয়া বাকী সমুদায় বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করি। সেই অর্থ দ্বারা আমার অন্য প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি ও যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সঞ্চয় করিতে পারি। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, অর্থ এইরূপে আমাদের কর্ম্মশক্তির পরিমাপক। আমরা নিজের জন্য বা নিজ প্রয়োজন সাধন জন্য যে পরিমাণে পরিশ্রম বা কর্ম্মশক্তির ব্যয় করি, তাহা অপেক্ষা অধিক কর্ম্ম শক্তি ব্যয় করিলে বা পরিশ্রম করিলে, সেই পরিশ্রম অর্থ রূপে আবার সঞ্চিত হইতে থাকে। পরিশ্রম যত অধিক হয়, ততই সঞ্চয় অধিক হয়।

মানুষ বিশেষের যে নিয়ম—জাতি সম্বন্ধেও সেই, নিয়ম—কেননা ,মানুষের সমষ্টি লইয়াই জাতি সংগঠিত। যে জাতি যত অধিক পরিশ্রমী হয়, সেই জাতি তত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে। যে জাতির সেই সঞ্চিত পরিশ্রমের দ্বারা জাতীয় অর্থের বৃদ্ধি হয়, সে জাতির উন্নতি হয়। যে জাতি অল্প পরিশ্রমী, সে জাতির অবনতি হয়, সে জাতি ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে।

ভারত-সন্তান সাধারণতঃ ক্রমে অলস হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান ভারত এখন তামস-ভাবাপন্ন। নিদ্রা, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি তামস প্রকৃতিযুক্ত লোকের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। আমরা এক্ষণে তামসিক প্রকৃতি যুক্ত হইয়া পড়িতেছি বলিয়া আমরা অলস হইয়া যাইতেছি। ইহাই আমাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় কথা, আমার আহার্য্য প্রভৃতি সংগ্রহ জন্য পরিশ্রম যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ ভূমিরও প্রয়োজন। আমাদের প্রধান খাদ্য ভূমিজ। আমরা যে মাংস ভক্ষণ করি,তাহাও এক হিসাবে ভূমিজ—কেননা, সে সকল জীব ভূমিজ খাদ্য ভক্ষণেই বর্দ্ধিত হয়। আমাদের সেইজন্য ভূমির প্রয়োজন। কৃষকের ক্ষেত্র প্রয়োজন। পশুরক্ষা ও পশুপালন জন্য ভূমির প্রয়োজন। আবার যাহারা শিল্পী—তাহাদের ভূমির প্রয়োজন। কেননা, ভূমিজ উপকরণ দ্বারাই শিল্প সম্ভব। ক্ষেত্র হইতে কার্পাস উৎপাদন না করিলে বস্ত্র বয়ন চলে না। সকল শিল্প সম্বন্ধেই এই কথা।

অতএব আগে ভূমি না পাইয়া আমাদের পরিশ্রম করিবারও উপায় নাই। ভূমি পাইতে হইলে যদি কর দিতে হয়, তবে সেই অর্থ আমাদের পরিশ্রমের ফলে সঞ্চিত বলিয়া, পরিশ্রম দ্বারাই আমাদের ভূমি সংগ্রহ করিতে হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। অতএব ভূমি পাইতে হইলে কতক পরিমাণে সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় করিতে হয়। যেখানে ভূমির কর অধিক, সেই জন্য, সেখানে দারিদ্র্যের কারণ বর্ত্তমান থাকে। যে সকল কৃষকের পরিশ্রম শক্তি অধিক নহে, তাহারা ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না। তাহাদের উপযুক্ত রূপে আহার সংগ্রহ হয় না।

তাহার পর অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে অন্য কথা।

বুঝিতে হইবে। মনে করা যাউক, আমি পরিশ্রম করিয়া—কর্ম্ম-শক্তি ব্যয় করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছি, তুমি বস্ত্র বয়ন করিতেছ। আমাদের শস্য-বিনিময় দ্বারা পরস্পরের অভাব পূরণ হইতে পারে। কিন্তু যদি আমরা উভয়েই বস্ত্র বয়ন করি বা উভয়েই কেবল শস্য উৎপাদন করি, তবে আমরা উভয়েই অভাব যুক্ত হইব। হয় বস্ত্রের অভাব হইবে, না হয় শস্যের অভাব হইবে। অতএব সমাজ মধ্যে উৎপাদন এরূপ ভাবে নিয়মিত হওয়া আবশ্যক যে, এরূপ গোলযোগ না হয়। উপযুক্ত কর্ম্ম বিভাগ ও বর্ণ বা জাতি বিভাগ দ্বারা সে গোলযোগ দূর হইতে পারে। এই কর্ম্ম ও বর্ণ বিভাগ রাজার দ্বারা, সমাজের দ্বারা বা ধর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে। অথবা অবাধ প্রতিযোগিতা দ্বারা তাহা ক্রমে ক্রমে নিয়মিত হয়। কিন্তু এই বিভাগ ধর্ম্মভিত্তির উপর স্থাপিত হইলেই ভাল হয়। অবাধ প্রতিযোগিতার ফল কখন শুভ হয় না। সে বিষয় এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

ভারতে অবাধ প্রতিযোগিতা অধিক নাই। সুতরাং সেই কারণে ভারতের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে যে তামসিক শক্তি বিকাশের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার স্থলে স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা আমাদের অবনতির এক কারণ।

কিন্তু ভারতের দরিদ্রতার যাহা মূল কারণ, তাহা স্বতন্ত্র। সে কারণ—ভারতের অধীনতা। বিদেশীয় রাজার অধীনতায় ভারত দিন দিন অবনত হইতেছে। তাহারই ফলে ভারতের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে। যে ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রসূ বলিয়া বিখ্যাত, তাহা এখন দারিদ্র্যের ক্রীড়াভূমি। বিদেশীয় রাজনীতি, বিদেশীয় অর্থনীতির ফলে ভারতের দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

বিলাতী মূলমন্ত্র স্বার্থ। বিলাতী পণ্ডিতগণের অর্থশাস্ত্র এই স্বার্থের উপর সংগঠিত। কুক্ষণে ডারউইন সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, প্রতিযোগিতাই উন্নতির মূল সূত্র, তিনি কুক্ষণে বুঝাইয়াছিলেন, "in the struggle for existence the fittest only survives." তিনি স্বার্থকেই কর্ম্মচেষ্টার মূলসূত্র "struggle for self existence" প্রতিপন্ন করিয়া যে মহা অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহা কত দিনে নিবারণ হইবে, কে বলিতে পারে? জগতে বাস্তবিক কর্ম্মের মূলসূত্র দুইটী, struggle for self-existence এবং struggle for existence for others. স্বার্থ ও পরার্থ বৃত্তি চালিত হইয়াই জীব কর্ম্ম চেষ্টা করে। জীব নিজের আহার অন্বেষণ জন্য স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু জীব অন্যদিকে আবার জাতিরক্ষণ জন্য বংশরক্ষা জন্য আত্মত্যাগ করে। নিজ বংশরক্ষা জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থ কর্ম্ম করে। এইজন্য, এই পরার্থ বৃত্তিকে এক অর্থে মাতৃশক্তি বলা হয়।

মানুষে এই পরার্থ বৃত্তি বিশেষ পরিস্ফুট। আর এই পরার্থ বৃত্তির প্রাধান্য জন্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই জন্য যে প্রকৃত মানুষ, সে স্বার্থ অপেক্ষায় পরার্থ-বৃত্তি চালিত হইয়াই কর্ম্ম করে। যে বলবান সে দুর্ব্বলকে ধ্বংস করে না, সে দুর্ব্বলকে রক্ষা করে। দুর্ব্বল শিশুকে পিতা মাতা যেমন নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াও রক্ষা করে, তেমনই দুর্ব্বল প্রতিবেশীকে বলবান নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া রক্ষা করে।

যে জাতির মধ্যে এই পরার্থবৃত্তির অধিক স্ফূর্ত্তি হয়, সেই জাতিই উন্নত হয়। কিন্তু এস্থলে সে কথা আলোচ্য নহে।

বিলাতী পণ্ডিতেরা এই পরার্থবৃত্তি স্বীকার করেন না। বিলাতী অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত প্রতিযোগিতাকেই মূলমন্ত্র মনে করেন। তাঁহারা এই পৃথিবীকে মহাসমরক্ষেত্র মনে করেন। তাঁহাদের মতে—সবলের সহিত সর্ব্বদাই দুর্ব্বলের সংগ্রাম চলিতেছে। সবল দুর্ব্বলকে পরাস্ত করিয়া শেষে ধ্বংস করিতেছে। যিনি বিলাতী অর্থশাস্ত্র পড়িয়াছেন, তিনি জানেন যে, তাহার অক্ষরে অক্ষরে এই মূলমন্ত্র নিহিত রহিয়াছে।

এই মূলমন্ত্র অনুসারেই ইংলণ্ড তাহার অধীনস্থ দেশকে শাসন করেন। সুধু ইংলণ্ড কেন, সমস্ত ইউরোপ মহাদেশেই এই কথা। ইংরাজ এখন প্রবল জাতি। ইংরাজের কর্ম্মশক্তি বিশেষ পরিস্ফুট। ইংরাজের মত কর্ম্মবীর এখন কে আছে? এই কর্ম্মশক্তির অনুশীলন দ্বারা ইংলণ্ড ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। এবং তাহার ফলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। সেই সঞ্চিত অর্থকে ইংলণ্ড আবার কর্ম্মশক্তিতে পরিণত করিতেছে। সেই অর্থবলে কত কলকৌশল সৃষ্টি হইয়াছে। এই অর্থ বলেই ষ্টীম এঞ্জিন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একটী ষ্টীম এঞ্জিন কত লোকের বল ধরে? এইরূপ কত ষ্টীম এঞ্জিন কত কারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং ইংলণ্ডের কর্ম্মশক্তি এক্ষণে কত যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় কয়টী জাতি সমর্থ হইতে পারে? কাজেই ইংলণ্ড এখন সর্ব্বগ্রাসী হইয়া বসিয়াছে। ইংলণ্ড আমাদের শিল্প গ্রাস করিয়াছে—বাণিজ্য গ্রাস করিয়াছে। ভারতবর্ষই শিল্পের জন্মভূমি। ভারতে সকল প্রকার শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার হইয়াছিল। ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য সর্ব্বদেশে গৃহীত হইত। ভারতের মস্‌লিন, কিংখব, শাল প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য অন্যত্র আদৃত হইত। সে শিল্প এখন কোথায়? ভারতের তন্তুবায় সম্প্রদায় কোথায় তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। আজ সামান্য বস্ত্র খণ্ডের জন্য ভারত ম্যানচেষ্টারের মুখাপেক্ষী! এই শিল্পের বিনাশের কারণ কি? সেই সর্ব্বগ্রাসী প্রতিযোগিতা। ইংলণ্ড কর্ম্ম শক্তিতে সিংহাবতার। ভারত ক্ষুদ্র মেষ-শাবক। সিংহ আসিয়া আজ মেষকে বলিতেছে, আইস তোমার সহিত সমকক্ষতা করিব—দেখি, প্রতিযোগিতার সংগ্রামে কে পরাস্ত হয়। কে এমন আছে যে, সেই অস্বাভাবিক অসঙ্গত সংগ্রাম বন্ধ করিতে পারে? কাজেই সিংহ মেষকে গ্রাস করিয়াছে। কাজেই ভারতের শিল্পের লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বিলাতী অর্থ শাস্ত্রের এই প্রতিযোগিতা নীতির আর এক কুফল-অবাধ বাণিজ্য। আমরা এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনে করা যাউক, আমি, তুমি ও আর একজন এই তিনজনে এক সমাজবদ্ধ। আমি সামান্য শক্তি সম্পন্ন, আমি কেবল শস্য উৎপাদন করিতে পারি। তুমি আমা অপেক্ষা শক্তি সম্পন্ন, তুমি বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পার। যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলিয়াছি, তাহার শস্যের প্রয়োজন হইলে, সে আমার কাছে শস্য লইবে। তাহার বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে তোমার কাছে বস্ত্র লইবে। মনে কর, তুমি বস্ত্র বিক্রয়ের দ্বারা অধিক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছ। তুমি যদি তখন মনে কর যে, তুমি

অধিক শক্তিশালী বলিয়া ও সঞ্চিত অর্থ শক্তি বলে তুমি বস্ত্র ও শস্য উভয়ই অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পার। এবং তদনুসারে তুমি বস্ত্র ও শস্য উভয় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে। আমার অপেক্ষা তোমার অধিক সুবিধা, সুতরাং তুমি অন্য অপেক্ষা সুলভে হয়ত শস্য বিক্রয় করিতে পারিলে। তাহা হইলে, সেই তৃতীয় ব্যক্তি আমার শস্য ত্যাগ করিয়া তোমারই নিকট শস্য ক্রয় করিল। সুতবাং আমার শস্য বিক্রয় হইল না। তখন 'আমার উপায় কি? তুমি যদি তোমার অধিক লাভের আশা ত্যাগ করিয়া আমায় না রক্ষা কর, তবে আমার উপায় কি? হয়ত আমাকে রাজা বা সমাজ রক্ষা করিবেন। না হয় ত তুমি সমাজের প্রচারিত বর্ণ ধর্ম্ম পালন করিয়া—নিজের স্বার্থ সংযত করিয়া আমায় আপনিই রক্ষা করিবে। অথবা যদি তোমার জ্ঞান ও পরার্থ বৃত্তির অধিক বিকাশ হইয়া থাকে, তবে এরূপ বর্ণের বন্ধন ও কর্ম্ম-বিভাগ না থাকিলেও, তুমি আমার রক্ষার জন্য অধিক লাভের আশা ত্যাগ করিতে পার। কিন্তু সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ যাহার প্রকৃতি বাণিজ্য দ্বারা অর্থ-লাভ-চেষ্টা-নিরত, সে এরূপ পরার্থবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। আমি, তুমি ও তৃতীয় ব্যক্তি যদি এক সমাজভুক্ত হই, তবে রাজার, সমাজের বা ধর্ম্মের শাসনে আমরা নিয়মিত হইতে পারি। অথবা পূর্ব্বে যে অবাধ প্রতিযোগিতার কথা বলিয়াছি, তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে আমার ধ্বংস হইয়া যাইবে। হয়ত অবশেষে সমাজ তোমার মত কয়েকটী মাত্র কর্ম্মশক্তি-সম্পন্ন লোক দ্বারা ক্রমে সংগঠিত হইবে।

কিন্তু মনে কর, আমরা তিনজন তিন বিভিন্ন সমাজের লোক। তুমি ইংরাজ-শিল্পকার, আর আমি ক্ষীণবল ভারতীয় শিল্পকার। তৃতীয় ব্যক্তির বস্ত্র প্রয়োজন হইয়াছে, তুমি ও আমি উভয়ে তাহার নিকট বস্ত্র বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিয়াছি। তোমার সুবিধা অধিক, তুমি আমা অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিলে। সুতরাং যে খরিদদার তৃতীয় ব্যক্তি, সে তোমারই নিকট বস্ত্র ক্রয় করিবে। সুতরাং আমার বস্ত্র আর বিক্রয় হইবে না। আমার এমন শক্তি নাই যে, আমি বস্ত্র ছাড়িয়া অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করিব। যদি করি, তবে তুমি তাহাতে এইরূপে প্রতিযোগী হইলে। এ অবস্থায় আমাকে কে রক্ষা করিবে? যদি কেহ রক্ষা না করে, তবেত আমি বিনাশের মুখে অগ্রসর হইব। তুমি নিজে প্রতিযোগিতা মন্ত্রে দীক্ষিত। তুমি দুর্ব্বল বলিয়া আমাকে রক্ষা করিবে না। তবে আমার উপায় কি? আমার উপায় একমাত্র রাজা। রাজা তখন আমায় রক্ষা করিতে পারেন। রাজা দেখিলেন, আমি যে বস্ত্র পাঁচ সিকায় বিক্রয় করিতে পারি, তুমি তাহা এক টাকায় বিক্রয় করিতে পার। রাজা তখন তোমার নিকট ঐ বাকী চারি আনা কর স্বরূপ চাহিলেন। (ইহাই Tariff duty)। কাজেই তোমাকেও আমার সহিত একদরে ঐ কাপড় বিক্রয় করিতে হইল। অবশ্য খরিদদার তৃতীয় ব্যক্তি এক টাকায় ঐ কাপড় পাইল না বলিয়া তাহার আপত্য হইতে পারে। কিন্তু সে ত আমার সমাজভুক্ত। সেও ত তোমার সহিত প্রতিযোগিতায় ঐরূপে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং সে আত্মরক্ষার জন্য ঐ অধিক মূল্যেই কাপড় নিতে আপত্য করিবে না—অন্ততঃ, তাহার সেরূপ আপত্য করা কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু বিদেশীয় রাজা আমায় সেরূপ রক্ষা করিবেন না। তিনি প্রতিযোগিতা-নীতির অনুবর্ত্তী। তিনি আমায় বলিবেন, তুমি কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিতেছ না, অথবা প্রতিযোগিতা জন্য তুমি সস্তায় কাপড় বিক্রয় করিতে পরিতেছ না—তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি কৃষি অবলম্বন কর। অথবা অন্য যে দ্রব্য তুমি সস্তায় প্রস্তুত করিতে পার, তাহাই কর। সুতরাং আমি ছিলাম তন্তুবায়, আমায় হইতে হইল কৃষক। এই রূপে ভারতে কৃষকের দল দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতে যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়াছে, তাহা নহে। সকলেই জানেন, ভারতে কৃষকের অবস্থা বড় শোচনীয়। ভারতে কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি—ও শিল্পীগণের কৃষক হওয়াই প্রধান কারণ। কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু সেই পরিমাণে কর্ষণোপযোগী ভূমির ত বৃদ্ধি হয় নাই। এইস্থানে প্রতিযোগিতা আসিয়া পড়িয়াছে। ভূমির কর বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু কৃষকের অবস্থা ভাল হয় নাই। কেবল কৃষকের মধ্যে বর্ণশঙ্কর হইয়াছে মাত্র।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

রাজ-গৃহ। (২)

ধূলি উড়াইয়া আমাদের গাড়ী চলিল, গতবারে লিখিয়াছি। প্রাতে উঠিয়া দেখি, আমরা যেন ধূলির মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি। বিছানা, পরিধেয় বস্ত্র ও মস্তক, সব ধূলিতে আবৃত। এরূপ ধূলির অত্যাচারে আমরা আর কখনও পড়ি নাই। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, সূর্য্যের নবীন তেজে মাতিয়া বায়ু তীব্রভাবে বহিতে লাগিল—তাহাতে ধূলি উড়াইয়া সময়ে সময়ে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় করিতে লাগিল। এক এক বার বায়ুর প্রকোপ থামে, আর আমরা বিছানা ঝাড়ি, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে বিছানার উপর দুই আঙ্গুল স্তর হইয়া ধূলি পড়ে। কার্ত্তিক মাসে পদ্মার জল থিতাইয়া দেখিয়াছি, এক অঙ্গুলি পরিমাণ মাটী পাত্রের নীচে জন্মিয়াছে। আজ রাজগৃহের রাস্তায় বায়ু-থিতান ধূলি-রাশি দেখিলাম। একে রৌদ্রের আক্রমণ, গাড়ীর তেমন ছাউনি নাই, অর্দ্ধেক তাল-পত্রে আবৃত, অর্দ্ধেক খালি,তার উপর ধূলির প্রবল তরঙ্গাভিঘাত। আমার অসুস্থ শরীর ক্রমেই বিকৃত হইতে লাগিল। আমি যেন আর আমাতে নাই, মরণের কোলে যেন ঢলিয়া পড়িয়াছি। সে জীবন-মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করিতে পারি, আমার সে সাধ্য নাই।

বেলা প্রায় ১০ টার সময় গাড়ী শিলাও গ্রামে পৌঁছিল। এখানে একটী বড় বাজার আছে, ডাকঘর আছে, থানা আছে। অনেক দোকান,অনেক বাড়ী;—অনেক ঘরেই খোলার ছাউনি, মাটীর দেয়াল। পাকা বাড়ীও আছে। এই স্থানে উৎকৃষ্ট খাজা, খুব সরু-চিড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কে বা কেনে, কে বা খায়? ধূলিতে আবৃত হইয়া আমরা

গতবারে ম্যাপে স্থান চিহ্নিতকরণে যে দুটী ভুল হইয়াছে, তাহা এই। সরস্বতী নদীর নাম স্পষ্ট লেখা আছে। (ঙ) চিহ্নিত স্থানে সপ্তঋষিকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড, (চ) এই স্থানে জরাদেবীর (জরা-রাক্ষসীর) প্রাচীন মন্দির। গতবারে মুদ্রাকরের দোষে মুকদুম সাহের নাম দুমদুম হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। ২১

আহার নিদ্রা ভুলিয়াছি। ভৃত্যের দ্বারা থানায় পত্র পাঠান হইল। থানার লোক রাজগৃহ গ্রামের কনেষ্টবলকে আমাদের পত্র দেখাইতে বলিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। পোষ্ট-মাষ্টার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে কালীপ্রসন্ন বাবু অনুরোধ করিয়াছিলেন, লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি ডাক ঘরে নাই। শিলাও গ্রাম দেখিয়া এই স্থানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। খুব বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রাম। এখান হইতে আর চারি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রাজগৃহ। বিহার হইতে রাজগৃহের দুটী পথ—একটী পথ গিরিয়াক হইয়া গিয়াছে, সে পথে রাজগৃহ আঠার মাইল, শিলাওর পথ ১৫ মাইল। বিহারের পশ্চিম দক্ষিণ দিয়া পঞ্চানন নদ চলিয়া গিয়াছে। তাহার বক্ষ শুষ্ক—বালুকা-ময়। আমরা প্রায় ১২টার সময় রাজ-গিরি-গ্রামে পৌছিলাম। রাজ-গিরি গ্রামে পৌছিলেই লোকনাথ পাণ্ডা আমাদিগকে সাদর-সম্ভাষণ করিলেন। পুলিসের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। প্রায় ½ মাইল দূরে ইনস্পেকসন-বাঙ্গালায় গাড়ী পৌছিবার পূর্ব্বেই, সোজা পথে যাইয়া, লোকনাথ বাঙ্গালার চাপরাশি রামলালকে সংবাদ দিয়াছেন। রামলাল এবং লোকনাথ আমা-দিগকে সাদরে গ্রহণ করিল। উত্তপ্ত দেহে আমরা বৃক্ষতলায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বাঙ্গালার আশ্রয় লইলাম। মধ্যাহ্নে আমাদের আহারের সুবিধা হইল না, প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত,শ্রান্ত, অবসন্ন দেহ, কে আর কি প্রস্তুত করিবে? আমরা অতি কষ্টে যাইয়া সপ্তধারা ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলাম। স্নানান্তে যেন জীবন পাইলাম। এই মরু-ভূমির মধ্যে ক্রমাগত উষ্ণ জল উঠিতেছে এবং পড়িতেছে। এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! আমা-দের সকল শ্রান্তি এবং ক্লান্তি যেন দূর হইল। স্নানের পরেই যেন নব জীবন পাইলাম। এরূপ বিমল সুখ জীবনে অতি অল্পই পাইয়াছি।

আমবাগানের মধ্যে ছোট ইনস্পেকসন বাঙ্গা-লা—দুটী ঘর, দুটী বাথরুম এবং দুটী বারাণ্ডা। আমবৃক্ষের মধ্যে মধ্যে মোহুয়া গাছও আছে। সাহেবেরা আসিয়া এখানে থাকেন। রাম লাল এক খানি পুস্তক দেখাইল। তাহাতে দেখিলাম, আমাদের বাঙ্গলার গৌরব শ্রীযুক্ত বি, এল, গুপ্ত এবং বরিশালের উকীল বাবু দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয়গণ আমাদের পৌছার দুইমাস পূর্ব্বে রাজগিরি পরিদর্শনে আসিয়াছি-লেন। নব্যভারতে রামলাল বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর ইঁহারা যে রাজগৃহে আসিয়াছিলেন,তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘর দুটীতে প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিল সমস্তই আছে। একটু দূরে একখানি রান্নাঘর আছে। দৈনিক ভাড়া ॥০। শুনিলাম, ছোট লাট চার্লস্ ইলিয়ট এখানে আসিয়াছিলেন।

রাজগৃহ সম্বন্ধে অনেক কথাই পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। এই স্থানে যাহা যাহা দেখিয়াছি, পরে বিবৃত করিব। এই স্থান সম্বন্ধে মহাভারতে কি পাওয়া যায়, তাহার কিছু উল্লেখ করিতেছি—

"যুধিষ্ঠির কহিলেন,হে কৃষ্ণ, জরাসন্ধ কে? তাহার বলবীর্য্যই বা কত? শলভ-সদৃশ জরাসন্ধ অগ্নিতুল্য তোমাকে স্পর্শ করিয়া কেনই বা দগ্ধ হয় নাই।"

এই কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ মগধদেশের বৃহদ্রথ নামক নরপতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়া চণ্ডকৌশিক মুনির ফলপ্রদানের কথা বিবৃত করেন। সেই ফল বৃহদ্রথ পত্নীদ্বয়কে প্রদান করেন। ঐ ফল ভক্ষণে রাণীদ্বয়ের গর্ভ সঞ্চার হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে—

"হে মহাপ্রাজ্ঞ মহীপতে। অনন্তর [illegible] পূর্ণ

হইলে ঐ দুই রাজমহিষী দুইখণ্ড শরীর প্রসব করিলেন এবং উহাদের প্রত্যেকের এক চক্ষু, একবাহু, এক চরণ, অর্দ্ধমুখ, অর্দ্ধ উদর ও অর্দ্ধ চিবুক অবলোকন করিয়া উভয়ে ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। অবলা ভগ্নীদ্বয় তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর পরামর্শ পূর্ব্বক ঐ জীবিত খণ্ডদ্বয় অতিদুঃখে পরিত্যাগ করিলেন। উঁহাদের দুই জন ধাত্রী ঐ খণ্ডিত গর্ভদ্বয় সুন্দররূপে আবৃত করত অন্তঃপুর হইতে নির্গমন পূর্ব্বক কোন চতুষ্পথে লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিয়া আসিলেন। হে নরবর! মাংস শোণিত-ভোজিনী জরা নাম্নী কোন রাক্ষসী ঐ প্রক্ষিপ্ত দেহ খণ্ডদ্বয় গ্রহণ করিল। ঐ রাক্ষসী তখন বিধিবল-প্রেরিতা হইয়া সহজে বহন করিবার আশয়ে সেই উভয় শরীর খণ্ড একত্র করিল। হে পুরুষর্ষভ। ঐ অর্দ্ধ কলেবর যুগল দেহ পরস্পর সংযোজিত হইবামাত্র মূর্ত্তিধারী এক বীরকুমার হইল।"

এই সন্তানকে জরা রাক্ষসী বৃহদ্রথ রাজাকে উপহার দিয়া বলিল—

"হে ধার্ম্মিক, অদ্য তোমার পুত্রের খণ্ডিত শরীরদ্বয় অবলোকন করিয়া দৈবযোগে যেমন একত্রিত করিলাম,অমনি উহা একটী কুমার হইয়া উঠিল। মহারাজ, তোমার ভাগ্যক্রমেই এরূপ হইয়াছে, আমি কেবল ইহাতে উপলক্ষ মাত্র। আমি সুমেরুকেও ভক্ষণ করিতে পারি, তোমার এই বালকের ত কথাই নাই, কেবল তোমার গৃহে সর্ব্বদা পূজিত হই বলিয়াই সন্তোষ প্রযুক্ত ইহাকে তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম।"

"শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাক্ষসী এই সকল কথা কহিয়া ঐ স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইল। রাজা বৃহদ্রথ স্বীয় কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার জাতকর্ম্ম সকল করাইলেন এবং সমস্ত মগধ রাজ্যে রাক্ষসী উদ্দেশে মহোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন। অপিচ, ব্রহ্মার তুল্য ঐ নরপতি "জরারাক্ষসী ইহাকে সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছে, অতএব ইহার নাম জরাসন্ধ হইল" এইরূপ স্থির করিয়া সেই বালকের নামকরণ করিলেন।" মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, সভাপর্ব্ব, ২২১ পৃষ্ঠা।

জরারাক্ষসীর পূজা এই রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। জরারাক্ষসীর মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। শুনিয়াছি, প্রাচীন প্রস্তরময় জরাদেবীর মূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছে, এখন যে প্রস্তরময় মূর্ত্তি আছে, তাহা পরে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী খুব প্রাচীন সন্দেহ নাই। এখানে রীতিমত পূজা হইয়া থাকে। কখন কখন ছাগ মহিষও বলি-প্রদান হইয়া থাকে।

রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিয়া বলেন যে,জরাসন্ধ পরাজিত না হইলে রাজসূয় যজ্ঞ হইবে না। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি হইলে—

"বিপুলতেজস্বী কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন, তিন ভ্রাতায় সুহৃদগণের রুচির বাক্য দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া বর্চ্চস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মগধরাজের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। * * * ঐ কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীমসেন কুরুদেশ হইতে প্রস্থান করত কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া রমণীয় পদ্ম সরোবরে গমন করিলেন, পরে কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, সদানীরা, শর্করাবর্ত্ত এবং এক পর্ব্বতকন্দরস্থ নদী সমুদায় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া চলিলেন। অনন্তর তাঁহারা মনোরমা সরযূ অতিক্রম পূর্ব্বক পূর্ব্ব-কোশলদেশ সমুদায় দর্শন করিয়া মিথিলা এবং মালা ও চর্ম্মন্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থিত হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ পার হইয়া সেই অক্ষয় উৎসাহসম্পন্ন বীরত্রয় তখন পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করতঃ কুশাম্ব দেশের বক্ষঃস্থল স্বরূপ মগধ রাজ্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সলিল-সমাকীর্ণ গোধনপূর্ণ ও মনোহর বৃক্ষবিশিষ্ট গোরথ নামক পর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইয়া মগধরাজ্যের পুরী দর্শন করিলেন। * * * উহা বিলক্ষণ পশুসম্পন্ন,নিয়ত জলযুক্ত,উপদ্রব শূন্য, এবং সুন্দর গৃহ সমূহে সুশোভিত। উচ্চ শৃঙ্গান্বিত,শীতলদ্রুম বিশিষ্ট, পরস্পর সংযুক্ত বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক,এই পঞ্চশৈল যেন একযোগ গিরিব্রজ নগরকে রক্ষা করিতেছে। * * * পরে তাঁহারা হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণ, সর্ব্বদা উৎসাহান্বিত, অন্যের অধৃষ্য, চাতুর্ব্বর্ণ পরিপূরিত গিরিব্রজ নগরে উপস্থিত হইলেন এবং পুরদ্বারের নিকটস্থ না হইয়া বৃহদ্রথ রাজের পরিজন ও নাগরিক প্রজাবর্গের পূজিত, মাগধদিগের সুরুচির, সমুন্নত চৈত্যকশৃঙ্গ ভেদ করিলেন।" ঐ ঐ সভাপর্ব্ব,২২৯ পৃষ্ঠা।

মহাভারতের কথা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম। রামায়ণেও গিরিব্রজের কথা উল্লিখিত আছে। বায়ুপুরাণেও রাজগৃহের বর্ণনা আছে। * এস্থান, কত প্রাচীন পাঠকগণ বুঝিতেছেন। যে হিসাবেই ধরা যাউক, প্রায় ৩৫০০ সহস্র বৎসরের এই স্মৃতি-চিহ্ন। ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এমন জীবন্ত কীর্ত্তি ভারতের আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?

ফাহিয়ান অনুমান ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। † তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে রাজগৃহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

"Fahian then visited Raja-griha, the new town built by Ajatasatru, as well as the old town of Bimbisara."

Ancient India, p. 510.

হুয়েনসাঙ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন পরিত্যাগ করিয়া ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। এবং বহুবর্ষ ভারতে থাকিয়া ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজগৃহ পরিদর্শন করেন। ‡

যাঁহারা মহাত্মা বুদ্ধদেবের জীবনচরিত বিশেষরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, রাজগৃহ এই মহাত্মার পূত চরণরেণুতে পবিত্র হইয়াছে। তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং শেষে রাজগৃহে উপস্থিত হন।

"রাজগৃহ তখন মগধ রাজ্যের রাজধানী। বিম্বসার রাজগৃহের প্রতাপান্বিত নরপতি। বিন্ধ্যাচলের পাঁচটী শাখা-শৈল এই নগরকে পরিবেষ্টন করিয়া ইহার স্বাভাবিক রমণীয়তা আরো বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সকল শৈলের নিভৃত কন্দরে কন্দরে তপস্বীগণ জনকোলাহলের অতীত থাকিয়া অপর নাগরিক সর্ব্বপ্রকার সুবিধা সম্ভোগ করিয়া চিন্ময় পরমেশ্বরের ধ্যানধারণায় জীবন অতিক্রম করিতেন। সিদ্ধার্থ নগরের পার্শ্বস্থিত পাণ্ডব-শৈলের* এই নির্জ্জন গুহায় আবাসস্থান নিরূপিত করিলেন।" কৃষ্ণকুমার বাবুর বুদ্ধদেব চরিত, ৬২পৃষ্ঠা।

মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছিল। গঙ্গার দক্ষিণে রাজগৃহে বিম্বসারের রাজধানী সংস্থাপিত ছিল।† গৌতম সংসার ত্যাগ করিয়া এইস্থানে প্রথম সাধন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সিদ্ধার্থের জীবন-বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, বিম্বসারের সহিত বুদ্ধের কি সম্বন্ধ এবং কত দিন কতবার এই পঞ্চ পাহাড়ে তিনি বিহার করিয়াছিলেন। রাজগৃহের বনে বনে আজও তাঁহার অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। সে সকল এখন জৈনদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূর্ত্তি সকলের আকৃতি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, সকলই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। অজাতশত্রুর পিতা মহাত্মা বিম্বসার বৌদ্ধ ধর্ম্মে যখন বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইলেন, সেই সময় হইতে এই সকল মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। সে আজ কত দিনের কথা, ভাবিলেও বিস্মিত হইতে

* নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩, ৭১ পৃষ্ঠা।

† Ancient India, by R. C. Dutta, p. 506.

‡ "Houen Tsang came to Rajagriha, the old Capital of Magadha at the time of Ajatasatru and Bimbisara. The outer walls of the city had been destroyed, the inner walls still remained in a ruined state, and were 5 miles round." *Ancient India, p. 527*

* কনিংহাম সাহেব বলেন, অধুনা যাহাকে রত্নগিরি বলে, পূর্ব্বে তাহারই নাম পাণ্ডবশৈল ছিল।

† Rajagriha, as we have stated before, was the capital of Bimbisara, King of the Magadhas, and was situated in a valley surrounded by 5 hills. Some Brahman ascetics lived in the caves of these hills, sufficiently far from the town for studies and contemplation, and yet sufficiently near to obtain supplies. Goutama attached himself first to one Alara, and then to another Udraka, and learnt from them all that Hindu philosophy had to teach."

Ancient India, p. 358.

হয়। প্রবাদ আছে যে, বিম্বসারের মহামায়ার মন্দিরে একদা লক্ষ ছাগবলি হওয়ার কথা ছিল। সেই দিন বুদ্ধদেব উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশ্চর্য্য রূপে পরিবর্ত্তিত করেন।* ষষ্ঠবর্ষে তাঁহার পত্নীকে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের দীক্ষা প্রদান করেন। † বুদ্ধদেবের জীবনের মহত্ব পূর্ণ অংশ রাজ-গৃহে অতিবাহিত হইয়াছিল, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কুশাগ্রপুর মগধের রাজধানী, পঞ্চপাহাড় বেষ্টিত বলিয়া ইহার নাম গিরিব্রজ হইয়াছে। বহুকাল মগধের রাজধানী থাকা প্রযুক্ত ইহার নাম রাজগৃহ হইয়াছে। বায়ুপুরাণের এই শ্লোকটী রাজগিরির পাণ্ডাগণ সর্ব্বদাই উচ্চারণ করিয়া থাকে।

"বৈভারো বিপুলশ্চৈব রত্নকুটো গিরিব্রজঃ।
রত্নাচল ইতিখ্যাতা পঞ্চইতি পবনা নগা।
পঞ্চানাং শৈল মুখ্যানং মধ্যোমালেব রাজতে
সরস্বতী পুণ্যতোয়া পুণ্যারণ্যাদ্বিনিংসৃতা।"

গিরিব্রজ রামায়ণ এবং মহাভারতে জরাসন্ধের রাজধানী বলিয়া উক্ত। ‡

ফাহিয়ান বলেন, এই নগর নূতন রাজগৃহের ½ মাইল দক্ষিণে পঞ্চ পাহাড় বেষ্টিত। *

হুয়েনসাঙও এই কথা বলেন। ফাহিয়ান বলেন, পঞ্চপাহাড় যেন এই নগরের প্রাচীর। লঙ্কার পালি ইতিবৃত্তে এই পঞ্চপাহাড়ের নাম পৃথক। † মহাভারতে পঞ্চপহাড়ের নাম বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক। বর্ত্তমান সময় ইহাদেব নাম (১) বৈভারগিরি, (২) বিপুলাচল গিরি (৩) রত্নগিরি ৪। উদয়গিরি, (৫) সোণগিরি। ইহা আমরা ম্যাপে প্রদর্শন করিয়াছি।

প্রাচীন রাজগৃহই যে এই, তাহার প্রমাণ কি, অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কনিংহাম প্রভৃতি মহাজনেরা এই স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ এবং ভৌগলিক বিবরণ মিলিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, এই রাজগিরিই প্রাচীন রাজগৃহ। রাজগৃহ হইতে গয়া ৩২ মাইল ব্যবধান। বুদ্ধগয়ার নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থানই সিদ্ধার্থের বিহার ক্ষেত্র। বুদ্ধগয়ার নিকটে এইরূপ পঞ্চসহাড়-বেষ্টিত স্থান আর নাই। বিশেষতঃ যে সকল স্মৃতি চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা অকাট্য রূপে প্রমাণ করিতেছে যে, এই রাজগৃহই প্রাচীন রাজগিরি। সকল বিবরণ পাঠ করিলে পাঠকগণ মোহিত হইবেন।

* "The king was struck and pleased and with his numerous attendants, declared himself an adherent of Gautama and invited him to take his meal with him the next day."
Ancient India, p. 363.

† In the sixth year after spending the rains at Kosambi, Gautama returned to Rajagriha and Kshema, the Queen of Bimbisara, was admitted to the order.
Ancient India, p. 368.

‡ Lassen. Ind. p. 604.

* Beal's Fahian C. XXVIII. p. 112.

† Journ. A. S. Bengal, 1838, p. 996.

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কবির হর্ষ।*

চিরস্নিগ্ধ মনোমদ মল্লি প্রতিভার
সুরভি হিল্লোলে যার কম্পিত পবন!
অলিনী গুঞ্জরি করে মধুর ঝঙ্কার
পঞ্চম আলাপি পিক করে কুহুস্বন—
সেই প্রাণ তরপণ, অমৃতের সার,
জ্ঞানপুরী শ্বেতদ্বীপ, ক'রেছে মোহিত,
সুধী জনোচিত বুদ্ধি করিয়া বিস্তার,
বঙ্গের গৌরব জ্যোতি করিয়া বর্দ্ধিত।

হরষে শারদ নিশি ঢালে সুধারাশি
পুলকে কণ্টক কায়া—মর্ত্ত্য মন্দাকিনী,
বিহগ মঙ্গল তান করে আলাপন
হারিত সিচয়া বঙ্গ উঠিয়াছে হাসি,
এসো কৃতি! সঙ্গে ল'য়ে প্রতিভাদামিনী
তোমারে দেখিতে বঙ্গ বিচলিত মন।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

---

* শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালী নামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাই এই কবিতাটী লিখিত হইল। ইনি শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি স্বর্গীয় হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। অতুলচন্দ্রের স্মরণ শক্তি ও দুরূহ বিষয় বিশ্লেষণ ক্ষমতা অদ্ভুত। দশম বর্ষের অতুলচন্দ্র ভারত-শাসন সম্বন্ধে এক সময় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এই সভায় বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, তিনি বালকের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হন ও পরিশেষে সভার মধ্যেই অতুলচন্দ্রকে আলিঙ্গন করেন। অতুলের বাল্যকালের অতুল ক্ষমতা যৌবনে পরিবর্দ্ধমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয়ার আলিঙ্গন।

অবনী মাঝারে উষা কিরণ বহিয়া
জানায় ভারত গৃহে আজিকে বিজয়া
কমনীয় অধরের লাবণ্য ছটায়,
ভারতের ম্লান মুখ বিশদ হাসায়।

স্নিগ্ধ আকাশ আর তত নীল নয়,
হেমন্ত-নীহারে সিক্ত প্রকৃতি-বলয়।
নব্যভারতের গৃহে কাঁদিতেছে উষা—
দেও দেও আলিঙ্গন—বিজয়ার ভূষা।

ভাবিয়াছ প্রাণময়ী বিশ্ব এ ক'দিন,
আজ কেন কর তায় আঁধার, মলিন?
মায়া সনে মহামায়া বেঁধেছে তোমায়,
মায়ায় রজনী আজ পূবেতে পোহায়।

নববেশে সাজিয়াছ, নবীন উৎসাহে,
পূজিয়াছ বিশ্বমাতা আপনার গৃহে,
ভারতে জননী-পূজা ঢালিয়া জীবন
দেখায় বিজয়া, করি স্নেহ আলিঙ্গন।

সেই স্নেহে নবীনতা মাখিয়ে যতনে
মিশে যাও ভায়ে ভায়ে—দু'জনে দু'জনে;
দেখিবে ভারত নব্য ভূষায় ভূষিত,
নব্যভারতও তায় হ'বে আলোকিত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার।

কোথায়?

১

লোকে বলে তুমি আর
নাহি এ জগত' পরে
আমি দেখি তুমি আছ
বিরাজিত চরাচরে।

২

বিশাল অচল-শিরে,
ক্ষুদ্র ধূলি-কণা-মাঝে,
ওই যে মূরতি তব
অপূর্ব্ব শোভায় সাজে।

৩

সুনীল জলধি-জলে
ছোট বড় ঊর্ম্মি-মেলা,
তুমি ত সেথায় বসি'
করিতেছ জল-খেলা।

৪

নগন গগম-ভালে
শোভে যে পূর্ণিমা-ইন্দু,
তাহাতে উছলে তব
নিরুপম রূপ-সিন্ধু।

৫

নিশ্বাস তোমার সেত
বসন্তের সমীরণ,
প্রেম-হাসি নব ঊষা
এ জগতে অতুলন।

৬

বিকচ কুসুমে তব
শ্রীঅঙ্গ-সৌরভ ঢালা,
বরণ তরুণারুণ
ভুবন করেছে আলা।

৭

নিবিড় নীরদ-মালা
তোমার অলকাবলী,
সমীর পরশে মরি
আবেশে পড়িছে ঢলি'।

৮

নদীবুকে কলগান,
কোকিলার' কণ্ঠস্বর,
সে তোমারি কলকণ্ঠ
মধুর মধুরতর।

৯

তবে তুমি কোথা নাই ?
মিছা খুঁজিবনা আর ;
এই যে রয়েছ তুমি
সাকারেতে নিরাকার।

শ্রীনগেন্দ্রবালা ঘোষ।

বিকৃতি।

সে শ্রী স্নিগ্ধ সুশ্যামল নাহিক হেথায় ;
অকূল—অপার—ধূধূ—শ্মশান কেবল !
অমানিশা ঘনঘোর সন্তর্পণে হায়
বিরচিছে কি মরণ আতঙ্ক প্রবল !
বিকৃত হৃদয় তন্ত্রী পিশাচের রোলে ;
স্পষ্ট নাহি বুঝা যায় কি বাজিছে তায় ;
যামিনীর সুনীরব প্রশান্ত বিরলে
নেত্র মুদি তথাপিও ধরা নাহি যায় !
জাগিয়া কি ঘুমাইয়া—মুগ্ধ কি মায়ায়,
মরি-বাঁচি করি সদা কাটিছে জীবন !
আবাল্য পোষিত আশা সংসার-বন্যায়
মিলায়ে গিয়াছে কোথা ; পড়িয়া এখন
কাদামাখা ভাঙ্গা-কূল নগণ্য জীবন !
অসীমে অসীম ভাব—স্বপ্ন সে এখন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থানাভাবে এবার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা গেলনা, আগামীবারে যাইবে। গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

ভারত, মিসর ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। (৫)

আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাব যিনি পড়িয়াছেন, কুসংস্কার-বর্জ্জিত হইলে তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন হইয়া থাকিবে, যীশুর খ্রীষ্টধর্ম্ম যে ধর্ম্মজগতের ফল, সেই ধর্ম্মজগৎ পুরাতন ইহুদী ধর্ম্ম বা মোসেস এবং প্রফেট্‌গণের ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারিত Essenism এসিনিস্‌ম, গ্রীকদর্শনাদির মতামত এবং পরিশেষে ফাইলোর মিসরীয় ধর্ম্মমতে গঠিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের জন্মবৃত্তান্ত ও অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ শুনিয়া যীশুর শিষ্যগণ সম্ভবতঃ যীশুকেও তদ্রূপ বৃত্তান্ত ও ক্রিয়াকলাপে ভূষিত করিয়া থাকিবেন। পাপমলিনতা পরিহার করা যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের পরিশুদ্ধির উপায়, খ্রীষ্টধর্ম্মেও তাহা Doctrine of atonement। এমত কি, যীশুর শিষ্যগণ বৌদ্ধমঠের নিয়মাদি দেখিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের Church system বা খ্রীষ্টীয় আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম-প্রণালী সংগঠন করিয়া থাকিবেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর (Max Muller) বলিতেছেন :—

"ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই অরণ্যবাসকে মনুষ্য জীবনের সম্বন্ধে একটী নূতন কল্পনা বলিয়া মনে করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসিদের জীবনের সহিত এই আরণ্য জীবনের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক এই, খ্রীষ্টীয় পর্ব্বত গুহা প্রভৃতি আশ্রম স্থান অপেক্ষা ভারতের আশ্রম গুলি অধিকতর জ্ঞানোন্নত ও অধিকতর স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ছিল। সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যবাস স্বীকারের বিষয় খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধগণ হইতে শিখিয়াছিলেন কি না, বৌদ্ধ ও [illegible] ক্যাথলিকদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুগত [illegible] মধ্যে যে [illegible] সাদৃশ্য দেখা যায়, ([illegible], [illegible], [illegible], [illegible], পুরোহিতের, ক্রিয়াকলাপ) তাহা এক সময়ে ঘটিয়াছে কি না, এ সকল প্রশ্নের আজ পর্য্যন্ত কোন সুন্দর মীমাংসা হয় নাই।"

ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি সম্বন্ধে হিবার্ট বক্তৃতা।

খ্রীষ্টানজাতি মধ্যে যাঁহারা উদারচেতা, সত্যসন্ধ পণ্ডিত তাঁহারাই বৌদ্ধগণ হইতে যে খ্রীষ্টানগণ সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন ; কিন্তু অবতারবাদী খ্রীষ্টানগণের পক্ষে সে মীমাংসা স্বীকার করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

বৌদ্ধ অশোকের শাসনে * প্রকাশিত যে, তিনি পঞ্চযবনরাজ্যে বৌদ্ধ প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। প্রাচীন কালে গ্রীকদিগকেই যে যবন বলিত, ঐতিহাসিক Bishop Corrie ও তাহা বলিয়াছেনঃ—

"Javan (Yunaan) the son of Japheth, and grandson of Noah, was certainly the father of all those nations that went under the general denomination of Greeks Javan had four sons, Elishah, Tarshish, Chittim and Dodanim, whose names may still be traced in ancient historians as the heads and founders of the chief tribes of that nation, whilst numerous accessions were made to the Greeks, from time to time, by colonies from Egypt and Phœnicia and other countries, who mixed themselves with the ancient inhabitants."

"যে সকল জাতি গ্রীক নামে প্রসিদ্ধ তাহারা নিশ্চয় নোয়ার পৌত্র এবং জ্যাফেতের পুত্র যবনের (য়ুনান) বংশধর। যবনের চারি পুত্র ইলাইশা, টার্শিশ, চিটিম এবং ডডোনা। নানা গ্রীক জাতি বিভাগের স্থাপয়িতা এবং পতি রূপে গ্রীশের প্রাচীন ইতিবৃত্তে আজিও এই যবন পুত্রগণের নামোল্লেখ দেখা যায়।

* এই শাসনের অনুবাদ দেখিতে অনেকদূর যাইতে হইবে না ; তাহা দত্তজ মহাশয়ের সংগ্রহ-গ্রন্থেই দৃষ্ট হইবে। তাঁহার Ancient India-র দ্বিতীয় Volume দেখ।

আরও দৃষ্ট হয়, ইজিপ্ট, ফিনিসীয় এবং অপরাপর দেশ হইতে সময়ে সময়ে নানা উপনিবেশ আসিয়া প্রাচীন গ্রীশবাসিগণের সংখ্যা পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।"

কোন্ কোন্ যবনরাজ্যে এই বৌদ্ধ-প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, শাসনে তাহাদিগের নামাঙ্কিত আছে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না।

বিশপ আরও বলিয়াছেন, এই যবন জাতি সমূহ এক প্রকার মিশ্রিত জাতি ছিল এবং প্রাচীন মিসর ও ফিনিসীয়বাসিগণ গ্রীশে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক যবনদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। শুদ্ধ যে মিশিয়া গিয়াছিলেন, এমত নহে, তাহাদের পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রাচীন গ্রীশে বিলক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই যবনগণ ভারতবাসিগণের সঙ্গে কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে মিশিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহা দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্ম যে প্রাচীন গ্রীশে সমুথিত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

গ্রীশে যে দর্শনের আবির্ভাব হয়, তৎসম্বন্ধে Sir William Jones কি বলিতেছেন, দেখুন:—

"It is imposible to read the Vedanta, or the many fine compositions in illustration of it, without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same fountain with the Sages of India."

"বেদান্ত এবং বেদান্তের নানাবিধ সুন্দর ভাষ্য ও টীকা পড়িলে নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে, ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণের এবং পাইথোগোরস ও প্লেটোর দর্শনাদি শাস্ত্র একই উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছে।"

জোন্সের এই কথার একটু দোষ ধরিয়া মোক্ষমূলর বলিয়াছেন, জোন্স ত পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই যে, গ্রীক দার্শনিকগণ ভারতীয় দর্শন হইতে নিজ নিজ মত সংগ্রহ করিয়াছেন; জোন্স এই মাত্র বলিয়াছেন যে, গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি-স্থান একই। মানুষ যত কেন বিশদ ভাষার ব্যবহার করুন না, তবু সকল ভাষারই দোষ ধরা যায়। সে যাহা হউক, মোক্ষমূলর কি জানেন না যে, বেদই ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি-স্থান? তবে কি তিনি বলিতে চান যে, প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতামতও বেদ হইতে সংগৃহীত? একথা বলিতে মোক্ষমূলর, বোধ হয়, আরও সঙ্কুচিত হইবেন। "অন্তরের প্রত্যাদেশ" যদি মোক্ষমূলরের লক্ষ্য হয়, জোন্স সম্বন্ধে সে কথা একেবারেই খাটে না। কারণ, জোন্স নিশ্চয় জানিতেন, শ্রুতিই বেদান্ত দর্শনের মূল ও প্রতিপাদ্য। সুতরাং জোন্সের অর্থ অতি বিশদ। সরল অন্তরে তাহার অন্য অর্থ উদ্ভাবিত হইতে পারে না।

বেদান্ত বলেন, এই স্থূল পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহা সূক্ষ্ম শক্তিময় জগতে বিদ্যমান ছিল; সেই সূক্ষ্ম শক্তিময় জগৎই—নাম রূপ*। এই নাম-রূপই প্লেটো

* আর্য্য শাস্ত্রের সৃষ্টি-প্রকরণে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে; তাহা বুঝাইতে হইলে একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হয়। এ স্থলে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা মাত্র বলা যাইতে পারে। "মনুষ্য" এই শব্দ মাত্র উচ্চারিত হইলে রাম, শ্যাম প্রভৃতি কোন ব্যক্তি বিশেষ বুঝাইল না। গো, অশ্ব, সর্প প্রভৃতি নাম ও তদ্রূপ। প্রতি নামই তজ্জাতি বিশেষকে বুঝায়। জাতি বিশেষের যে নাম, তাহা সেই জাতীয় ধর্ম্ম বা শক্তিবিশেষেরই পরিচায়ক। মনুষ্যত্ব, অশ্বত্ব, গোত্ব, সর্পত্ব প্রভৃতি সমুদায়ই বিভিন্ন সৃষ্টি-কল্পনা। আবার, এ সমুদায়ই এক সামান্য জীব নামের অন্তর্গত। উদ্ভিজ্জ ও জঙ্গম জীব তদ্রূপ প্রাণী নামের অন্তর্গত। প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল,

এবং ষ্টোয়িক (Stoic) দর্শনের Idea এবং Logos। বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাহা সঙ্গ ধর্ম্ম। যে সূক্ষ্ম জগৎ হইতে স্থূল জগতের উৎপত্তি, তাহাই খৃষ্টধর্ম্মের পিতা পুত্র। এই দেখুন, মোক্ষমূলর তৎসম্বন্ধে কি বলিতেছেন।

"It was the same Logos that was called by Philo and others long before St. John, the only begotten Son of God, in the sense of the first Ideal Creation or Manifestation of the Godhead."

"এই লোগস (শব্দ) সেই অর্থেই ব্যবহৃত, যাহা বলিলে সেণ্টজনের বহুকাল পূর্ব্বে ফাইলো এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ একমাত্র ভগবজ্জাত পুত্রমাত্র বুঝিতেন—সেই পুত্র কি ? না, এই বিশ্বের আদি নামরূপ সৃষ্টি,বা ভগবানই সেই রূপে পরিব্যক্ত।"

সেণ্ট জন এবং অপরাপর খ্রীষ্ট শিষ্যগন এই "পিতাপুত্রের" কথা কোথা হইতে পাইলেন মোক্ষমূলের তৎসম্বন্ধে বলিতেছেনঃ—

"We can have no doubt that the idea of the Logos reached the Jews like Philo and the early christians like St. John from the Greek Schools at Alexandria."

"ফাইলো প্রভৃতি ইহুদীগণ এবং সেণ্ট জনের মত আদি খ্রীষ্টানগণ এলেকজাণ্ডিয়াস্থ গ্রীক স্কুল হইতেই যে লোগসের এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষযে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

অন্যত্র মোক্ষমূলর বলিয়াছেন :—

"By the Word alone is the Non Word revealed." Moitryana, Up. VI. 22.

"Here we have again the exact counterpart of the Logos of the Alexandrian Schools. There is, according to the Alexandrian Philosopher, the Divine Essence which is revealed by the Word, and the Word which alone reveals it. In its unrevealed state, it is unknown, and was by some Christian philosophers called the Father, in its revealed state, it was the Divine Logos or the Son."

"সেই অশব্দস্পর্শ কেবল শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত।" মৈ, উ, ষষ্ঠ ২২।

"এই উপনিষদ্ বাক্যে আমরা এলোকজ্যাণ্ড্রিয়ন স্কুলের লোগসেরই প্রতিবাক্য প্রাপ্ত হই। সেই স্কুলের দার্শনিক মতে "শব্দই" ভগবানকে প্রকাশ করে এবং ভগবান "শব্দ" রূপেই ব্যক্ত। অব্যক্ত কূটস্থ সামান্য জ্ঞানের অতীত। সেই অব্যক্তকেই কতিপয় খ্রীষ্টীয়দার্শনিকেরা পিতৃরূপে অভিহিত করিয়াছেন, সেই কূটস্থ অব্যক্ত পিতার বিকাশাবস্থাই ভগবৎ পুত্র বা লোগস শব্দ।"

তবেই মোক্ষমূলর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এলেকৃজ্যাণ্ড্রিয়ার গ্রীক দর্শনের তত্ত্ব হইতেই খৃষ্টধর্ম্মের পিতা পুত্রের তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। এই পিতা পুত্রের তত্ত্ব হইতেই খ্রীষ্টীয় ত্রিবৃৎ তত্ত্বের উৎপত্তি। এই সকল কথার উৎপত্তি-স্থান এবং ভারতীয় ঋষিগণের বেদান্ততত্ত্বের উৎপত্তি-স্থান যে একই, জোন্স তাহা বিশদ ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক টীল (Tiele) কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"The Jewish mind took into itself new elements, which worked and fermented in silence till they produced a nobler thought. Before the gaze of Israel opened a world hitherto unknown. It came into contact with the Indo-Germans, first with the Greeks, and lastly with the Romans. Parsism † attracted them by its ethical tendency. * * * Greek humanism and Greek philosophy made their way unobserved even among them. * * * Out of the mutual co-operation of these fac-

---

জড় জগৎ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। অগ্রে মনুষ্যত্বের সৃষ্টি না হইলে প্রতি ব্যক্তির সৃষ্টি সম্ভবে না। কিন্তু মনুষ্যত্বের সৃষ্টি কেবল ধর্ম্ম বা শক্তিময়ী সৃষ্টি। শক্তিময় জগৎ সুতরাং সূক্ষ্ম নাম-রূপ এবং নিত্যকাল বর্ত্তমান ; কারণ, প্রকৃতি পুরুষ অনাদি। এই জাতি ও নামের সৃষ্টিই শব্দব্রহ্মময়। ব্রহ্ম শব্দময় ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত। শব্দময় ব্রহ্ম সুতরাং জ্ঞানময় জগৎ। এই শব্দ ও জ্ঞানময় ব্রহ্মা হইতে বেদ সমুত্থিত। ব্রহ্মার সৃষ্টির পর প্রজাপতির সৃষ্টি। দর্শনে এই সৃষ্টির নাম নাম-রূপ। তাহাই প্লেটো এবং ষ্টোয়িক দর্শনের Idea এবং Logos. বিলাতী দর্শনে Nominalist এবং Realist রা এ কথার আলোচনা করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনেও এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

† On the debts of Judaism to Parsism, see Kuenan's *Religion of Israel*, Vol. iii pp 1-44.

tors, the union of Israelite piety with Persian morality, Greek humanism and a Universalism vying with that of Rome—in other words, out of the Semetic with the Indo-Germanic mind—arose the mighty universal religion which reconciles them both."

"ইহুদীগণের অন্তরে যে সমস্ত ধর্ম্মমতের উপকরণ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই মনাগুণ রূপে নিভৃতে গুমিয়া গুমিয়া এক পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইস্রেলগণের চক্ষে এক অভূতপূর্ব্ব নূতন বিশ্ব বিকাশিত হইল। জার্ম্মান আর্য্যগণের সহিত তাহারা সংস্পর্শে আসিলেন—প্রথমে পারস্য, তৎপরে গ্রীক এবং সর্ব্বশেষে রোমানদিগের সহিত তাহাদের সংস্রব ঘটিল। পার্শী ধর্ম্মের নৈতিক সৌন্দর্য্য তাহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। * * * গ্রীক মানবীয় ভাব এবং দর্শন অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। পার্শী নীতি, গ্রীক মানবীয় ভাব এবং সেই সার্ব্বভৌমিকতা, যাহা রোমানদিগের সার্ব্বভৌমিকতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসিয়াছিল, এই সমস্ত উপকরণ রোমানদিগের ভক্তিভাবের সহিত মিলিত হইলে, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জার্ম্মান আর্য্য এবং সেমীয় মানবসৃষ্টির একত্র সংমিলন হইলে সেই মহাপ্রভাবশালী সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সমুদ্ভব হইয়াছিল, যাহা সে সমস্ত উপকরণকেই সমঞ্জসীভূত করিয়া লইয়াছিল।"

অধ্যাপক টীল খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি এই রূপ নির্ণয় করিয়াছেন। আমরাও এই রূপ নিরপেক্ষ ইতিহাসবেত্তা এবং সমালোচকগণের মতামত দেখিয়া সেই উৎপত্তি সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছি। এই মতামত জন্য সেই ঐতিহাসিক এবং সমালোচকগণই দায়ী।

ফাইলো হইতে যে যীশু তাঁহার ত্রিবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথাও আমরা বলি নাই; লুইস তাহা বলিয়াছেন। আমরা সেই লুইসের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এই ত্রিবাদ যীশুর নিজ সম্পত্তি না হইলেও যীশু তন্মধ্যে এক নূতন জীবন সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন।

কি রূপে তিনি সেই ত্রিবাদ মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন? যে কারণে গৌরাঙ্গদেবের প্রেমতত্ত্ব বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নব উৎসাহ সহকারে ও নবভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই কারণে যীশুর মত এক নবীন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গের প্রেমতত্ত্ব কিছু ভারতে নূতন কথা নহে। ব্যাস, নারদ, গর্গ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ভক্তিবাদিগণ তাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা গীতায় প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। তথাপি গৌরাঙ্গদেব পুরাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মকে বঙ্গদেশে সঞ্জীবিত করিলেন কি রূপে? যে রূপে ইহুদীদেশে ফাইলোর উপর যীশু জয়লাভ করিয়াছিলেন। যীশু আত্ম-জীবনে ও কার্য্যে সেই প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তই মহাগুরু। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই রহস্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন:—

> "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
> লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥
> যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
>
> ৩ অ—২০।২১।

"জনকাদি মহাজনগণ কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; লোক সকলের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্ম্ম করা উচিত। কেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকও তাহা তাহা করিয়া থাকে; তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন, লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।"

যীশু এবং চৈতন্যদেব কার্য্যে প্রেমিক-ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রেমতত্ত্ব জগতে প্রচারিত হইয়াছিল।

বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এবং সংসারাসক্তি পরিহার পূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্ম কেবল মানসশুদ্ধি পথ অবলম্বন করিয়াছিল। সেই শুদ্ধি

পথ ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম এসিনিস্‌ম্ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। জন (John) তাহাই যীশুকে বিশেষ রূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যীশু সেই শিক্ষালাভ করিয়া ইহুদী ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর-পূর্ণ ক্রিয়াকলাপের পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল আন্তরিক শুদ্ধি সাধনেরই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য খ্রীষ্টোপদিষ্ট ধর্ম্ম প্রথমে কেবল এসিনিস্‌ম মাত্রে পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়াপাত হইয়াছে। কিন্তু এসিনিসমের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের এক বিষয়ে বিলক্ষণ পার্থক্য ছিল।

যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছায়ায় এসিনিস্‌মের সমুদ্ভব, সেই বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রধানতঃ সাংখ্যের জ্ঞান-পথই প্রশস্ত। কাপিল সাংখ্যে নির্গুণ ব্রহ্মের যোগতত্ব এবং তদুপযোগী সাধনপথই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধদেব তাহারই অনুগামী ছিলেন। সেই সাধনপথে সগুণ ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তত্ত্বজ্ঞানই তাহাতে মোক্ষের কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাংখ্য সাধন-পথে বিষয় বাসনার পরিহার ও বিষয় হইতে বিমুক্ত হইবার নানাবিধ উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যমতে ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন না থাকাতে তাহাতে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা পদ্ধতি নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মেও এই ভক্তি-পথ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু যীশু জনোপদিষ্ট বৈরাগ্য ও চিত্তশুদ্ধিপথ গ্রহণ করিয়া তাহাতে পুরাতন ইহুদী ধর্ম্মের ভগবদ্ভক্তি মিশাইয়াছিলেন। এসিনিস্‌মের সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এই খানে প্রভেদ।

প্রাচীন ইহুদীধর্ম্মে বরাবর ভক্তিপথ ও দেবোপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ছিল। মোসেস এই ভক্তিপথ মিসর ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়া স্বদেশে আসিয়া স্বদেশের ভক্তিপথকে আরও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাসবেত্তা বলিতেছেন ঃ—

"The culminating point of the religion of the Northern Semites was reached in that of Israel During the thirteenth century before Christ a considerable portion of Canaan was gradually conquered by this small nation They entered the country on different sides, possessing a religion of extreme simplicity though not monotheistic It did not differ in character from the Arabian, and approached most nearly it would seem, to that of the Qenites Their ancient national God bore the name of El Shaddai, but it is not without reason that their great leader Moses is supposed to have established in its place before this period the worship of Yahveh"

"ইস্রেল ধর্ম্ম উত্তরদেশীয় ধর্ম্মেরই চরমোৎকর্ষ। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেনানের অধিকাংশ স্থান ক্রমে ক্রমে এই সামান্য জাতি কর্তৃক জয়লব্ধ হইয়াছিল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে তাহারা কেনানে প্রবিষ্ট হইয়া যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত, তাহা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা প্রণালী না হইলেও অতি সরল ধর্ম্মপদ্ধতি ছিল। আরবীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত তাহার অধিক পার্থক্য ছিল না, এবং কুইনাইটগণের ধর্ম্মের সহিত তাহার সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। তাহারা সেই পুরাতন এল'সাদাই নামক স্বজাতীয় দেবতারই পূজা করিত। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাহাদের অধিনায়ক মোসেস বোধ হয়, সেই দেবপূজার স্থানে যে জিহোবার পূজা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এমত অনুমানও নিতান্ত অযুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয় না।"

Kuenen তাঁহার *Religion of Isrel* নামক গ্রন্থে ইহুদী ধর্ম্মের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীত হইবে, সেই ধর্ম্মে ভক্তিপথ কেমন প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। তাহাতে অগ্রে দেবদেবীর পূজা বিলক্ষণ বিদ্যমান ছিল। তৎপরে প্রফেটগণ তাহাকে একমাত্র যীভার পূজায় পরিণত করেন। যীভার পূজা প্রতি-

ষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত প্রফেটগণ কি করিয়াছেন, অধ্যাপক টীল তাহা বলিতেছেন :—

'To attain this end, they contended not only against the cruel worship of the God of Fire, called by the Israelites briefly 'the Molek', to whom in the Assyrian period, following probably the example of their neighbours, they sacrificed children and men, but even against the Sun, purely national worship dedicated to the Moon and Stars, to which not a few of the Israelites remained faithfull Some kings, such as Hezekiah and Josiah, devoted themselves to carrying out their doctrine, other princes, however, supported by the majority of the people, maintained the old and the new Nature-Gods. It was not till the establishment of a priestly state by the small section of the nation who returned to the Fatherland after the captivity that Yahveh was recognised as the only God, and there was no further mention of any Baal or Molek"

"একমাত্র যীভাব পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রফেটগণ শুধু যে লোকেব পূজা উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমত নহে, স্বদেশীয় বাল এবং স্বজাতীয় সূর্য্য, সোম ও নক্ষত্রাদির পূজাও রহিত করিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এসিরীয় প্রভুত্বকালে, ইস্রেলগণ প্রতিবাসী জাতির দেখাদেখি করাল অগ্নিদেব মোলকেব সমক্ষে পুত্র কন্যাকে পর্য্যন্ত নরবলি দিতেন। হেজিকায়া এবং জোশিয়া প্রভৃতি কতিপয় ভূপতি প্রফেটগণের অনুসরণ করিয়া যীভার পূজা প্রবর্ত্তনে যত্নবান হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অপরাপর প্রজানুকুল নৃপগণ পুরাতন ও নূতন দেবদেবীর পূজায় প্রবৃত্ত ছিলেন। কারাবাস হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যতদিনে সামান্য একদল ইস্রেল ধর্ম্ম যাজকগণের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিনে আর যীভামাত্রেব পূজা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠিত হইলে, আর অন্য দেবদেবীর নাম মাত্রও ছিল না।"

তবেই দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে ইস্রেল জাতি মধ্যে দেবদেবীর পূজা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। যে সলোমন এত আগ্রহের সহিত নিজ রাজধানী মধ্যে যীভার মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মাণে তত হানি নাই বিবেচনা করিতেন; এমন কি, সল এবং ডেবিড পর্য্যন্ত দেবদেবীর নামে পুত্রগণের নাম রাখিয়াছিলেন। একাডিয়ানদের (Akkadians) হইতে তাহারা বিশ্রাম দিন* "স্যাবাথের" নিয়ম প্রভৃতি অনেক রীতি নীতি এবং (Flood) জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। টীল বলেন, বাইবেলোক্ত "প্যারাডাইসের" (Paradise) এবং সৃষ্টির বিবরণও তদ্রূপ একাডীয় ধর্ম্মোক্ত বিষয়। সে যাহা হউক, ক্যালডিয়া (Chaldea) এবং এবং মেসোপোটেমিয়া হইতে দেবদেবীর পূজা গ্রহণ করিয়া ইস্রেলগণ যে প্রথমে ভক্তিপথে প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রফেটগণ নানা দেবদেবীব স্থানে একমাত্র যীভার পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, ইহুদী ধর্ম্মের ভক্তিস্রোত আরও প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইবে। কিন্তু দুরন্ত কালের প্রভাব এমনি, সেই ইহুদীধর্ম্মানুষ্ঠানে সাধারণ জনগণের ভক্তিরস ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল। তাই যীশু জন্মিবার পূর্ব্বে সেই ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়া কলাপ ও অনুষ্ঠানে অনেকাংশে রাজসিক ভাব প্রতীয়মান হইয়াছিল। সাত্ত্বিক লোকের সংখ্যা সকল সমাজেই কম; সাত্ত্বিক লোকেরা কখন জানাইয়া বেড়ায় না যে, লোকে দেখ গো আমরা কেমন ধার্ম্মিক, তাঁহাদের ধর্ম্মভাব অন্তরেই থাকে। রাজসিক লোকেরাই ধর্ম্মধ্বজী হইয়া আড়ম্বর ও ধূম-

* That the Sabbath, the Rest-day or the seventh day of the week, passed to the Semites from the Akkadians, was conjectured by Oppert and Schrader, and has now been proved from the texts by Sayce.—Tiele.

ধাম পূর্ব্বক লোকদেখান পূজানুষ্ঠান করিয়া থাকে। প্রতি সমাজেরই এইরূপ নিয়ম। তবে কখন কখন সাত্ত্বিক লোকের সংখ্যাপেক্ষা, রাজসিক লোকের সংখ্যা বাড়িয়া থাকে। যীশুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সেইরূপ রাজসিক বিষয়ী লোকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছিল। তাই যীশু ধর্ম্মের নীরস ক্রিয়া কলাপের পরিবর্ত্তে আন্তরিক চিত্তশুদ্ধির উপদেশ দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের যাহা আভ্যন্তরিক ভগবৎশ্রদ্ধা ও পূজা, যীশুর ধর্ম্মে তাহা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই শ্রদ্ধাপথের চরমসীমায় গিয়া যে ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হয়, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মে নাই। বৈষ্ণবধর্ম্মের আভ্যন্তরিক সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা ও গৌণীভক্তি তাহাতে কথঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু গীতোপদিষ্ট ভক্তিযোগের তাহাতে সম্পূর্ণ অভাব। বৈষ্ণবধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান ও মূর্ত্তিপূজা তাহাতে নাই বটে, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম মানসিক মূর্ত্তিপূজাতে বিলক্ষণ আছে। কারণ সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাপদ্ধতি মাত্রই সাকার উপাসনা। খ্রীষ্টধর্ম্ম সগুণ ঈশ্বরেরই পূজাপদ্ধতি।

আর্য্য ঋষিগণ নিম্নাধিকারী অজ্ঞ জনগণের নিমিত্ত যে উপাসনাপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মে তাহারই এক প্রকার সূক্ষ্ম সাকার উপাসনা প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। যীশু পুরাতন ইহুদী ধর্ম্মে ভগবৎ-প্রেমের এক নবস্রোত দিয়া তাহার সংস্কার সাধন পূর্ব্বক তাহাকে স্বদেশ ও স্বজাতির উপযোগী করিয়া লইলেন। ইহুদী সূত্রধর যাহার উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মৎস্যজীবিগণের উপযুক্ত হইয়াছিল। তাহা দেশ,কাল ও পাত্র উপযোগী ধর্ম্ম-সাধন মাত্র। তাহাতে উচ্চ অঙ্গের ভক্তি এবং জ্ঞানপথের কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। তত্ত্বদর্শিগণের উপযোগী নির্গুণ ঈশ্বরের তত্ত্ব ও সাধন পথের কিছুই তাহাতে নাই। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞানপথ যীশুর পূর্ব্বে সাধারণ্যে বড় প্রচারিত হইতে পারে নাই। এ জন্য এই খ্রীষ্টধর্ম্ম সর্ব্বজাতি ও সমাজের সর্ব্ব শ্রেণীস্থ জনগণের উপযুক্ত কি না, তাহা এক স্বতন্ত্র কথা। খ্রীষ্ট ইউরোপ সে কথায় কি মীংমাসা করিয়াছে? খ্রীষ্টসমাজ কি সেই ধর্ম্ম দ্বারা কিছু পরিশুদ্ধ হইয়াছে? সূক্ষ্ম সাকার উপাসনায় সামান্য জনগণের মন ভেজে নাই; শ্রদ্ধার উচ্চ অঙ্গ ভক্তিপথের অভাব থাকাতে নিষ্ঠ খ্রীষ্টানগণ সেই ধর্ম্ম-অবলম্বনে "প্রণিধান" সহকারে আর্য্যভক্তগণের ন্যায় ভগবানে তদ্গত জীবন লাভ করিতে পারেন না। আর্য্য ভক্তিপথে যাহা ঈশ্বরের সামীপ্য, সালোক্য ও সারূপ্য, খ্রীষ্টধর্ম্মে তাহা অলীক কথা। চৈতন্যদেব আজীবন এই সামীপ্য শুদ্ধ উপদেশ দিয়াছিলেন,এমত নহে, তজ্জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, বাস্তবিক মানব সেই দেবত্বলাভে সমর্থ। ভক্তিপথের "সাযুজ্যের" কথা দূরে থাক, সামীপ্য লাভার্থ ভগবানে যে ঐকান্তিকতা আবশ্যক, সেই ঐকান্তিকতা লাভের সোপানাবলি কি খ্রীষ্টধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে? বিষয়-বাসনা ও ভোগ-সুখ পরিহারের কথা খ্রীষ্ট সমাজে কি পরিদৃষ্ট হয়? ঘোর ভোগসুখে খ্রীষ্ট ইয়োরোপ নিমজ্জিত। "ইন্দ্রিয়নিগ্রহের" সম্পর্ক মাত্র তাহাতে পরিদৃষ্ট হয় না। যীশু যে শ্রদ্ধার কথা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আর্য্য-ভক্তিপথের উচ্চতায় উঠে নাই। সমুদায় হৃদয়-মন ভগবানে সমর্পণ করিবার কথা যীশুর উপদেশ মধ্যে আছে বটে, কিন্তু কি রূপ অনুষ্ঠানে ভগব-

ভক্তির ঐকান্তিকতা লাভ করা যায়, তাহার কোন কথা তন্মধ্যে নাই। সুতরাং তাহা শব্দ মাত্রে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। 'বিষয়' ও 'ঈশ্বর' এই উভয়েরই সেবা করা একদা অসম্ভব, যীশু এই কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কি রূপে বিষয় ভোগে লিপ্ত থাকিয়াও হৃদয়-মনের প্রত্যাহার সাধন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ের সবিশেষ উপদেশ তিনি দিয়া যান নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি হইতে গুরূপদেশক্রমে তিনি ত্যাগীর নীতি লাভ করিয়া আত্মজীবনে তাঁহার স্বার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে যখন প্রবৃত্ত, এমত সময়ে ইহুদীগণের কুচক্রে পড়িয়া তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। সুতরাং, আত্ম-জীবনে সম্যক্ পরীক্ষালব্ধ স্বার্থকতা বিরহে সেই অনুষ্ঠান সকলও প্রতিপন্ন কবিয়া উপদেশ দিতে সমর্থ হইলেন না। আর্য্য সনাতন ধর্ম্মে সংসারী ঘোর ভোগক্ষেত্রে পরিবৃত থাকিয়া প্রেমের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন পুর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বিষয়াসক্তি পরিহার করিয়া সেই প্রেমকে কেমন ভগবানে সমর্পণ করেন, * সমর্পণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আবার কেমন ঐকান্তিকী নিষ্ঠা লাভ করেন, এরূপ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত যদি খ্রীষ্টধর্ম্মে থাকিত, তবে আজ খ্রীষ্ট ইউরোপ এত বিষয়াসক্ত ঘোর ভোগপথের শেষ সীমায় আসিত না। বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাংখ্যযোগে যে নিবৃত্তিপথ ও নিষ্কামধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয়, তাহা জ্ঞানযোগেরই সোপান। বৌদ্ধধর্ম্মের সেই জ্ঞানযোগ যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত, তবে এক দিন ত্যাগী যীশুর বৈরাগ্যোপদেশের কথঞ্চিৎ ফললাভের আশা করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা ত ঘটে নাই ; সুতরাং, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অঙ্গ খ্রীষ্টধর্ম্মে না থাকাতে, তাহা বাস্তবিক সংসার-ক্ষেত্রের জন-সমাজে তেমন ফললাভ করিতে পারে নাই। খ্রীষ্ট সমাজের সকল শ্রেণীস্থ লোকের ধর্ম্ম-পিপাসাও তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় না। সম্পূর্ণাবয়ব না হওয়াতে তদ্দ্বারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানিগণের ধর্ম্মতৃষ্ণা অতৃপ্ত থাকে। সংসারী, অসংসারী, ভোগী, যোগী, বৈরাগী, ত্যাগী, নর, নারী, রাগী, বিরাগী, মূর্খ, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, প্রেমিক, অপ্রেমিক, হৃদয়বান, নির্ম্মম, পাষণ্ড, ভক্ত, প্রভৃতি সকলের জন্য ধর্ম্মের উপযোগিতা চাই। সকলকেই ধর্ম্মোন্নত করিয়া আনিতে পারিলে তবে ধর্ম্মের সার্থকতা হয়। সমুদায় জনসমাজে ভক্তিরসের সঞ্চার করিয়া দিতে পারিলে তবে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সমুদায় জনসমাজকে (humanize) করাই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য হওয়া চাই। জনসমাজের একভাগের জন্য ধর্ম্ম নহে। যে ধর্ম্ম সমাজের সর্ব্ববিভাগের উপযোগী, তাহাই সম্পূর্ণ ধর্ম্ম প্রণালী। সেই সম্পূর্ণ ধর্ম্মতন্ত্র আর্য্যঋষিগণের বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম। ব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রেম-ভক্তি ও জ্ঞানতত্ত্বের বিশদ উপদেশ দিয়াছেন। সেই সনাতন ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের আশ্রয় ও মূল। অপরাপর ধর্ম্মপ্রণালী তাহারই শাখাপ্রশাখা মাত্র।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

* আমার নব প্রকাশিত "সাহিত্য-চিন্তা" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।

ভারতের দারিদ্র্য। (২)

এখন বন্দোবস্ত এইরূপ হইয়াছে। তুমি ইংরাজ বলিতেছ, "আমি শিল্পকাজ সকলই করিব, ভারতবাসীকে আর শিল্প কর্ম্ম করিতে হইবে না। ভারতবাসী কেবল কৃষি-কর্ম্ম করুক। আমরা ভারতবাসীর নিকট শস্য গ্রহণ করিব—শিল্পকার্য্যের উপকরণ মাত্র গ্রহণ করিব, আর তাহার বিনিময়ে আমরা ভারতবাসীকে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিব।" এ ব্যবস্থা আপাত-দৃষ্টিতে মন্দ নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে।

ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ কাফ্রিদের সামান্য খেল্‌না দিয়া ভুলাইয়া কেমন করিয়া তাহার নাম মাত্র বিনিময়ে মূল্যবান হাতির দাঁত, স্বর্ণ, প্রবাল প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য লইয়া আইসে, তাহা অনেকেই জানেন। বন্য অসভ্যলোক পর্ব্বতে বেড়াইয়া রত্ন সংগ্রহ করে, কিন্তু তাহারা রত্ন চিনে না, রত্নের মূল্য জানে না। চতুর জহুরি তাহাদের সামান্য খেল্‌না বা খাদ্য দ্রব্য দিয়া সেই মূল্যবান মণি সকল সংগ্রহ করিয়া অল্পেই লক্ষপতি হইয়া বসে। ইংরাজের শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত আমাদের খাদ্যদ্রব্য ও শিল্পের উপ-করণ বিনিময় কতকটা সেইরূপ।

আমাদের দেশ হইতে প্রায় শতকোটী টাকার শস্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যের রপ্তানি হয়, আর সত্তর কোটী টাকার জিনিষ আম-দানি হয়। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কাপড় ও ছিট্‌ প্রায় ত্রিশকোটী টাকার। ছাতা গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি প্রায় দশকোটী টাকার। ইহা ব্যতীত রেশমী ও অন্যান্য কাপড়, কল-কবজা লৌহ ও পিতলের সামগ্রী অনেক টাকার আমদানি হয়। আর গবর্ণমেণ্টের ষ্টোর, রেলওয়ের দ্রব্যাদি, মদ, এ সবও অনেক টাকার আইসে। সুতরাং সে সকল দ্রব্য আমদানি হয়, তাহার মধ্যে কাপড় বাদে, বাকী দ্রব্য হয় আমাদের সখের জিনিস, না হয় গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। সুতরাং আমদানিতে আমাদের বিশেষ লাভ নাই।

অন্য দিকে আবার আমরা শত কোটী টাকার দ্রব্য রপ্তানি করিয়া কেবল সত্তর কোটী টাকার দ্রব্য আমদানি করি মাত্র। বাকী যে ত্রিশকোটী টাকা আমাদের পাওনা, তাহাও পাই না। ভারত-সেক্রেটরীর নানা ভাবে প্রাপ্য দাওয়াতেই সে টাকা কাটান যায়। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর ত্রিশকোটী টাকা বা সেই মূল্যের পরিমাণ শস্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড গ্রহণ করে বলিয়া সেই পরিমাণ আমরা দরিদ্র হইয়া পড়ি।

আর সুধু কি এই টাকা আমাদের প্রতি বৎসর ক্ষতি করিতে হয়? এই যে এদেশে ইংরাজগণ বাণিজ্য করেন, চা, নীল, কাফি প্রভৃতি উৎপাদন করেন, দেশ শাসনের জন্য কত ইংরাজ কর্ম্মচারী এদেশে বাস করেন, ইহারা প্রতি বৎসর যে টাকা দেশে লাভ স্বরূপ পাঠাইয়া দেন, সে টাকাও এদেশ হইতে বাহির হইয়া যায়। সেও বড় কম নহে। প্রায় পনের হইতে বিশকোটী টাকা হইবে। এইরূপে প্রায় পঞ্চাশ কোটী টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। সেই

পরিমাণে আমাদের সঞ্চিত অর্থ ক্ষয় হইতেছে। সেই পরিমাণে আমাদের কর্ম্মশক্তিও ক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

আবার অন্য দিকে গবর্ণমেণ্ট যে কর আদায় করেন, তাহার কথা ভাবিতে হয়। সে কর বড় কম নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি তিন টাকার বেশী কর দিয়া থাকে। আর গবর্ণমেণ্ট যে কর আদায় করেন, তাহার মধ্যে কয় টাকা আমরা ফিরাইয়া পাই? এই যে দেশ শাসন জন্য সেনা রক্ষা করিতে হয়, তাহার জন্য প্রায় পঁচিশ কোটী টাকা ব্যয় হয়। তাহার মধ্যে কয় টাকার সুব্যবহার হয়? গবর্ণমেণ্ট এইরূপে নানা কাজে যে সকল টাকা ব্যয় করেন, তাহার দ্বারা আমাদের উপকার হয় না।

যাহা হউক, আমরা অনুমান করিয়া বলিতে পারি যে, নানারূপে আমাদের দেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় শত কোটী টাকা নষ্ট হয়। তাহার মধ্যে অধিকাংশ বিদেশে যায়, সে প্রায় সত্তর আশি কোটী টাকা হইবে। আর বাকী টাকা অপব্যবহৃত হয়। বৃটিশ-শাসিত ভারতের লোক সংখ্যা প্রায় বিশকোটী। অতএব গড়ে প্রতি লোকের প্রতি বৎসর ৪৲কি ৫৲টাকা নষ্ট হয়। আর ভারতে প্রতি লোকের খরচই বা কত? তাহা প্রতি বৎসর বিশ পঁচিশ টাকার অধিক হইবে না, ইহা দাদাভাই নাওরোজী-প্রমুখ অর্থশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব আমরা প্রত্যেকে গড়ে বিশ টাকা মাত্র আয় করি, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রায় পাঁচ টাকা আমাদের ক্ষতি হয়। আমাদের *কর্ম্মশক্তির সিকি বা পঞ্চমাংশ এইরূপে* বৃথা ব্যয় হয়।

তাহার পর ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ঐ বিশ টাকা বা এই ক্ষতি বাদে পনের টাকা যে আয় হয়, তাহা কত অল্প। বিলাতের এক একটা লোক প্রায় তিনশত টাকা আয় করে। আর আমাদের প্রতি লোকের আয় কুড়ি টাকা মাত্র। বিলাতের লোকের কর্ম্মশক্তি আমাদের অপেক্ষা প্রায় পনের গুণ অধিক! ইহাতে বিলাত বড় হইবে না কেন? আমাদের প্রত্যেকের যে বার্ষিক মোট পনের কুড় টাকা আয় হয়, তাহা মাস হিসাবে ধরিলে পাঁচসিকা বা দেড় টাকার অধিক নহে। বল দেখি, এই পাঁচ সিকায় কি একটা লোকের খরচ কুলায়? কাজেই আমরা পেটে খাইতে পাইনা—দিনান্তে এক বেলা আধপেটা খাইয়া—বা না খাইয়া জীবন ধারণ করি।

আবার যে গড় আয়ের কথা ধরা হইল, ইহার মধ্যে যাহাদের আয় অধিক, যাহারা আয়-কর দেয়, তাহাদের কথা যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে অবস্থা কত শোচনীয়, তাহা আরও বুঝা যায়। যাহারা আয়-কর দেয়, তাহাদের সংখ্যা কয় লক্ষ মাত্র। তাহাদের বাদ দিয়া ধরিয়া বুঝা যায় যে, সাধারণ ভারতবাসীর আয় বৎসরে ৮।৯ টাকা হইতে পারে। এই আয়ে কি কেহ জীবননির্ব্বাহ করিতে পারে? অতএব ভারত কেন দরিদ্র হইতেছে—কেন ভারতে এত দুর্ভিক্ষ হয়—কেন লোক অন্নাভাবে মারা যায়—সংক্রামক পীড়ায় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এ কথা ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করেন যে, ভারতের কৃষকের মধ্যে *অধিকাংশই অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত থাকে।* আমাদের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর ইলিয়ট্ সাহেবই বলিয়াছিলেন ;—

"I do not hesitate to say that half of our agricultural population never know, from year's end to year's end, what it is to have their hunger fully satisfied"

ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী, ভারতের লোক সংখ্যা মধ্যে শতকরা নব্বই জন কৃষক। পূর্ব্বে এত ছিল না। এখন প্রায় সকল শিল্পকারগণই অন্নাভাবে কৃষক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ভারতের কত লোক অর্দ্ধভুক্ত বা প্রায় অভুক্ত থাকে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

কৃষকের অবস্থা এত শোচনীয় কেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রথম ত কৃষকের *সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ভারতের লোক* সংখ্যা বড় অধিক। সেই লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার পর ভূমি-কর অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। যেখানে চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত—সেখানে জমীদার থাজানা বৃদ্ধি করিতেছেন—আর যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেখানে গবর্ণমেণ্ট নিয়তই থাজানা বৃদ্ধি করিয়াছেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের কৃষকগণকে বড় অধিক কর দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট ভূমি-*কর হইতে বৎসর পঁচিশ কোটী টাকার* অধিক আয় করিয়া থাকেন।

তাহার পর কৃষকগণ অশিক্ষিত। তাহারা নিয়ত কর্ষণ করিয়া ক্ষেত্রের অবস্থা ক্রমে অবনত করিতেছে। তাহারা উপযুক্ত সার দিয়া ক্ষেত্রের উন্নতি করিতে পারে না। সুতরাং ভারতের ভূমির অবস্থাও দিন দিন অবনত হইতেছে—তাহার শস্য উৎপাদন শক্তির হ্রাস হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্থাগমের *প্রধান উপায় আমাদের কর্ম্মশক্তি।* আমা-দের কর্ম্মশক্তি যদি অধিক থাকিত—তবে আমাদের এই দুরবস্থা হইত না। আমরা প্রতি জনে গড়ে বৎসরে কুড়ি টাকা আয় করি—এ জন্য বিদেশীয় রাজার ভ্রান্ত অর্থ-নীতির ফলে আমাদের চারি পাঁচ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় বলিয়া আমরা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ি। কিন্তু যদি আমা-দের এরূপ কর্ম্মশক্তি থাকিত যে, আমরা প্রত্যেকে বৎসরে দুই তিন শত টাকা আয় করিতে পারিতাম, তবে এই সামান্য চারি পাঁচ টাকার জন্য কি আমাদের কোন অসুবিধা হইত?

আমরা তাহার পর বলিয়াছি যে, অর্থা-গমের দ্বিতীয় উপকরণ ভূমি। সেই ভূমি সংগ্রহ করিতে অধিক কর দিতে হই-তেছে—ভূমি ক্রমে উৎপাদিকা-শক্তি হীন হইতেছে—ইহাতেও আমাদের ধনাগমের অন্তরায় হইয়াছে। এই কর্ম্মশক্তি ও ভূমি ব্যতীত আর এক উপকরণ আছে—তাহা পূর্ব্বে আভাষ দিয়াছি—সেই উপকরণ আমাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি বা সঞ্চিত অর্থ Capital। এই মূল ধন থাকিলে তাহা ব্যয় করিয়া আমরা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিতাম। কল কারখানা, ষ্টীম এঞ্জিন প্রভৃ-তির সহায়ে অনেক দিক হইতে অর্থাগমের উপায় করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার উপায় নাই। একে সঞ্চিত অর্থ নাই—তাহা-তে যে অর্থ আছে—তাহা আমাদের লোকে এইরূপ কর্ম্মশক্তিতে রক্ষিত করিতে জানে না। আমরা কৃষিকার্য্যে বা শিল্পে কল্ ব্যবহার করিতে জানি না।

তাহার পর আমরা সমবেত হইয়া কাজ করিতে জানি না। "সংহতি কার্য্যসাধিকা" *এই কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।* আমরা সকলে স্বার্থচালিত, সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে সেই স্বার্থ সংযত করিতে হয়।

তাহা আমরা করি না। কাজেই সঞ্চিত অর্থ আমরা ব্যয় করিবার সুবিধা পাই না।

অতএব অর্থাগমের যে সকল উপায় আছে, সে সকল উপায় এইরূপ বন্ধ হইয়াছে। কাজেই আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি। আমরা এস্থলে এই দারিদ্র্যের মূল কারণগুলি উল্লেখ করিলাম। বিশেষ কথা ও আনুষঙ্গিক কথা কিছুই বলিতে পারিলাম না। একস্‌চেঞ্জ প্রভৃতি আরও নানা কারণে আমাদের নানাদিকে অসুবিধা হইতেছে। তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার উপায় নাই।

ভারতের দারিদ্র্যের যেটী মূল কারণ বলিলাম—তাহা এস্থলে সংক্ষেপে আবার উল্লেখ করিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ,আমাদের নিজের অক্ষমতা। আমরা তেমন শ্রমশীল নহি। আমরা বড় অলস। আমাদের কর্ম্মশক্তি বড় সংকীর্ণ। তাহার পর যে টুকু কর্ম্মশক্তি আছে, তাহাও স্বার্থ-চালিত। সেই শক্তি আমরা নিজের জীবনযাত্রা কোনরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্যয় করি মাত্র। কিন্তু তবু বুঝি না যে, আমরা ভগবানের যন্ত্র মাত্র। আমাদের কর্ম্মশক্তি যাহা আছে, তাহা যদি আমাদের নিজের জন্যই ব্যয় হইল, তবে তাহা বৃথা অপব্যয় হইল মাত্র। কেবল খাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। একটী ষ্টীম এঞ্জিনের কথা মনে কর। এঞ্জিনে যে পরিমাণে কয়লা দেওয়া হয় ও তাহা হইতে যে পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা যদি সমুদায় গতি শক্তিতে পরিণত হয়—তবেই তাহা আদর্শ শ্রেষ্ঠ এঞ্জিন। কিন্তু যদি এই তাপের অধিকাংশ এঞ্জিনকে উত্তপ্ত করে,তবে তাহার অপব্যয় হয় মাত্র। সেরূপ এঞ্জিন কাজের নহে। এঞ্জিনের ভাল মন্দ পরিমাণ করিতে হইলে, যেমন দেখিতে হয়, তাহার কত তাপ অপব্যবহৃত হইতেছে, তেমনি মানুষ ভগবানের কেমন যন্ত্র, তাহা বুঝিতে হইলেও দেখিতে হইবে—আমরা আত্ম শক্তির কতদূর অপব্যবহার করিতেছি, কতদূর স্বার্থ জন্য আত্মসাৎ করিতেছি।

আমাদের যদি অধিক কর্ম্মশক্তি থাকিত, তবে আত্মরক্ষা করিয়াও সে অধিক শক্তি কর্ম্মরূপে পরিণত হইত—তাহাই আবার সঞ্চিত হইয়া আমাদের সমাজকে ক্রমে উন্নত করিত। কিন্তু আমাদের তত অধিক শক্তি নাই। অথবা শক্তি থাকিলেও আমরা তাহা সুনিয়মিত করিতে পারি না। কাজেই আমাদের দুরবস্থা হইতেছে। সুতরাং আমরা আর যাহাকেই দোষ দিই না কেন, এই দারিদ্র্যের—এই অবনতির মূল কারণ যে আমরা নিজেই—তাহা আমাদের প্রথমতঃ বুঝা কর্ত্তব্য। আমরা গবর্ণমেণ্টকে দোষ দিই, অদৃষ্টকে দোষ দিই—আর বসিয়া থাকি, আমরা যদি নিজে আমাদের এই দুরবস্থার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা না করি, যদি আমারা অধিক শ্রমশীল না হই—যদি আমরা আমাদের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে না শিখি, তবে আমরা ক্রমে ক্রমে দ্রুততর বেগে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইব। কেহই সে গতি রোধ করিতে পারিবেন না।

অতএব যাঁহারা দেশহিতৈষী, তাঁহাদের এই দরিদ্রতা নিরারণের চেষ্টা করা প্রথম কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকদিগকে আলস্য ত্যাগ করিয়া যথা রীতি কর্ম্ম করিতে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আর আমরাও বৃথা বক্তৃতা বা বাগাড়ম্বর না করিয়া যাহাতে

প্রকৃত কর্ম্ম করিতে শিখি, নিজের কর্ম্ম শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে সুনিয়মিত করিতে শিখি—তাহার জন্য চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের কর্ম্মশক্তি পরিচালনের পথ চারিদিকেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং আমাদের কর্ম্মপথ রুদ্ধ হওয়ায় আমরা ক্রমে কর্ম্ম শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি—অতএব এই দুরবস্থার জন্য আমরা নিজে দায়ী নহি। যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বেগবতী নদীর গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। কর্ম্ম শক্তি কেহ রোধ করিতে পারে না। তবে তাহাকে নিয়মিত করিতে হয়। এক পথ বন্ধ হইলে আর এক পথ আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

যাহারা জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন, তাহারাই লোকের প্রকৃত কর্ম্মপথ নিয়মিত করিয়া দেয়। আমাদের মধ্যে যাহারা দেশ-হিতৈষী, তাহাদের এই কর্ম্মশক্তি নিয়মিত করিবার উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। কেন না, কেবল তাহার দ্বারাই ভারতের দারিদ্র্য দূর হইতে পারে। পৃথ্বীশ বাবু ভারতের দারিদ্র্যের কারণ ও তাহার প্রতিবিধানের উপায় স্থির করিতে চেষ্টা করিয়া আমাদের বিশিষ্ট উপকার করিয়াছেন। আমরা পৃথ্বীশ বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। আশা করি, প্রত্যেক ভারতহিতৈষী তাঁহার পুস্তক বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিবেন ও ভারতের দারিদ্র্যের বিষয় বিশেষ চিন্তা করিবেন। পৃথ্বীশ বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে সার রমেশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন।

"It (the Poverty Problem in India) would indeed be a very interesting and useful contribution to the literature on the subject. It is interesting because in the range of Indian Politics there is no subject which is of more vital importance than this. * * * It is extremely useful because on a practical solution of this Problem our political advancement chiefly depends".

আমাদেরও এই কথা। এই জন্য আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত ভারত-সন্তানকে এই বিশেষ আবশ্যকীয় পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছি।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

পঞ্চবটী।

"পঞ্চবটী" অথবা "দণ্ডকারণ্য" শ্রবণ করিলে, দশরথ-তনয় রঘুকুল-তিলক নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম রাজা রামচন্দ্রের পিতৃ বৎসলতা, গুরুভক্তি, পত্নী-পরায়ণতা, ভ্রাতৃপ্রেম, স্বদেশ-প্রেম, স্বধর্ম্মানুরাগ, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন প্রভৃতি মহাগুণ সমূহ আমাদের স্মৃতিপথে উদয় হয়। পঞ্চবটী-তল-বাহিনী "গোদাবরী" মহানদীর কথা শুনিলেই বোধ হয় যেন, তাল তমালাদি মহাদ্রুমে পরিপূর্ণ মহারণ্যের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গোদাবরীর তরঙ্গে তরঙ্গে সহস্র দল কমলকুলকে নাচিতে ও ভাসিতে দেখিতেছি; যেন মধ্যাহ্ণ সূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত সেই সুবর্ণাভ তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে চক্রবাক, চক্রবাকী, চকোর, চকোরী প্রভৃতি বিচিত্র বিহঙ্গবর্গকে নাচিতে ও খেলিতে দেখিতে পাইতেছি; যেন মধুপানে মত্ত মক্ষিকা সমূহের মনমোহক গুঞ্জন, নানাবিধ প্রস্ফুটিত প্রসূনের সুগন্ধ এবং গোদাবরী তটে তপঃ-প্রভাবশালী পূজনীয় ব্রহ্মদর্শী মহাত্মাদিগের হোমকুণ্ডের

নীলবর্ণ ধূম্ররাশিকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। দণ্ডকারণ্য স্মরণ হইলে, বিপুলবপু রাক্ষস, মায়ামৃগ, লক্ষণের কোপ, রাবণের ছদ্মবেশ, সীতার হরণ, জটায়ুর পরোপকার, সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন, রামের বিলাপ, ভয়ানক শ্বাপদবর্গের চীৎকার, শাখা মৃগের সন্ধি প্রভৃতি অপূর্ব্ব ঘটনা সমূহ সহসা স্মৃতি পথে উদয় হয়। রত্নাকর বাল্মিকীর বর লাভ হইতে ভবভূতি-বর্ণিত সীতার জীবনমুক্তি বা অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত সমগ্র রামায়ণ যেন পঞ্চবটী ভূমির সম্মুখে প্রতিনিয়ত পঠিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই পঞ্চবটী অতি পবিত্র ও প্রাচীন স্থান; ভারতের ইতিহাসে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে, পৃথিবীর সাহিত্যে পঞ্চবটী এক অপূর্ব্ব স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মহাভূমিতে আমি, আমার জীবনে, দুইবার উপস্থিত হইয়াছিলাম; এই প্রস্তাব দণ্ডকারণ্যের মধ্যে বসিয়া লিখিয়াছি; দণ্ডকারণ্যের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিবার যোগ্য; হিন্দুর ও ইংরাজের পঞ্চবটী এতদুভয়ে কত প্রভেদ, তাহা এই প্রস্তাবে পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন। এই প্রস্তাব রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক; ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা ইহাতে অল্পই যোজনা করা গিয়াছে।

কলিকাতা হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে লাইন অনুসরণ করিয়া বোম্বে যাইতে হইলে, পথিমধ্যে নাসিক-রোড্ ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া যায়। জব্বলপুর হইতে এই ষ্টেশন ৫০০ মাইল এবং বোম্বে হইতে প্রায় ৬০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। রাজপুতানায় আবুরোড্ অথবা হিনডন্ রোড্ ষ্টেশন হইতে আবু এবং হিনডন্ নগর যেরূপ রেলওয়ে প্লাটফরম হইতে দূরবর্ত্তী, নাসিক-রোড্ষ্টেশন হইতে নাসিক নগর সেইরূপ দূরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে নাসিক নগর প্রায় তিন ক্রোশ; এই নাসিকের অপর নাম পঞ্চবটী বা দণ্ডকারণ্য। সিংহল দ্বীপ যেমন সংস্কৃত রামায়ণে লঙ্কা বলিয়া প্রসিদ্ধ, নাসিক নগর বাল্মিকী রামায়ণে পঞ্চবটী বা দণ্ডকারণ্য বলিয়া পরিচিত। লঙ্কার ইংরাজি ঐতিহাসিক নাম সিলোন বা সিংহল, পঞ্চবটীর ইংরাজী নাম নাসিক। সিংহল শব্দ যেমন পালিভাষার অভিধানের অন্যতম শব্দ, মহারাষ্ট্র ভাষায় নাসিক শব্দও তেমনি অন্যতম মারাঠী শব্দ। মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলেন, তখন এখানে মনুষ্যাবাস ছিল না; চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান মহারণ্যে সমাবৃত ছিল। শতযোজনব্যাপী এই মহাবনে কেবল হিংস্র শ্বাপদকুল নিরন্তর চীৎকার করিত এবং স্থানে স্থানে ধ্যাননিরত যোগীবৃন্দের কুটীর-নিঃসৃত ধূম্ররাশি গগন পথে দেখা যাইত। রামের বনবাস কাল সমাপ্ত হইলে, রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা শেষ হইলে, অযোধ্যার বীরেরা মহারণ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, পঞ্চবটী যখন পবিত্র তীর্থ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হয়, তখন নানাস্থান হইতে দলে দলে হিন্দু গৃহস্থ আসিয়া গোদাবরী তটে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে এই স্থান জনপদে পরিণত হইলে, ইহার নাসিক নাম হয়। নাসিক শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, সূর্পনখার এখানে নাসিকা ছেদন হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাসিক নাম হইয়াছে; কেহ বলেন, খান্দেশী ভাষায় নাসিক শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ বা পবিত্র; কোন কোন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন, ডেকান (Deccan)

এবং কঙ্কান (Concan) এতদুভয়ের মধ্যে নাসিক অবস্থিত বলিয়া, মহারাষ্ট্র ভাষায় ইহার নাসিক নাম হইয়াছে। যাহা হউক, গোদাবরী নদীতটস্থ এই নাসিক নগর পঞ্চবটী বা দণ্ডকারণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। কলিকাতা-তলবাহিনী গঙ্গার এক দিকে যেমন হাবড়া, অপর দিকে কলিকাতা, গোদাবরীর একদিকের তটে তেমনি নাসিক, অপর দিকের তটে দণ্ডকারণ্য; মধ্যে নদীর সামান্য ব্যবধান। নদীর উভয় কূল মন্দির মালায় পরিপূর্ণ; এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যপ্রদ এবং ভূমি উর্ব্বরা। তিন ক্রোশ দূরে (গঙ্গাপুরে) নয়টি পুরাতন মন্দির এবং একটি সুন্দর জলপ্রপাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। নাসিক হইতে দশ ক্রোশ দূরে সুবিখ্যাত ত্রিম্বক নগর ও ত্রিম্বক শৈল, এই শৈল হইতে গোদাবরী নিঃসৃতা হইয়াছে, পর্ব্বতের এই অংশের নাম গোমুখী, গোমুখী স্বর্ণে আচ্ছাদিত। নাসিক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। বাঙ্গালার হুগলী জেলা যত বড়, নাসিক তত বড়। সার্দ্ধ দুই ক্রোশে সুবিখ্যাত লোণা গুহা, বৌদ্ধ শ্রাবকদিগের তপস্যা স্থানের চিহ্ন রূপে এখনও বর্ত্তমান। প্রায় দুই মাইল দূরে সারণপুর নামে একখানি গ্রাম আছে, ইহা জনৈক জর্ম্মণ ভ্রমণকারী কর্ত্তৃক স্থাপিত। অরণ্য ও পাহাড় কাটিয়া তিনি এই গ্রাম বসাইয়াছেন, এই গ্রামে হিন্দু নাই, বহু সংখ্যক দেশীয় খ্রীষ্টানের বসতি। এই গ্রামের পার্শ্বে দাত্রীকুলাগ্রগণ্যা অহল্যা বাইয়ের কূপ এবং মন্দির এখনও বর্ত্তমান। সারণপুরে, নাসিকের সমুদয় ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারী বাস করেন। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ এবং প্রাকৃতিক শোভা অত্যন্ত মনোহারিণী। গ্রামটি সহরের মিউনিসিপালিটীর অন্তর্ভুক্ত নহে বটে, কিন্তু দেশীয় ও ইউরোপীয় খ্রীষ্টানের পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা দেখিলে নগরের মিউনিসিপালিটীকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। নাসিকে নানা প্রকার অতি উৎকৃষ্ট মৎস্য, ফল, ফুল, মূল এবং শাক সবজী পাওয়া যায়। অনেক দিন পূর্ব্বে বোম্বায়ের তদানীন্তন গবর্ণর সারজর্জ্জ কাম্বেল সাহেব লিখিয়াছিলেন* "যদি কখনও কলিকাতা বা সিমলা হইতে ভারতের রাজধানী উঠাইবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে নাসিকে গবর্ণর জেনেরলের বাসস্থান হইতে পারে।" নাসিকের আঙ্গুর বড় প্রসিদ্ধ। নগরটি সমুদ্রতট হইতে প্রায় দুই সহস্র ফিট উচ্চ। নাসিকের মাতৃভাষা মহারাষ্ট্র; নগরে ব্রাহ্মণের বাস প্রায় ছয় হাজার। অধিকাংশ যজুর্ব্বেদী।

ইংরাজী ১৮৮৮ অব্দে, বর্ষাঋতুতে, বাষ্পীয় শকটযোগে, আমি মধ্যপ্রদেশ (Central Provinces) হইতে বোম্বাই হইয়া কন্যাকুমারী (Cape Comorin) এবং সিংহল যাইতে যাইতে পথিমধ্যে নাসিকে এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন পঞ্চবটীর যে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলাম, মান্দ্রাজের কোনও তামিলবন্ধুর বাটীতে তাহা নষ্ট হইয়া

* "Sir George Campbell, in considering the most desirable seat for the Viceregal Government, in the event of Calcutta and Simla being abandoned, suggested Nasik as offering the greatest advantages in point of position, military and political, climate, &c. Its average rainfall is 35 inches. Height above sea level 1,900 feet. It has been said that Nasik derives its temperate climate from its proximity to the sea, being only about 60 miles from Bulsar, the fresh breezes from which find their way through the Peiet gorges. "The climate of Nasik", Sir George remarked, "is very healthy and delightful." The district is noted for an extensive trade in copper and brass wares. You will find excellent grapes in the district all round the year."

যায়, সুতরাং এবারের এবিবরণ নূতন। পাঠক মহাশয়দিগের বোধ হয় জানা আছে, বার বৎসরে হিন্দুর একবার "কুম্ভ" হয়; দ্বাদশ রাশি ঘুরিতে ঘুরিতে বৎসরে একবার মাত্র একটি রাশির প্রভাব বিস্তৃত হইয়া থাকে; এইরূপে রাশিচক্রের ঘূর্ণনানুসারে বৃশ্চিক, মিথুন, মীন, সিংহ, কন্যা, তুলা, কর্কট, কুম্ভ ইত্যাদির ক্রমান্বয়িক ধারামতে যখন কুম্ভ "পালা" (Turn) আইসে, তখন "কুম্ভযোগ" হয়। এই কুম্ভযোগ কখনও আলাহাবাদ(প্রয়াগ) কখনও হরিদ্বারে হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর লোকেরা কুম্ভ অপেক্ষা সিংহ রাশিকে অধিকতর পবিত্র ও মর্য্যাদা সম্পন্ন জ্ঞান করে, সেইজন্য রাশিচক্রের ঘূর্ণনে সিংহ রাশির যখন Turn (পালা) হয়, তখন বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে মহাধূমধামের পর্ব্ব পড়িয়া যায়, এই পর্ব্ব বার বৎসরে একবার হয়, ইহার নাম "সিংহমস্তা"; ইহা কখনও নাসিকের গোদাবরীতে, কখনও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা বা কাবেরীতে হইয়া থাকে। ১৮৯৬ অব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে (শ্রাবণ শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে) নাসিকে এই সিংহমস্তা হইয়াছিল; বর্ষাঋতুতে না হইলে বোধ হয় দশ বার লক্ষ লোক একত্র হইত, এবারে কেবল দুই লক্ষ যাত্রী একত্র হইয়াছিল, নগরে স্থান ছিল না। আমিও হায়দ্রাবাদ যাইতে যাইতে নাসিকে নামিলাম, সিংহমস্তার যাত্রী হইলাম। এই বিবরণ সিংহমস্তা পর্ব্বের সময়ে লিখিয়াছি।

নাসিকে আসিবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি আরঙ্গাবাদ হইয়া জগদ্বিখ্যাত ইল্লোরা (Ellara caves) গুহা দেখিতে গিয়াছিলাম, সুতরাং নাসিকে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। প্রায় দিবা একটার সময় রেলগাড়ী হইতে নামিলাম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বর্ষার বিবরণ, দ্বিতীয় কালিদাস না হইলে, ঠিক পাওয়া দুষ্কর। এরূপ লক্ষ্মীছাড়া বর্ষা জগতে বোধ হয় আর কোথাও নাই। নাসিক ষ্টেসনে নামিয়া বিদেশীকে ভাবিতে হয় না 'কোথায় থাকিব?' রেলগাড়ী হইতে নামিতে না নামিতেই, তোমার চারিদিকে অপরিচিত ব্রাহ্মণকুল আসিয়া তোমাকে ঘেরিয়া ফেলিবে, তোমার সাধ্য কি যে তুমি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া একপদ অগ্রসর হও? নরাকারের কোনও প্রাণী রেলগাড়ী হইতে নামিলেই, বহুদর্শী ব্রাহ্মণকুল ঠিক করিয়া লয়, এব্যক্তি বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী অথবা অন্য কোনও স্থানের লোক। নিশ্চয় হইলেই তোমার দেশের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিবে 'কোথা হইতে আসিতেছ? বাটী কোথায়? পিতার নাম কি? কোন্ জাতি? তোমার পাণ্ডা কে? তোমার জিলা ও থানা কোথায়? তোমার গ্রামের নাম কি?" ইত্যাদি,ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্ন আমাকেও অবশ্য জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, যে সকল মহাপ্রভু এই বিরক্তিকর প্রশ্নমালা জিজ্ঞাসা করে, তাহারা 'পাণ্ডা' নামে খ্যাত। হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডার বড়ই অধিকার। পাণ্ডাচরিত্র লিখিতে গেলে একখানি বড় পুস্তক লিখিতে হয়, সে সময় আমার নাই। এ প্রবন্ধে কোন এই অদ্ভুত চরিত্রের কিঞ্চিৎ নমুনা দিয়াছি। যদি কেহ নরদেহে পশুর স্বভাব, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রভাব, মুখে কোমলতা হৃদয়ে কঠিন ভাব এবং মনুষ্যে মনুষ্যত্বের অভাব একাধারে দেখিতে চাহ, তাহা হইলে তীর্থের পাণ্ডা প্রভুকে দেখ। হিন্দুধর্ম্মে ভক্তের ভক্তি হ্রাসের অন্যতম কারণ—পাণ্ডার পশুত্ব। সে কথা পরে বলিব।

আমি রেলগাড়ী হইতে প্লাটফরমে অবতরণ করিলাম। অবতরণ করিয়া দেখি, কুলির আবশ্যক নাই, অযাচিত হইয়া কোথা হইতে অপরিচিত ব্রাহ্মণেরা আসিয়া আমার দ্রব্যাদি নামাইয়া লইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কে? উত্তর হইল 'গম্‌থাও, গম্‌থাও, তোম্‌চা পাণ্ডা আহে।' আর এক জন তাহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল 'ক্যা ঝালা?' বালক উত্তর দিল 'চাংগ্‌লে আহে।' আমি মহারাষ্ট্রী ভাষা বুঝিতে পারি, সুতরাং অর্থ বুঝিলাম। পাণ্ডাজী 'বরে' বলিয়া, আমার জিনিসপত্র লইয়া, এক কোণে দাঁড়াইল। ক্রমে টিকিট দেখাইয়া রেলযাত্রীরা প্লাটফরমের বাহিরে আসিলে আমিও যথাসময়ে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, নানা মূর্ত্তির নানাপ্রকারের পাণ্ডা আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমাকে প্রশ্ন করিতেছে, আমি বিরক্ত হইয়া নিরুত্তর হইলাম। এমন সময়ে একজন পাণ্ডা একটা খুব বড় খাতা লইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং খাতা খুলিয়া বলিল "আমিই তোমার পাণ্ডা, তোমার পিতা ও পিতামহ পঞ্চবটীতে আসিয়া আমার বাটীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন।" আমি বলিলাম "আমার পিতার নাম কি?" সে উত্তর দিল "পাণ্ডুরং" এই নাম দক্ষিণাবর্ত্তের লোকের, বাঙ্গালীর হইতে পারে না। আমি শুনিয়া অবাক্ হইলাম, ভাবিলাম "তীর্থ স্থানে পিতামাতার বেশ শ্রাদ্ধ হয়!" আর এক জন পাণ্ডা খাতা খুলিয়া বলিল "শুনুন, আপনার ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের নাম বলিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া, যা'র তা'র নাম আওড়াইতে লাগিল। একজন পাণ্ডা বলিয়া উঠিল, "ইহাঁর পিতামহ আমাদের বাটীতে ছিলেন, নামটা ঠিক স্মরণ নাই, খাতা দেখিলে বলিতে পারি; বোধ হয় ভব—ভব—ভবগুণ"!! হাস্য আর সম্বরণ করা যায় না, হাসিয়া ফেলিলাম। এক জন পাণ্ডা বলিল, "আপনি আর কখনও নাসিকে আসিয়াছিলেন কি?" আমি বলিলাম, "হাঁ"। তোমার পাণ্ডা কে? ইহার উত্তরে বলিলাম, সেবারে যাহার বাটীতে ছিলাম, তাহার নাম স্মরণ নাই, পাড়ার নামও মনে নাই। লোকটা বলিল, সে পাণ্ডা মরিয়া গিয়াছে, আমি তাহার দাহ সময়ে উপস্থিত ছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমিই তোমার পাণ্ডা হইলাম। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে এক পাণ্ডা বলিল, চিনিয়াছি, তুমিই (অনেক দিন হইল) আমার বাটীতে আসিয়াছিলে, ঠিক এই চেহারাই বটে, ঐ রকম দাড়ী, এই রকম কাপড় চোপড়, ইংরাজী জানে, মুসলমানের ভাষা খুব বলিতে পারে, খুব তামাক খায়, ইত্যাদি। আর এক পাণ্ডা উহাকে বলিয়া উঠিল, না, না, আমারই ইনি যজমান, আমার এখনও স্মরণ আছে, ইনি অধিক ভাত খাইতে পারেন না, কলাপাতায় আমার বাটীতে ভাত খাইতে ভাল বাসিতেন, দুই বেলায় সাতগণ্ডা মাত্র রুটি আর কিছু কম দেড়সের চাউলের ভাত খান!! আমি ভাবিলাম, পরিচয়টা উত্তম হইতেছে!! এইরূপে কাহারও চালাকী যখন খাটিল না, তখন পাণ্ডারা পরস্পরে এই বলিয়া বিবাদ করিতে লাগিল যে, "আমিই ইহাঁকে প্রথমে ডাকিয়াছি ও দেখিয়াছি, সুতরাং ইনিই আমার যজমান হইবেন।" কেহ কেহ আবার খাতা খুলিল, নাম পাইল না, অবশেষে বিবাদটা মল্লযুদ্ধে পরিণত হইল। আমি, ষ্টেশন মাষ্টার ও রেলওয়ে পুলীশের

সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, তাঁহারা পাণ্ডা-দিগকে তাড়াইয়া দিয়া বলিল "যে ব্রাহ্মণ প্রথমে লইয়া আসিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ইঁহার পাণ্ডা"। যে ব্রাহ্মণ "বরে" বলিয়া এক কোণে আমার দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছিল, আমি তাহারই সঙ্গে চলিলাম। ষ্টেশন হইতে নাসিক নগর পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে আছে, কিন্তু সে সময়ে ট্রামগাড়ী ছিলনা, আমি টংগা গাড়ী ভাড়া করিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহার বাটীতে চলিলাম; ভাড়া পাঁচ আনা। টংগা অশ্বে বহন করে, ইহা ফেটনের ন্যায় একপ্রকার ঘোড়ার গাড়ী। পথিমধ্যে মাসুলের ঘর আছে, তথায় প্রত্যেক যাত্রীকে চারি আনা মাশুল দিতে হয়, এই মাশুলের টাকা মিউনিসিপালিটি গ্রহণ করেন। এই ঘরের নাম চুঙ্গীঘর অথবা Octroi post. গাড়ীতে আসিতে আসিতে অগণ্য পাণ্ডার অগণ্য প্রশ্ন শুনিতে হইয়াছিল, কেহ কেহ বা "আম্‌চা যাত্রী আহে" "মাজা যাত্রী আহে" বলিয়া আমাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া তাহার ঘরে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমার ব্রাহ্মণ পাণ্ডা কাহারও কথা শুনিল না। বেলা ৫ টার সময় ব্রাহ্মণের বাটীতে নামিলাম। নামিয়া দেখি, ব্রাহ্মণের সমুদয় বাটীটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ঐ ভাঙ্গাবাটীর মেরামত হইতেছে, থাকিবার একটি মাত্র ঘর, তাহাতেও ছাদ হইতে ঘরের মধ্যে জল পড়ে, চতুর্দ্দিকে মূত্র ও পুরীষের দুর্গন্ধ, যে দিকে তাকাও সেই দিকেই নরকের দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, ঐ বাটীর এক কোণে দুইটি কুটীর আছে, তাহাতে তিনজন "সিওাল" বাস করে। এই রূপবতী যোড়শী যুবতীরা পাণ্ডার কন্যা বা আত্মীয় নহে, যাত্রীর সর্ব্বনাশ সাধন জন্য "সিওাল'দিগকে রাখা হয়। সে সকল কথা আর তুলিব না, "নব্যভারতের" শিক্ষিত পাঠকবৃন্দের নিকটে অকারণে অপরাধী হইতে ইচ্ছা করি না; কেবল এই টুকু বলিতে চাহি, হিন্দুধর্ম্মের আজি কালিকার ধর্ম্মধ্বজী প্রচারকেরা দেখিয়া যাউন, ব্রাহ্মণ-চরিত্র কি অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। অনেক দিন পূর্ব্বে, প্রথম আগমন কালে, যে পাণ্ডার বাটীতে ছিলাম, এক দিন পরে তাহার নিকট কে বলিয়া দিয়াছিল যে, আমি আবার নাসিকে আসিয়াছি। সেই ব্রাহ্মণ, এই ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া খাতা খুলিয়া দেখাইল, আমি ইহার যাত্রী নহি। নাসিকের পাণ্ডাদের মধ্যে এই নিয়ম আছে যে, যে যাহার পাণ্ডা, সে আপনার যাত্রীকে অবাধে লইয়া যাইতে পারিবে, অন্য কেহ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না, প্রতিবন্ধকতা করিলে পাণ্ডার পঞ্চায়তী সভা কর্ত্তৃক সে ব্যক্তি দণ্ডিত এবং পাণ্ডাগিরীতে অনধিকারী হইবে। সুতরাং এই ব্রাহ্মণ কিছুই বলিতে সক্ষম হইল না, তবুও একবার খাতা খুলিয়া দেখিল, আমাদের কেহ তাহাদের বাটীতে কখনও আসিয়াছিল কি না। যখন সন্তুষ্ট হইল, তখন আমাকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু আমাকে এ কথাও বলিয়া দিল "যদিও অপর পাণ্ডার যাত্রীকে কোনও পাণ্ডা তাহার অসম্মতিতে রাখিতে পারেনা, কিন্তু যাত্রী আপনার পাণ্ডার বাটীতে যাইতে অসম্মত হইলে আমরা রাখিতে পারি।" আমি এই নিয়মে সন্তুষ্ট হইলাম না, আমার পাণ্ডার সঙ্গে চলিলাম। যাইবার সময় ব্রাহ্মণকে অবশ্য কিছু দিয়া গেলাম। পুরাতন পাণ্ডা তাহার বাড়ীতে আমাকে লইয়া চলিল, তাহার মাথায়, বাকে, কাঁধে ও পিটে অবশ্য আমার দ্রব্যাদি রহিল।

ক্রমে এই পাণ্ডার বাড়ীতে পৌছিলাম, এখানে ও সেই দুর্গন্ধ, সেই সকল অমানুষিক অশ্লীল ব্যাপার; ঘরে ঘরে এই রূপ, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার বলিতেছি, লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহি না, নাসিকে আসিয়া হিন্দুগুরু ব্রাহ্মণের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করুন। নাসিকে ছয় হাজার ব্রাহ্মণের বসতি, ইহাদের কৃষিকার্য্য নাই, দোকান নাই, সওদাগরী নাই, চাকুরী নাই, কেবল যাত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া পেট ভরায়; মিথ্যা কথা, ছলনা, শঠতা, অশ্লীলতা, যাত্রীর চরিত্রনাশ প্রভৃতি দ্বারা গৃহস্থ পালন করে। বোম্বায়ের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুসমাজ-সংস্কারক সত্য সত্যই নাসিক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "Can ideal of priestcraft and blackmail go further?" আর একজন লিখিয়াছেন,—

> "The Demon is personified: They are more wicked than the wickedness itself. Anything good or great, noble or laudable, sacred or sublime is unknown to the Brahmans of Nasik—once the sacred abode of the holy Rama. In the name of the Hindu religion, they do all sorts of things and no vice has a name which is not known to them. The Banias of Gujerat and the Vatiahs of Cutch commit lot of rascality in their trades by which they earn money, and then they come to Panchabaty to satisfy their conscience by worshiping Godavery which is the only Public Scavenger of the Nasik Municipality and by offering silver and gold to the Brahmans who are more notorious scoundrels and blackguards than the Gujeratee Baniahs and Cutchee Vatiahs." ‡

আমি একদিন গোদাবরীতে স্নান করিতে গেলাম। সেই কল-কল-বাহিনী শ্যাম-সলিলা গোদাবরী তটে গিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। নদী কূলস্থিত প্রাচীন মন্দিরমালার মধ্যে রাম-স্তুতিগান, ঘাটের উপরে স্থিত সন্ন্যাসীবৃন্দের বেদপাট, ধর্ম্মশালায় ব্রহ্মচারীদিগের বম্ বম্ ধ্বনি এবং ব্রহ্মকুণ্ডের কুটীর হইতে রামায়ণাবৃত্তি শুনিয়া রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধা, যোগীজনপ্রিয়া, সীতা-সখী গোদাবরীর প্রস্তরময় তটে দাঁড়াইয়া প্রাবৃটের অনন্ত আকাশের দিকে তাকাইলাম; আকাশের সেই মূর্ত্তি এখনও স্মরণ আছে। তটে দাঁড়াইয়া পঞ্চবটীকে সম্মুখে দেখিলাম; শ্রীরামচন্দ্রের নব দূর্ব্বাদল-ঘন-শ্যাম মূর্ত্তি মনে পড়িল, লক্ষ্মণের জ্যোতির্ম্ময় মুখ খানি মনশ্চক্ষুতে দেখিলাম; আজানুবাহু অঙ্গদের পরাক্রম, ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, গোদাবরী তটে সীতার চিত্রাঙ্কণ, এ সকল সহসা মনে উদয় হইল; যোগীবর বশিষ্ঠের যোগোপদেশ, বাল্মীকির ধর্ম্মরক্ষা, গোদাবরী তটে ব্রহ্মদর্শী তপঃপ্রভাবশালী আর্য্য ঋষিদিগের তপস্যার কথা মনে পড়িল; কোকনদ, কহ্লার, কমল, কুমুদ, পারিজাত, মন্দার ইত্যাদির সুগন্ধি যেন চতুর্দ্দিক আমোদিত করিল; চকোর চকোরী, চক্রবাক, চক্রবাকী, রাজহংস,কুসুমাকর-সখা, ময়ূর, ময়ূরী প্রভৃতির কেকাধ্বনি যেন শুনিতেছি বোধ হইল; ঋতুরাজ বসন্তের পূর্ণ শোভায়, গোদাবরী শ্যাম সলিলের উপরে, অনন্ত নীলাকাশের নীচে, সুন্দর মেঘের কোলে, সতী সীতার পার্শ্বে, যেন নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম রঘুনাথকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম; যেন সেই প্রাবৃটের বিজলীভরা মেঘের নিম্নে, পরোপকারের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য, তীর ধনু লইয়া, জরাগ্রস্ত জটায়ুকে আনন্দ চিত্তে আত্মোৎসর্গ করিতে দেখিতে পাইলাম। রোমাঞ্চ না হইবে কেন? হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক বলে গদ্গদ হইলাম, গো-

‡ Extract from a letter received from a Mahratta friend from Munmad station on the G. I. P. Railway. (20th July, 1896.)

মাঞ্চ না হইবে কেন? পবিত্রা পুণ্যময়ী গোদাবরী গাথা হিন্দুর ভগ্ন হৃদয়ের মহা ভরসা; এই ভরসা হইতে চতুর্দ্দশ কোটি হিন্দু সন্তানকে কি স্বতন্ত্র করিতে চাও? গোদাবরি! গোদাবরি! তুমি ঈশ্বরী না হইলেও, তোমার তটে দাঁড়াইয়া কোন্ হিন্দু মস্তকাবনত না করিয়া থাকিতে পারে? অনন্তের কোলে, কুল কুল স্বরে, নাসিকের নীচে তুমি নিরাপদে নাচিতে থাক, আমি তোমার পবিত্রতাব বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিব না।

পবিত্রতার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিব না সত্য, কিন্তু পাণ্ডারা তোমার পবিত্রতা কতদিন পর্য্যন্ত রাখিবে? গোদাবরি! তোমার তটে প্রতিনিয়ত এখন যাহা ঘটিতেছে, তাহা কি কলির রামায়ণ? কলঙ্কের ভয়ে আর সে কথা তুলিব না। স্নান করিতে গিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহারই কিছু বলিতেছি। অনেকবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, গোপীবালকেরা গাইয়াছিল--

"রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে এইত বৃন্দাবন!"

গোদাবরীতটে ব্রাহ্মণ বালকেরা গাহিল—

নাসিক নগরী গঙ্গাতীরী*
দেবাচা আহে স্থান।
ইত্যাদি।

ঘাটের নীচে জলে পা দিয়া দেখি, নিমিষের মধ্যে কোথা হইতে দলে দলে ব্রাহ্মণ-পাণ্ডারা আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল; উদ্দেশ্য এই যে, স্নান করিলেই পয়সা, টাকা ইত্যাদি লইবে। বলা বাহুল্য, আমার নিজের পাণ্ডা প্রভু সঙ্গে ছিল না; পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্যে সে ঘাটে আমার স্নান হইল না, কিন্তু আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই সময়ে একহিন্দু জলে নামিয়া স্নান করিল, স্নান করিয়া উঠিতে না উঠিতে ব্রাহ্মণেরা পরস্পরে বিবাদে প্রবৃত্ত হইল, বিবাদের কারণ এই যে, সকলেই বলিল 'আমি ইহার শ্রাদ্ধ করিব;' বাস্তবিক 'ইহার' (এই মনুষ্যের) শ্রাদ্ধই বটে!! অবশেষে এক বলবান পাণ্ডা জয়লাভ করিল। সে বলিল, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, গো, রৌপ্য ও সুবর্ণ দান কর। হিন্দু বলিল—কেন? পাণ্ডা—তোমার পিতার শ্রাদ্ধ কর। হিন্দু—আমার পিতা জীবিত। পাণ্ডা—তবে তোমার মাতার? হিন্দু—মাতাও জীবিতা। পাণ্ডা—কি সর্ব্বনাশ! পিতামহের শ্রাদ্ধ কেন না কর? হিন্দু বলিল, পরমেশ্বরের কৃপায় মোটা রুটি খাইয়া ও মোটা কাপড় পরিয়া ৯৬ বর্ষ বয়সে আমার পিতামহ এখনও জীবিত। পাণ্ডা—কি সর্ব্বনাশ! এ লোকটার ঘরে যমরাজ কি দৃষ্টিপাত কত্তে ভুলে গেছে না কি? আচ্ছা বাপু, তোমার প্রপিতামহের শ্রাদ্ধ কত্তে হবে। হিন্দু বলিল, ব্রাহ্মণ দেবতা, আমার প্রপিতামহ বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই অবধি তাঁহার সম্বাদ নাই, জানি না, মৃত কি জীবিত। পাণ্ডা প্রভু অমনি বলিয়া উঠিল, তাঁহার নাম কি বল দেখি? হিন্দু—মিহিলাল। পাণ্ডা—হাঁ হাঁ মিহিলালকে আমি

* নাসিকে গোদাবরীকে গঙ্গা কহে; মধ্যভারতে নর্ম্মদাও গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বুর্হানপুরে তাপ্তীনদী, আমেদাবাদে গোমতী, মান্দ্রাজের ত্রিপতি নগরীস্থ বড় বড় পুষ্করিণী সমূহ গঙ্গা নামে পরিচিতা। গঙ্গার নামে ব্রাহ্মণের পেট ভরুক ক্ষতি নাই, কিন্তু মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া কয় দিন চলিবে? পাণ্ডারা গোদাবরীকে গঙ্গা অপেক্ষা অধিকতর মাহাত্ম্য-পূর্ণা বলে; উদ্দেশ্য এই যে, যাহা কিছু খরচ করিতে হয়, তাহা গোদাবরী তটেই কর।

জানি,সে ব্যক্তি হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে অনেক দিন হইল মরিয়াছে, আমি তাহার মৃত দেহকে পুড়িতে দেখিয়াছি। তুমি তাহারই শ্রাদ্ধ কর। হিন্দু—আপনার সম্বাদ সংশয়-ব্যঞ্জক, না জানিয়া শ্রাদ্ধ হয় না। পাণ্ডা—তবে কি কেহই তোমার মরে নাই? কি সর্ব্বনেশে লোক তুমি!! হিন্দু—মরিবে না কেন? জগতে অমর কে? আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্প্রতি মরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত পুত্র আছে। পাণ্ডা বলিল, 'কনিষ্ঠভ্রাতা পুত্রবৎ; আইস, তাহারই শ্রাদ্ধ করাইব।' অবশেষে কাহার শ্রাদ্ধ হইল,জানি না, হিন্দুকে ৯।৵০ দিতে হইল। তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পাণ্ডা বলিল, গো দান কর। এই শূদ্র হিন্দুকে ব্রাহ্মণ আপনার বৃদ্ধা গাভীকে ৮ টাকায় বিক্রয় করিল, শূদ্র ঐ গাভী এই ব্রাহ্মণকে দান করিল। সর্ব্বসমেৎ ১৭।৵০ লইয়া পাণ্ডা ঐ হিন্দুকে ছাড়িয়া দিল। ঘাটের আর এক স্থানে এক ব্যক্তি স্নান করিতে আসিয়াছে দেখিলাম। একটা ষণ্ডামার্কবৎ পাণ্ডা তাহার হাত ধরিয়া রাখিল এবং নাপিতকে ডাকিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাথার চুল, দাড়ী, গোপ-কামাইয়া দিল। পাণ্ডা বলিল, "এইবারে স্নান কর্, তোর মোক্ষ হবে। গোদাবরী তোর প্রতি প্রসন্না, তুই পিতৃ ও মাতৃকুলের চন্দ্রবৎ।" লোকটার হাত ছাড়িয়া দিলে, সে স্নান করিল। মধ্য প্রদেশের সেই ক্ষীণকায় ভীরু হিন্দু কাঁপিতে কাঁপিতে স্নান করিয়া উঠিলে, পাণ্ডা বলিল "শ্রাদ্ধ কর।" নবনীর বলির পাঁটার ন্যায় অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে এদিক ওদিক দেখিয়া, হিন্দু বলিল, "কাহার শ্রাদ্ধ?" আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, মৃদু হাস্য হাসিয়া বলিলাম, "তোমার শ্রাদ্ধ!" লোকটা আমার দিকে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, দেখিয়া বলিল "নমস্কার!! আপনি এখানে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা জানিতাম না।" পাণ্ডা তাহা বুঝিল, আমার দিকে তাকাইয়া বলিল "ইঙ্গীরী (অর্থাৎ ইংরেজী) যদি কথনও বন্ধ হয়, তবেই মঙ্গল।" লোকটা সাহস পাইয়া পাণ্ডার হাত ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

পাঠক মহাশয়! প্রস্তাব দীর্ঘ হইতেছে। পাণ্ডা-চরিত্রের একটু নমুনা দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। এইবারে পঞ্চবটী। আমি প্রথম যখন নাসিকে গিয়াছিলাম, তখন গোদাবরী পার হইয়া বর্ষাকালে অপর পারে যাওয়া বড়ই কষ্টকর ছিল, এবারে দেখিলাম, এক খানা নৌকা হইয়াছে এবং একটা বড় পুল্ (সেতু) বাঁধা হইতেছে। পঞ্চবটীতে আর সে মহারণ্য নাই, এখানে রামচন্দ্রের,সীতার, হনুমানের, লক্ষ্মণ প্রভৃতির মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি কুণ্ড আছে, অনেক তপোবন ও আশ্রম আছে। মাটীর নীচে একটা পাতাল ঘরে কয়েকটি মূর্ত্তি আছে, ইত্যাদি। নাসিক নগরে ভদ্রকালীর মন্দির ও মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ৫২ পীঠের মধ্যে একটি পীঠ। শিবাপমানে অপমানিতা দক্ষকন্যা যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁহার নাসিকা আসিয়া যে স্থানে পতিত হয়, তাহা (বাঙ্গালা দেশের প্রবাদ মতে) "নাসিকা" নামে খ্যাত। যাহা হউক, নাসিকের অনেক *গোঁসাই* সম্বন্ধে, কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়, বলা যাইতে পারে——

"অনেক কসাই ভাল গোঁসাইয়ের চেয়ে।"

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

গল্প।

প্রথম।

এক যে আছিল মেয়ে, সে খেলিত বনে যেয়ে,
সাজিত সে বনরাণী ফুলে ফুলে ফুলে,
তুলিয়া চামেলী বেলী, তমালের গাছে হেলি,
গাঁথিত ফুলের মালা ফুলের আঙ্গুলে !

এক যে আছিল ছেলে, এক দিন সেথা এলে,
দেখিয়া সে ফুলমালা বালিকার হাতে,
হাসি মুখে হাত মেলে, আনন্দে চাহিল ছেলে,
দিল না বালিকা, মুখ ফিরা'ল পশ্চাতে !

তার পর সেই মেয়ে, তেমনি বাগানে যেয়ে,
রোজ মালা গাঁথে, কিন্তু পরে না গলায়,
জড়াইয়া পাকে পাকে, তমালের ডালে রাখে,
এইরূপে কত মালা শুকাইয়া যায় !

১

এক যে আছিল বালা, চরণে উষার আলা,
আলয় আঙ্গিনা রূপে করিত উজ্জ্বল,
কমল-কুল্লিতে জমা, গোলাপী বরফ সমা,
শরত জ্যোৎস্না আর সুরা, পরিমল !

এক যে যুবক ছিল, এক দিন সে আসিল,
তৃষিত নয়নে বালা তার দিকে চায়,
সে দীনদৃষ্টির আগে, কত কৃপাভিক্ষা জাগে,
আপনি মাতিল বালা আপন নেশায় !

যুবক দেখিয়া তারে, দেখিল না একেবারে,
সে যেন জনম অন্ধ, চেয়ে মাটি মুখে,
এক পায় দুই পায়, শশী যেন অস্ত যায়,
ঢালিয়া সে অমাবস্যা পূর্ণিমার বুকে !

২

এক যে আছিল নারী, বিশাল পদ্মার পাড়ী,
চেয়ে চেয়ে সে রূপের না হইত সীমা,
তরঙ্গে সে ভাঙ্গি চুরি, আঠার উনিশ কুড়ি,
সাগর গ্রাসিতে চায়, ভীষণ ভঙ্গিমা !

এক যে পুরুষ ছিল, নীলাকাশ সে হইল,
রবিশশী হাসে বুকে সোণা রূপা দিয়া,
সৌদামিনী রত্নহার, কণ্ঠেতে পরায় তার,
কাদম্বিনী সমাদরে গাঁথিয়া গাঁথিয়া !

সে ত দূরে ঊর্দ্ধে অতি, বহু নীচে পদ্মাবতী,
দু'জনার বুকে তবু দু'জনার ছায়া,
দু'জনার হিংসা লোভে, দোহে মরে রোষেক্ষোভে
সে আজ পুরুষ পর, সে ত পরজায়া !

দ্বিতীয়।

এক যে আছিল দেশ, কিবা তার শ্যামবেশ,
কিবা শোভা বনে বনে তার,
কি শোভা নদীর ঘাটে, সন্ধ্যার সোণার হাটে,
বসিয়াছে মণির বাজার !
চতুর পাপিয়া পিক, নীলাম ডাকিছে ঠিক্,
মরমে আঘাত মারে তার,
ক্রেতা ও বিক্রেতা যারা, গৃহেতে ফিরিয়া তারা,
দু'জনেই করে হায় হায় !
হরিণী হরিণ গায়, কি জানি চাটিয়া খায়,
কিবা সুধা চুয়াইয়া পড়ে,
"প্রতি রোম কূপে কূপে, প্রেম কি অমৃত রূপে
রহিয়াছে পশু-কলেবরে ?"
চঞ্চল শশক ধায়, মাঝে মাঝে ফিরে চায়,
সামান্য পাতায় পড়ে ঢাকা,
"প্রেম কি অমনি তর, দেহে ছোট, লাফে বড়,
তাই বুঝি চথে চথে রাখা !"
অনন্ত ভেদিয়া হায়, আকাশে বিহঙ্গ যায়,
কোথা হ'তে কোথা করে গতি,
"প্রেমের কোথায়বাসা, কোথা করে যাওয়াআসা
কেবা জানে তাহার বসতি !"
গগনে মেঘের হন্দ্ব, ছায়াময় জোছনা
হইতেছে ধীরে ধীরে ধীরে,

"প্রেম যে হিরণ্ময়, সেও নাকি লোহা হয়,
দু'দিন না যাইতে অচিরে !"

১

এক যে আছিল যুবা, বেহদ্দ বাঙ্গাল পুবা,
অসভ্য সে অশিক্ষিত অতি,
কাননের যথা তথা, দেখিছে সে এই কথা,
ভাবিছে এ প্রেম-পরিণতি !
নির্জন নির্ঝর তীর, নাহি নড়ে তরুশির,
নাহি নড়ে ঘাস লতা পাতা,
বসিয়া 'গজার' তলে, পা বাখিয়া নীল জলে,
করতলে অবসন্ন মাথা,—
কে যেন আসিবে হায়, আছে কার প্রতীক্ষায়
দিন যায় সে ত নাহি আসে,
না পেয়ে তাহার লাগ, খোজে তার পা'র দাগ
চেয়ে ঘাটে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে !
সে গেছে ছ'মাস আগে, তার পরে কত বাঘে,
মহিষে ভল্লুকে জল খায়,
সে চিহ্ন গিয়াছে মুছে', সে দাগ গিয়াছে ঘুচে',
সে তীক্ষ্ণ নখর ক্ষুরে হায় !
উদ্ভ্রান্ত বিশ্বাসে খালি, সে বোঝে গিয়াছে কালি
আজো বা আসিয়া গেছে ফিরে,
না পেয়ে তাহার দেখা, খুজে গেছে একা একা
কলসী ভরিয়া নদীনীরে !
তাই সে চমকি উঠি, ঘাটে যায় দ্রুত ছুটি,
অঞ্জলি ভরিয়া তুলি জল,
ধুইছে বাঘের পারা, মহিষের শিং-মারা,
কোথা চিহ্ন চরণ-কমল ?
আবার উন্মত্তবৎ, খোজে গিয়া বনপথ,
কোথাও পড়েছে কি না ফুল,
ভাবি নব মেঘভার, যদি বনবায়ু তায়,
উড়াইয়া থাকে নীল চুল !
সেই যে পথের কাছে, দু'টি'গোদা আম'গাছে,
বনযুই করেছে আঁধার,
যেন বনদেবালয়ে, দিবসে জোনাকি চয়ে,
মাণিক-প্রদীপ জ্বলে তায় !

সেই লতাকুঞ্জঘরে, কত দিন দু'পহরে,
বসেছিল তারা দুই জন,
সেখানের ধুলা বালি, মাটী মাখা আছে খালি
তপ্ত অশ্রু তপ্ত আলিঙ্গন !
সেখানে খুজিতে গিয়া, ধরিল সে জড়াইয়া,
ক্ষিপ্ত যুবা অধীর আকুল,—
শিলাসম বনমাটী, দাপটে উঠিল ফাটি,
গর্জ্জনে ঝরিল যুই ফুল !
অদূরে আছিল তারি, ক'টী গৃহস্থের বাড়ী,
সে বিশাল কানন মাঝারে,
তারা করে হৈ হৈ, মেয়ে কই—বউ কই ?
কুকুর ডাকিছে বারে বারে !

২

পর দিন ভোরে উঠি, সকলে আসিল ছুটি,
সে বিজন নিঝরের পার,
সাবধানে সবে যায়, ডান্ বাঁয় ফিরে চায়,
পথে দেখে কয় খানি হাড় !
আরো কিছু আগে যেয়ে, ডান্ দিকে দেখে চেয়ে
সেই লতা ঘরের দুয়ারে,
অর্দ্ধ ভুক্ত নরদেহ, পড়িয়া রয়েছে কেহ,
চিনিতে না পারা যায় তারে !
হাত নাই, পা আছে, ছিন্ন মুণ্ড তারি কাছে,
মুখে তার নাহি মাংস লেশ,
নাহি গাল গ্রীবা ঠোঁট, দাঁত গুলি আছে মোট,
বিকট সে রাহুর বিশেষ !
বক্ষ ও উদর ছিন্ন, নাহিক মাংসের চিহ্ন,
নাড়ীভুঁড়ি পড়ে আছে পাশে,
মাথা বিষ্ঠা ছিন্ন আঁতে, মক্ষিকা উড়িছে তাতে,
প্রভাতের বনের বাতাসে !
যত ছিল স্থূল পেশী, তাহাই খেয়েছে বেশী,
নিতম্ব উরুর আছে হাড়,
নাহিক রক্তাক্ত মাটী, সমস্ত খেয়েছে চাটি,
মোল্লা-দাস্ত রুক্ষেছে তাহার !

৩

দূরে ম্লান ছিন্ন বাসে, কি যে বান্ধা একপাশে,
মেদমজ্জারুধিরে আপ্লুত,
খুলিয়া একটী নারী, চিনিল সে লেখা তারি,
ছিঁড়িয়া ফেলিল তাহা দ্রুত !
চাহিল সে ঘৃণা ভরে, মৃতের মুখের পরে,
ছিন্নভুক্ত চিনিল সহসা,
আরো যেন অবজ্ঞায়, ঠেলিল সে বাম পায়,
চরণে লাগিল রক্ত বসা !
সে পদ চুম্বনে তুণ্ড, কৃতার্থ হইল মুণ্ড,
মরিয়া পূরিল মনস্কাম,
অরুণে পাতার ফাকে, স্বর্গগামী আত্মা তাকে,
রক্তাক্ত সহস্র করে করিল প্রণাম !

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (৪)

জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে ভারতীয় দার্শনিকগণ কিরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা এই প্রবন্ধের বিগত তিন সংখ্যায় প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, ন্যায়কার এবং সাংখ্যকার উভয়েই ব্রহ্মকে জগতের কর্ত্তা বা নিমিত্ত কারণ বলিয়াছেন; কিন্তু ন্যায়মতে পরমাণু ও সাংখ্যমতে প্রকৃতি এজগতের উপাদান-স্বরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমাণুরূপ উপদান লইয়া তাহাদেরই সংযোগবিয়োগবলে ব্রহ্ম এই জগৎ রচনা করিয়াছেন—ইহাই ন্যায়মত। সাংখ্যমতে, সত্ত্ব,রজ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে পরিণত করিয়া, পুরুষ বা ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদান্ত, ইহাঁদের ন্যায়, এজগতের আর ভিন্নরূপ কোন উপাদান স্বীকার করেন নাই;—মায়া-সহকৃত স্বয়ং ব্রহ্মই এই জগতের উপাদান। বেদান্ত কিরূপে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় যথা শক্তি বিবৃত করিয়াছি। সৃষ্টির কারণ এবং এবং প্রণালী সম্বন্ধে, ভারতীয় সুপ্রসিদ্ধ দর্শনত্রয়ের সিদ্ধান্ত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আজ আমরা আর কয়েকটী কথা বলি য় জন্য পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। পাঠক দেখিয়াছেন,—ন্যায় এবং সাংখ্য উভয়েই যে যথাক্রমে পরমাণু ও প্রকৃতিকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়াছেন,—একথা বেদান্ত স্বীকার করেন না। বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত এজগতের অন্য কোন রূপ উপাদান স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। ন্যায়ের পরামাণুবাদ ও সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, এ উভয় মতই বেদান্ত কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে। এখন আমরা সেই খণ্ডন-প্রণালীর কথাই বলিব। বর্ত্তমান সংখ্যায়, কিরূপে ও কি যুক্তিবলে বেদান্ত দর্শন ন্যায়ের সেই সুদৃঢ়স্থাপিত পরমাণু-তত্ত্বের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইব।

আমরা বলিয়াছি, পৃথিবী জল বায়ু ও তেজের অতীব সূক্ষ্মতম এবং অবিভাজ্য চরম অবয়বকে "পরমাণু" বলিয়া ন্যায়দর্শন স্বীকার করিয়াছেন। পরমাণু নিত্য, উহাদের বিনাশ নাই। এই চতুর্ব্বিধ সূক্ষ্মতম নিরবয়ব নিত্য পরমাণুই এই বিশাল জগতের মূলকারণ (এই প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যা দেখুন)। সৃষ্টিকালে, এই পরমাণুতে ক্রিয়া

উৎপন্ন হয়। উৎপাদ্যমান ভূতজাতের অদৃষ্টই সেই ক্রিয়ার কারণ বা প্রবর্ত্তক। এই ক্রিয়া নিবন্ধন একটী পরমাণু অন্য একটী পরমাণুতে সংযুক্ত হইয়া মিলিত হয়। এবং মিলনাদি হইতেই দ্ব্যণুকাদি ক্রমে পরিদৃশ্যমান জল, পৃথিবী, গিরি, সমুদ্রাদি যাবতীয় ভূতজাত সৃষ্ট হয়। পরমাণু-গত রূপাদিও, সৃষ্টজগতে অনুস্যূত বা অভিজাত হইয়া পড়ে। ইহাই ন্যায়মত।

বেদান্ত, ন্যায়-প্রবর্ত্তিত এই পরমাণুবাদের যথাযথ খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। বেদান্তের যুক্তি সমূহ প্রধানতঃ নিম্নে বিবৃত হইল।

১। সৃষ্টিকালে, একটী পরমাণু অপর একটী পরমাণুর সহিত মিলিত হয়। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, পরমাণুতে সৃষ্টি কালে 'ক্রিয়া' উৎপন্ন হয়। ক্রিয়া হইলেই তাহার একটী 'কারণ' আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু, বিনা কারণে কার্য্য উৎপাদিত হইতে পারে না। আবার, কার্য্য উৎপাদিত না হইলে একটী পরমাণুও অন্য অণুতে মিলিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেও পারে না। সুতরাং সৃষ্টির প্রাক্কালে পরমাণুতে যে পরস্পর মিলনরূপ ক্রিয়া উপস্থিত হইল, তাহার অবশ্যই একটী কারণ স্বীকার করিতেই হইবে। এখন, সেই কারণটী কি? কে তখন পরমাণুতে এই ক্রিয়া উৎপাদন করিল? ইহার দুইটী উত্তর হইতে পারে। প্রথম উত্তর এই যে, প্রযত্ন বা অভিঘাতে এইরূপ কোন দৃষ্ট কারণ স্বীকার করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যদি কোন দৃষ্ট কারণ স্বীকার না করা যায়, তবে অদৃষ্টকেই কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রযত্ন বা অভিঘাতাদি দৃষ্ট কোনরূপ কারণেই পরমাণুতে মিলন-ক্রিয়া উৎপাদিত করিতে পারে না। কেননা, "প্রযত্ন" আত্মার একটী গুণবিশেষ। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন শরীর সৃষ্ট হয় নাই, তখন প্রযত্ন থাকাও সম্ভব নহে। শরীর থাকিলে, তবে ত মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইয়া প্রযত্ন হইতে পারে। শরীর না থাকিলে প্রযত্ন আসিবে কোথা হইতে? আবার, বায়ুাদির অভিঘাতে যেরূপ বৃক্ষাদির চলন হয়, সেইরূপ "অভিঘাতকেও" কারণ বলা যায় না। অভিঘাত বেগ-জনিত সংযোগ বিশেষ মাত্র। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে বেগাদিরও ত অভাব ছিল। সুতরাং অভিঘাতই বা আসিবে কোথা হইতে? অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রযত্ন বা অভিঘাতাদি কোনরূপ দৃষ্ট কারণই পরমাণুর সংযোগের কারণ হইতে পারিতেছে না। আবার দেখ, "অদৃষ্ট" ও কারণ হইতে পারে না। কেননা, এ অদৃষ্ট কাহার? কাহার অদৃষ্ট বলে একটী পরমাণু অন্য পরমাণুতে সংযুক্ত হইয়া জগৎ-সৃষ্ট হইল? এ অদৃষ্ট কি উৎপৎস্যমান আত্মার, অথবা ঐ পরমাণুর? কিন্তু বুঝিয়া দেখ, অদৃষ্ট অচেতন। অদৃষ্ট যাহারই হউক্, উহা যখন নিজে অচেতন, তখন অচেতন পদার্থ চৈতন্য দ্বারা অধিষ্ঠিত বা চালিত না হইলে কখনই কোনও ক্রিয়া উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। আবার জনিষ্যমান আত্মার (জীবাত্মা) সহিত অদৃষ্টের তখনও কোন সম্বন্ধ হয় নাই বলিয়া, অদৃষ্ট কারণ হইতে পারে না। আর যদি এরূপ বলা যায় যে, আত্মা সর্ব্বব্যাপী, অতএব সর্ব্বব্যাপী আত্মার সহিত অদৃষ্টের সম্বন্ধ নিয়তই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যদি

অদৃষ্টের সহিত আত্মার নিয়ত সম্বন্ধই রহিয়াছে স্বীকার করা যায়, তবে নিয়তই জগৎ-সৃষ্টি হউক্ না কেন? নিত্য-সম্বন্ধ থাকিলে, নিত্যই সৃষ্টি হইবে। সুতরাং পরমাণুবাদ নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ।

২। একটী পরমাণু অন্য একটী পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগৎ সৃষ্ট হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, একটী পরমাণুর যে অন্যটীর সহিত সংযোগ হয়, ইহা কিরূপ "সংযোগ"? ইহা কি সর্ব্বাত্ম-সংযোগ, অথবা প্রাদেশিক-সংযোগ? একটী অণু অন্যটীর সহিত সংযুক্ত হইয়া একেবারে মিলিয়া এক হইয়া যায়, না একটী অণুর একদেশে বা পার্শ্বে অপর একটী অণু আসিয়া সংযুক্ত হয়? যদি সর্ব্বাত্ম-সংযোগ বল, তবে দ্ব্যণুকাদিও পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য থাকিয়া যায়। যেহেতু, দুইটী মিলিয়া এক হইয়া গেলে, আর স্থূল বা বড় হইতে পারিল না। সুতরাং দ্ব্যণুকাদি সমস্ত পদার্থই সেই পরমাণুবৎ অস্থূল ও নিরবয়ব হইল। আর যদি প্রাদেশিক সংযোগ বল, তবে পরমাণুকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেন না, বস্তু সাবয়ব (Extented) না হইলে, তাহার একদেশ বা পার্শ্ব থাকা সম্ভব হয় না। অতএব এ কিরূপ সংযোগ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং সৃষ্টির প্রাক্কালে পরমাণুদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ হয়, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না।

৩। স্বভাব (Tendency) লইয়া ধরিতে গেলেও পরমাণুবাদ স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। পরমাণুর একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা স্বভাব স্বীকার করিতেই হইবে। যদি বলা যায় যে, পরমাণু সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি-স্বভাব-বিশিষ্ট, অর্থাৎ কার্য্য-ব্যগ্র বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ, তাহা হইলেও, প্রবৃত্তির নিত্য-বর্ত্তমানতা বিধায় প্রলয় অসম্ভব হইয়া উঠে। আবার যদি পরমাণুকে নিত্য-নিবৃত্তি-স্বভাব বিশিষ্ট বলা যায়, তবে আর সৃষ্টি হইতে পারে না। আবার একাধারে পরস্পর বিপরীত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দুইটী স্বভাবও থাকিতে পারে না। আর যদি পরমাণুর কোনও রূপ স্বভাব থাকা স্বীকার না কর, তবে যখন যেরূপ নিমিত্ত কারণের বশীভূত থাকিবে, পরমাণুও সেইরূপ কার্য্য করিবে, ইহা অবশ্যই বলিতে হয়। কিন্তু কাল ও অদৃষ্টাদি নিমিত্ত কারণের সর্ব্বদা সদ্ভাব হেতু, সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইত। আর যদি কোন নিমিত্ত কারণের সদ্ভাব স্বীকার না কর, তবে নিমিত্ত কারণের অভাব-বশতঃ এবং নিজেরও প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ কোনও স্বভাব না থাকা হেতু, কখনই সৃষ্টি হইবে না, ইহাও স্বীকার করিতে হয়।

৪। ন্যায় মতে, পরমাণু রূপাদি-বিশিষ্ট। ন্যায় বলেন, এই যে রূপ গুণাদিবিশিষ্ট অশেষবিধ সৃষ্ট পদার্থরাশি দেখিতেছ, উহারা সেই চতুর্ব্বিধ রূপাদি-বিশিষ্ট নিত্য পরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়ের এরূপ উক্তিও যুক্তিশূন্য। যদি পরমাণুকে রূপাদিবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পরমাণু স্থূল ও অনিত্য হইয়া পড়ে। কেননা, যাহারই রূপাদি আছে, তাহাই তাহার কারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। যেমন বস্ত্র তন্তু হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বস্ত্র, তন্তু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। আবার ঐরূপে, তন্তু ও উহার কারণ স্বরূপ অংশু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। সুতরাং এই নিয়মানুসারে, ন্যায়দর্শনের রূপাদিবিশিষ্ট

পরমাণুও, উহার স্বকারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ন্যায়-মতে পরমাণুর কোনও কারণান্তর নাই, এবং উহা নিত্য এবং সূক্ষ্ম। সুতরাং ন্যায় মত তত সমীচীন নহে।

৫। একটী পদার্থ, যদি অপর একটী পদার্থ অপেক্ষা সমধিকগুণ বিশিষ্ট হয়, তবে সেই পদার্থ, অপর পদার্থটী অপেক্ষা নিশ্চয়ই স্থূল হইয়া পড়িবে, ইহাই সার্ব্বভৌম-নিয়ম। কোথাও এ নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পার্থিব পরমাণু অপেক্ষাকৃত অধিক-গুণ বিশিষ্ট এবং জলাদির তদপেক্ষা এক একটী গুণ কম। যেমন পৃথিবীর গুণ—গন্ধ রস, রূপ ও স্পর্শ; জলের গুণ রূপ, রস ও স্পর্শ; তেজের গুণ—রূপ ও স্পর্শ; এবং বায়ুর গুণ কেবল মাত্র স্পর্শ। অতএব এই চতুর্ব্বিধ ভূতের মূল পরমাণুও এইরূপ ন্যূনাধিক গুণ বিশিষ্ট বলিতে হইবে। কিন্তু পরমাণুর এইরূপ ন্যূনাধিগুণ কল্পনায় দোষ হয়। কেননা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যদপেক্ষা যাহার গুণ অধিক, সে তদপেক্ষা স্থূল। সুতরাং পরমাণুও স্থূল হইয়া পড়ে। বায়বীয় পরমাণু অপেক্ষা তৈজস পরমাণু এবং তৈজস পরমাণু অপেক্ষা জলীয় পরমাণু অধিক স্থূল হইয়া পড়ে। এই গুরুতর দোষ নিবারণের জন্য যদি, এক একটী পরমাণু এক একটী মাত্র গুণের আধার, এইরূপ স্বীকার করা যায়, তাহাতেও প্রবল দোষ আইসে। কেননা, সেরূপ স্বীকার করিলে, অর্থাৎ এক একটীতে এক একটী মাত্র গুণ থাকিলে, তেজে কখনও স্পর্শের উপলব্ধি হইত না। অথবা জলাদিতেও রূপ স্পর্শাদির উপলব্ধি হইত না। আর যদি বলা যায় যে, চতুর্ব্বিধ পরমাণুর প্রত্যেকটীতেই চারিটী করিয়া গুণ আছে, তাহা হইলে জলেতেও গন্ধের উপলব্ধি হইত। এবং তদ্রূপ তেজে গন্ধ ও রসের এবং বায়ুতে গন্ধরূপ ও রসের উপলব্ধি হইত। কিন্তু সেরূপ হইতে ত কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায়, ন্যায়দর্শনের পরমাণুবাদ যুক্তিবলে খণ্ডনীয় হইয়া পড়ে।

বেদান্ত এইরূপে পরমাণুবাদ খণ্ডিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বারান্তরে আমরা প্রকৃতি পুরুষবাদ সম্বন্ধে বেদান্তের খণ্ডন আলোচনা করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণব দর্শন। (২)

১৮। বস্তুতঃ মহত্তত্ত্বরূপ বীজকোষের ব্যবহারোপযোগী সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তি হইয়া সৃষ্টির গঠন এক প্রকার সুসম্পন্ন না হইলে এই ঈশ্বরাভিমান সমষ্টীভূত ইন্দ্রিয় গ্রাম (universal sensorium) সমন্বিত হইয়া, ব্যবহারোপযোগী পূর্ণস্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। এই জন্য এই অব্যক্তা অপরা শক্তির অব্যক্ত অভ্রান্ত বীজ স্বরূপ মহত্তত্ত্বে ভগবান কাপিল দেব তখন ঈশ্বরাভিমানের স্ফূর্ত্তি বা স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা, অনুসন্ধানে না পাইয়া 'ঈশ্বরাসিদ্ধে' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন। কি ব্যষ্টীভূত কি সমষ্টীভূত স্বরূপে

দেহাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের ব্যবহারোপযোগী পূর্ণ অভিব্যক্তি ব্যতীত অভিমান বা আত্মবুদ্ধির ব্যবহারোপযোগী পূর্ণ ব্যক্তিত্ব কুত্রাপি কখনও সম্ভাবিত নহে। সৃষ্টির ক্রম বিকাশ-প্রাপ্তি কালে যখনই মহত্তত্ত্বাধারে সমষ্টীভূত অভিমান ও আত্মবুদ্ধি বা ঈশ্বর বুদ্ধি সংজাত হইল, তখনই তাহাতে ঈশ্বর সত্তা সংসিদ্ধ হইল। তৎপূর্ব্বে এই মহত্তত্ত্বাধারে ঈশ্বর-সত্তা অভিব্যক্তিতে অবশ্যই অসিদ্ধ ছিল, বলিয়া, সিদ্ধান্ত হইবার স্থল থাকে। পূজ্যপাদ মহর্ষি ব্যষ্টীভূত অহংতত্ত্ব স্বরূপেতেই অভিমান ও আত্মবুদ্ধিকে প্রথম স্থাপনা করিলেন; কেননা, তিনি ধ্যানযোগে অনুভব করিয়াছিলেন যে, এই অভিমানের অব্যক্ত বীজ ক্রমে স্থূলদেহ বা অন্নময় কোষ-গত হইয়া পরিস্ফুট ও প্রবুদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু নিখিল অহংতত্ত্ব স্বরূপের সমষ্টি, যে আধার অবলম্বনে অঙ্কুরিত ও তদেকাত্ম হইয়া অবস্থিত; সেই ঘনপ্রজ্ঞ বৈজিক মহত্তত্ত্ব-স্বরূপে কোন ঈশ্বরাভিমান বা সমষ্টীভূত আত্মবুদ্ধি-স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা ও সূচনা, ভগবান্ মহর্ষির অনুভূতি গোচর হয় নাই; ইহা অবশ্যই আশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ব্যষ্টিজীব যখন সমষ্টীভূত বৈজিক মহত্তত্ত্ব-স্বরূপের কায়ব্যূহের অন্তর্গত, তখন ব্যষ্টীভূত অভিমান ও আত্মবুদ্ধি স্ফুরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহত্তত্ত্বের সেই বিরাট দেহাভ্যন্তরে যে, এই সমস্ত স্ফূর্ত্তি সঞ্চিত ও সমুদ্ভূত হইয়া এক বিরাট ইন্দ্রিয় গ্রামের অভিব্যক্তি সম্পাদিত হইতে থাকিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী ও ও অপরিহার্য্য ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই ঈশ্বরস্বরূপ নিখিল, ব্যক্তাব্যক্ত-ইন্দ্রিয় গ্রামে তদেকাত্মভাব সমন্বিত হেতু স্বভাবতঃই নিখিল সংসারের ও যাবতীয় ইন্দ্রিয় গ্রামের গতির নিয়ামক ও বিধায়ক রূপে জীবের শ্রদ্ধাভক্তির স্থল ও উপাস্য হইয়াছেন। সর্ব্বত্রই অভিমান হইতে শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। ঈশ্বরের ঐশী শক্তির স্ফূর্ত্তিও তাঁহার ঐশ্বরিক অভিমান সম্ভূত। এই *ক্রমাভিব্যক্ত ক্রিয়াত্মক শক্তিধাম* বা তদীয় মূলাধারস্থিত কারণাত্মক পরম অব্যক্ত নিত্যধাম, সর্ব্বকালই যেমন সৃষ্টির প্রয়োজনে সর্ব্বত্র উপযুক্ত স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিয়া থাকেন, তেমনি ভক্তের সাময়িক প্রয়োজন, অভাব ও মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ ও পূর্ণ করিবার জন্য— প্রার্থীর সাময়িক সঙ্কল্প ও প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য, প্রযোজনস্থলে, সাময়িক বিশেষ ব্যবস্থারও বিধান করিয়া থাকেন। এই সাময়িক বিশেষ বিধান সাধারণ ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ণ হইবার স্থলাভাব হইলে স্বতঃই অভ্যুত্থিত হইয়া থাকে। এই বিশেষ বিধান ভক্তের প্রয়োজন হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া প্রকট লীলারূপ ধারণ করিয়া থাকে।

১৯। এই অব্যক্ত প্রজ্ঞান ঘন প্রশান্তি সমুদ্রে বা মায়াধিষ্ঠিত ঈশ্বরে অনাদি অতীতের ও বর্ত্তমানের সমস্ত চেতনাচেতন পদার্থ ও ঘটনাপুঞ্জ প্রতিফলিত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের অভিব্যক্তব্য যাবতীয় চেতনাচেতন পদার্থ বৈজিক বা ঘনীভূত ভাবে অবস্থাপিত এবং ভবিতব্যের ঘটনাপুঞ্জ আনুপূর্ব্বিক ভাবে সুচিত্রিত। তাহার মূলাধারে সমাধি সমুদ্র শায়ী ত্রিগুণাতীত পরম সত্তা সেই মহত্তত্ত্বের অন্তর্ভূত অন্তরাত্মা রূপে বিরাজিত। ভক্তের ত্রিগুণাত্মক বা ত্রিগুণাতীত সাময়িক প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, কোন উপযুক্ত দেহ সেই অব্যক্ত প্রশান্তি বা সমাধি সমুদ্র-গর্ভ হইতে প্রয়োজনানুরূপ

সাময়িক ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহণান্তর পিপাসু ভক্তের দীক্ষা ও লালন পালনাদির কারণ হইয়া সমুদ্ভূত হন। পরে সেই অনুগৃহীত ভক্ত-দেহ অবলম্বনানন্তর ভগবান গুরু-লীলা প্রবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। এবং সেই সাময়িক অভিব্যক্ত মূর্ত্তি যথা-ক্ষেত্রে, যথাকালে, যথাকার্য্য সমাপনানন্তর স্বকীয় অব্যক্ত সমুদ্র গর্ভে জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যান, অথবা স্বস্থানে প্রস্থান করেন। পরে পুনরায় কাল-স্রোতের বিচিত্র গতিতে সেই অব্যক্ত বীজ সৃষ্টিলীলা স্রোতে ভাসমান হইয়া যথা সময়ে যথাক্ষেত্রে স্বাভা-বিক ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, দেশ কাল ও অব-স্থার উপযোগী যথাকার্য্য সম্পাদন করতঃ স্বাভাবিক ক্রমে লীলা সম্বরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বাভাবিক লীলাদেহ অবলম্বন করিবার বহুকালকল্প পূর্ব্বে এই অব্যক্ত সাগর গর্ভ হইতে জলবুদ্বুদের ন্যায় সাময়িক ব্যক্তিত্বে ভূষিত হইয়া অব্যয় যোগতত্ত্ব বিবস্বান্‌কে উপদেশ করেন। বিবস্বান্ সেই তত্ত্বে স্বীয় পুত্র মনুকে এবং মনু স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে দীক্ষিত করেন। পরে নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এই গুরু পরম্পরাগত যোগতত্ত্ব অবগত হন। পরে এই শ্রীকৃষ্ণ যথাসময়ে স্বাভাবিক দেহে অভ্যুত্থিত হইয়া অন্যান্য কার্য্যানুষ্ঠান সঙ্গে সেই তত্ত্ব অর্জ্জুনকে উপদেশ করেন। (ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়) তলবকার উপনিষদে দৃষ্ট হয়, যে দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রহ্ম-বিদ্যা স্বরূপিনী উমাদেবীর সাময়িক উৎ-পত্তিও এইরূপে সম্পাদিত হয়। পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, আত্মতত্ত্ব সম্পন্ন এক শবদেহ এইরূপে সাময়িক ব্যক্তিত্ব অঙ্গীকার করতঃ কারণ সমুদ্রাশ্রিত শিবকে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত পুরাণাদি হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে। এইরূপে গুরুলীলা প্রবাহের প্রস্রবণ স্বরূপ ভগবান স্বকীয় বীজপুঞ্জের গর্ভকোষ হইতে অব্যক্ত বীজ বিশেষকে, অথবা কোন পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মকল্প বা সৃষ্টি প্রস্ফুটিত সদেহ বা বিদেহ সাধু বিশেষকে প্রয়োজন স্থলে সাম-য়িক উপযুক্ত ব্যক্তিত্বে ভূষিত করিয়া, আদি-গুরুরূপে সপ্রকাশ হইয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা গুরুলীলার স্রোত প্রবহমান করেন। প্রকৃ-তির অক্ষয় ভাণ্ডার স্বতঃই এইরূপে ভক্তের প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিয়া থাকেন।

২০। আমরা বীজাবস্থার অব্যক্ত অস্ফূর্ত্ত ঘন-প্রজ্ঞ মহত্তত্ত্বকে অভ্রান্ত শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া উপরে অভিহিত করিয়াছি। তাহার হেতু এই যে, সেই সৃষ্টিবীজের বিকাশ সম্ভ-বতঃ তদীয় জ্ঞাতসারে না হইলেও, তাহা অভ্রান্ত পথেই পরিচালিত হইয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ ঘন-প্রজ্ঞ মহত্তত্ত্ব কেন? সমস্ত অব্যক্ত বীজই সদেহই হউক, আর বিদেহই হউক,—উপযুক্ত দেশ কাল ও অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হইলে, অভ্রান্ত পথে পদচারণা করিয়া অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পরি-বর্দ্ধিত এবং অবশেষে পূর্ণাবয়ব লাভ করিয়া ফুলে ফলে পরিশোভিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ জাতীয় যাবতীয় সজীব লতা, ঘোরতর অন্ধকার পূর্ণ গুহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও, অভিজ্ঞের ন্যায় অভ্রান্ত পথে আলোকাভিমুখে সংক্রান্ত হইতে কদাপি কোন ত্রুটী প্রদর্শন করে না। পর্ব্বতোপরিস্থ বৃক্ষরাজির মূল-দেশ ও উপমূল সকল অভিজ্ঞের ন্যায় অভ্রান্ত পথে শতমুখে বিনা দিগ্‌ভুলে প্রধাবিত হইয়া সেই পর্ব্বত গাত্রের ছিদ্র দেশ সমূহ প্রাপ্ত হয় এবং সেই সমস্ত ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট

হইয়া আপনাদিগকে তন্মধ্যে গভীর প্রোথিত করিয়া, সেই বৃক্ষসমূহকে প্রবল বাত্যাতেও স্থির ও অটল থাকিবার উপায় বিধান করে। ভূগর্ভস্থ বৃক্ষেরও মূল ও উপমূল সকল অভিজ্ঞের ন্যায় সর্ব্বত্র স্বতঃই সন্নিহিত জলাশয়াভিমুখে প্রসারিত হইতে থাকে। সর্ব্বত্রই অব্যক্ত অভিব্যক্ত হইবার জন্য অভ্রান্ত ভাবে যথা পথই অনুসরণ করিয়া যথাগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। নিশাগ্রস্ত রোগীকারণ-দেহগত প্রসুপ্ত্যাবস্থাতেও বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথেও নির্ভীক ও অভ্রান্ত ভাবেই বিচরণ করিয়া থাকে। কেন না, এই সমস্ত অস্ফূর্ত্ত বা সুষুপ্তসংজ্ঞ অভিব্যক্তি নিচয়ের অব্যক্ত মূলাধারে সমাধি সংজ্ঞ অভ্রান্ত পুরুষ বিদ্যমান।

২১। এই সৃষ্টি কার্য্যের ক্রমবিকাশ কালে সমাধি-সমাহিত পরম সত্তা সৃষ্টির অতীত থাকিয়াও স্বকীয় পরমাত্ম স্বরূপের অপরিহার্য্য সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু সৃষ্টির স্থাবরাস্থাবর সমগ্র ব্যষ্টির অঙ্গে স্বতঃই অনুপ্রবিষ্ট হইলেন এবং অব্যক্ত স্বরাট্ পুরুষ বা স্বরূপাত্মা—অন্তরাত্মারূপে তন্মধ্যে স্বভাবসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন এবং তৎপ্রতিবিম্বিত জ্যোতির দ্বারা যাবতীয় ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে, যাবতীয় ব্যক্তাব্যক্ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে চৈতন্যপ্রবণ করিয়া, ইন্দ্রিয় গ্রাম সম্পন্ন ব্যষ্টিকে জীবাত্মা বিশিষ্ট জীবাভিমানী এবং সমগ্র জীবাত্মা পুঞ্জের সমষ্টীভূত স্বরূপকে সর্ব্বগত সর্ব্বময় সর্ব্বেসর্ব্বা ঈশ্বরাভিমানে অভিমানী করিলেন। মূলাধারে এই সমাধি নিহিত পরম বস্তুর পারমাত্মিক সংস্থান ব্যতীত কি ব্যষ্টিতে, কি ব্যষ্টিপুঞ্জের সমষ্টিভূত স্বরূপে জ্ঞান ও অভিমান স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনার স্থল কুত্রাপি কখনও উপস্থিত হইত না। এই ঐশ্বরিকী সৃষ্টি-লীলার ক্রমবিকাশ বিবৃত করা আমার বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিষয় নহে। ইন্দ্রিয় গ্রাম সম্পন্ন ব্যষ্টিমাত্রের জীবাভিমান বৃত্তির অন্তরালে ও মূলাধারে ভগবানের পরমাত্ম স্বরূপের, স্বরাট্ পুরুষ বা আত্মারূপে, অব্যক্ত নির্লিপ্ত অথচ ওতঃপ্রোতভাবে অবশ্যম্ভাবী অপরিহার্য্য অবস্থান সংসিদ্ধিই আমার বক্ষ্যমান প্রস্তাবটীর অভিব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট।

২২। এই মায়িক সৃষ্টির আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য ভগবানের সত্ত্ব-রজ তমগুণাদ্বিকা শক্তিলীলার বিস্তার সাধন, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহার নিজ প্রয়োজন, অপরূপ মহাভাবময়ী প্রেমলীলার অবতারণ ও উদ্‌যাপন—অভিনব পরমাত্মলীলার নিত্য স্রোত প্রকটন ও প্রবর্ত্তন। এই সৃষ্টির জীব-লীলার অভিব্যক্তির স্রোত যে নিম্নগ পথ অবলম্বন করতঃ প্রবহমান হইয়া আসিয়াছে, সুপ্রকট প্রেমময়ী পরমাত্ম-লীলার স্রোত তাহার বিপরীত পথে—উজান পথে,—অপরূপ অভিনব প্রলয় পথে—সাত্ত্বিক পরিণাম প্রাপ্ত জীবদেহের অভ্যন্তর-গত সুষুম্না নাড়ীর মূলাধার চক্র হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া, চক্রখণ্ডাকারে সুমেরু বেষ্টন পূর্ব্বক সৃষ্টি-স্রোতের সমান্তরাল পথে ঊর্দ্ধমুখে লীলার উপযোগী অপরিহার্য্য, নিরঞ্জন, অভিব্যক্তি লাভানন্তর এবং মেরুদণ্ড সন্নিবেশিত চক্র পরম্পরা অতিক্রমানন্তর সহস্রার পদ্ম স্থিত "চক্রাতীত চক্রবর্ত্তী" পরমাত্ম-স্বরূপে সমাবৃত্ত হইয়াছে। এই জন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আছে "একদিকে ব্রহ্মার সৃষ্টি, আর দিকে প্রেম।" সৃষ্টি-লীলার স্রোত সমাধি-সমুদ্র হইতে চিদ্বিমুখ—স্বধাম বিমুখ হইয়া-নিম্নাভিমুখে ঈড়াপিঙ্গলার পথে প্রবাহিত, প্রেমলীলার স্রোত চিদভিমুখে, স্বধামাভিমুখে অভিনব প্রলয় পথে সৃষ্টি প্রবাহের

বিপরীত পথে,—সুষুম্নার পথে উর্দ্ধমুখে প্রবাহিত। সৃষ্টিলীলার জৈবিক বিকাশ ব্যক্তিগত পূর্ণতা, শুদ্ধা সাত্বিকী পরিপূর্ত্তি লাভ না করিলে, প্রেম-লীলার সূচনা সম্ভাবিত নহে। ব্যষ্টীভূতা জৈবিকী লীলার এই ব্যক্তিগত পূর্ণতা হইতেই প্রেম-লীলার সূত্রপাত সচরাচর সংঘঠিত হইয়া থাকে। সমষ্টীভূতা ঐশ্বরিকী লীলার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহা, তাহাব এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকে। সৃষ্টিলীলার জৈবিক বিকাশ যে পথ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, ঠিক সেই পথে উপাদান কারণ পরম্পরায় ক্রমান্বয়ে বিলীন হইতে হইতে বৈজিক মূলাধারে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াই প্রলয়ের পথ—নির্ব্বাণের পথ—স্বকীয় বিদেহ বৈজিক অবস্থায় পুনরাবর্ত্তনের পথ। প্রলয় কালে এই পথ অনুসরণ করিয়া সৃষ্টিলীলার অপ্রকট অবস্থা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সাধকেরা এই পথে সংক্রমণ করিলে তাঁহাদের আত্মনির্ব্বাণ লাভ হইয়া বৈজিক মূলাধার স্বরূপে উপনীত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সুপরিণত জীববৃক্ষের বিদেহ বীজে, "পুনর্ম্মূষিকোভব" হইতে পরিলে, তাহাতে তাহার কোন বিশেষ লাভ নাই, বরঞ্চ তাহাতে তাহার পুনরঙ্কুরিত ও পুনরাবর্ত্তিত হইবার এবং অবশেষে জীবাকারে পুনঃপরিণত হইবার আশঙ্কা ও সম্ভাবনার উচ্ছেদ হইতেছে না। সাধকেরা এই প্রলয় পথের অনুযাত্রী হইয়া, সমাধি-নিহিত পরমাত্মস্বরূপে বিলীন হইতে সক্ষম হইলেও, তবু তাঁহাদিগকে সেই বিলীন অবস্থায় তন্মধ্যে সূক্ষ্ম বিদেহ বীজরূপে সমাহিত হইয়া থাকিতেই হইবে। তাহাতে তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তনের ও 'পুনর্জ্জীবোভব' হইবার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা ঘুচিল কোথায়? লাভের মধ্যে বহু কাল কল্পের পরিশ্রম ও পরিণতি পণ্ড হইল এবং কার্য্য বিষম বাড়িয়া গেল। অনেকেই এই সন্দেহাত্মক নির্ব্বাণের পথ প্রাপ্ত হইবার জন্য যোগাদিযোগে বৃথা সচেষ্ট হইয়া কর্ম্মভোগ বাড়াইয়া থাকেন।

২৩। এই প্রেমলীলার নিজ প্রয়োজনে এই সমাধি-সমুদ্র-শায়ী নিত্যবস্তু স্বভাবতঃই অসংখ্য অনন্ত, ব্যষ্টিপুঞ্জের মধ্যে অব্যক্ত বা সমাধিস্থ স্বরাট্ অধিষ্ঠান লাভ করিলেন; পরে সৃষ্টি-স্রোতে ভাসমান হইয়া,প্রথম অভিব্যক্তির অনুরূপ স্থূলাদি দেহ সংগঠনার্থ, স্বকীয় প্রতিবিম্বিত স্বরূপ অহং অধ্যাসের আশ্রয়ে আসিয়া, সেই সমাধির অবস্থায় প্রপঞ্চ বিষয় রাজ্যের দ্বারস্থ হইলেন। বিষয়ী এই প্রপঞ্চ বিষয়েরই সাহায্যে, সেই অবস্থায় স্থূলাদি দেহ ও মনাদি ইন্দ্রিয়ের গঠনোপযোগী সমস্ত উপকরণ সমগ্রী অভ্রান্তভাবে আহরণ ও আত্মসাৎ করিয়া, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধির উৎপত্তি সম্পাদন করিলেন; পরে অহং অধ্যাসরূপ স্বকীয় প্রতিবিম্বকে যথা নিয়মে জ্ঞান ও অভিমান প্রবণ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ব্বিষয়ের সান্নিধ্যে আনিয়া ব্যবহারিক ভাবে প্রতিবোধিত করিলেন। এইরূপে ব্যষ্টিদেহে প্রতিবিম্বিত অহং অধ্যাসে প্রবোধিত হইয়া জীবাত্মার উৎপত্তি হইল। জীবাত্মার এই জৈবিকী সত্তা প্রতিবিম্বিত (phenomenal) সত্তা মাত্র এই ব্যষ্টীভূতা প্রতিবিম্বিত সত্তার উপরে জীবাভিমান পরিকল্পিত। মূলাধারস্থ পরমাত্ম সত্তার ইন্দ্রিয়গ্রামগত প্রতিবিম্বই ব্যষ্টিজীবের কারণ ও সত্তা। সুতরাং মূলাধারস্থ সমাধি-সমাহিত পরম সত্তাই জীব সত্তার মূল সত্তা—এই প্রতিবিম্বিত কারণের মূল কারণ। এই মূলা-

ধার সত্তা সমাধিগত না থাকিয়া যদি প্রকৃত ভাবে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ থাকিতেন, তাহা হইলে এই ব্যষ্টীভূত বা তাহাদের সমষ্টীভূত অভিমান, জৈবিক বা ঐশ্বরিক অধ্যাসে ব্যবহারিক ভাবেও প্রবুদ্ধ ও সংস্কৃত হইবার স্থল পাইত না। এই প্রতিবিম্বিত সত্তাদ্বয়ের মূল কারণের সমাধিগত নিরভিমান অবস্থা হেতু, প্রতিবিম্বিত স্বরূপদ্বয়ে কর্তৃত্বাভিমান স্ফূর্ত্তির স্থল সম্ভাবিত হইয়াছে। কর্ত্তা নিরভিমানী, নিরুপাধি ও নিষ্ক্রিয় হইলে অকর্ত্তারা সর্ব্বত্রই ব্যবহারিক ভাবে কর্তৃত্বাভিমানী হইয়া থাকে। এই ব্যবহারিক কর্তৃত্বাভিমান স্ফূর্ত্তি হেতু ভগবানের জৈবিকী ও ঐশ্বরিকী লীলা সুচারুরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সমষ্টীভূত ঐশ্বরিকী, লীলার ন্যায় ব্যষ্টীভূতা জৈবিকী লীলাও প্রতিবিম্বে প্রবুদ্ধ স্বরূপের লীলা এবং ইহা সমষ্টীভূতা ঐশ্বরিকী লীলার অন্তর্ভূত। কিন্তু এই ব্যষ্টীভূতা জৈবিকী লীলাই মহাভাবময়ী পারমাত্মিকী প্রেমলীলার অভিব্যক্তির নিদানভূত—চিদভিমুখী স্বরূপাভিমুখী-স্বধামাভিমুখী যাত্রার আরম্ভ-স্থল। এই প্রেমলীলা ঈশ্বরের বিরাট্ দেহকে—"ব্রহ্মার সৃষ্টিকে" অস্পৃষ্ট রাখিয়া ঈশ্বর ও সৃষ্টির অন্তর্দ্দেশ দিয়া—অন্তরঙ্গ দিয়া সংগোপনে পরমাত্মাভিমুখে প্রবহমানা হইয়াছে।

২৪। এই পারমাত্মিকী প্রেম-লীলার স্রোত যেরূপ শুদ্ধা সাত্বিকী প্রকৃতি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া পারমাত্মিকী সত্তাভিমুখে স্তম্ভাকার পথে, উজান স্রোতে প্রবহমান, সেইরূপ প্রতিবিম্বিতা ত্রিগুণময়ী জৈবিকী লীলার স্রোত সর্ব্বাধস্তলবর্ত্তী তামসিক কেন্দ্র হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া, রাজসিকী ও সাত্বিকী লীলার যথানুক্রমে উদ্‌যাপনান্তর ঈশ্বরের প্রতিবিম্বিত ত্রিগুণাত্মক সত্তার অভিমুখে, পূর্ব্বানুরূপ স্তম্ভাকার বা দণ্ডাকার পথে প্রধাবিত। এই লীলার প্রকৃত আরম্ভ-স্থল সর্ব্বাধস্তলবর্ত্তী জড়রাজ্য। তমোগুণে সমাচ্ছন্ন জড়রাজ্য হইতে এই লীলা-স্রোতের সূত্রপাত হয়। পরে উদ্ভিদ ও পাশব রাজ্য অতিক্রমানন্তর এই পৃথিবীর জীবপ্রধান মনুষ্য রাজ্যে আসিয়া উপনীত হয়। এ লীলা ব্যাপারেও, যে পথে সৃষ্টি-লীলা স্রোত প্রবহমান হইয়া আসিয়াছে, যোগাদি দ্বারা ঠিক সেই পথে সমাবর্ত্তন সম্পন্ন হইলে তাহাতে বিশেষ কোন লাভ নাই। তাহা বিশেষ কোন রূপ সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। তদ্বারা কেবল মাত্র সত্বপ্রধান মহত্তত্বের বীজকোষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা তিরোহিত হইতেছে না এবং এত কালের সাধন-শ্রম ও পরিণতি পণ্ড হইয়া, কার্য্য ববং সর্ব্বতোভাবে বাড়িতেছে। জৈবিকী তামসিকী লীলা স্বতঃই স্বাভিমুখী—স্বতঃই স্বকেন্দ্র সংক্রমণ-নিরতা অথবা অন্নব্রহ্ম বা ভোগ্যবিষয় মুখী—প্রকৃত ঈশ্বরাভিমুখী নহে। কিন্তু ইহা প্রকৃত ঈশ্বরের প্রতিবিম্বিত সত্তাভিমুখী যাত্রার আরম্ভ স্থল। তামসিকী লীলাতে জীবের সত্ব ও রজোগুণ অভিভূত ও আচ্ছন্ন থাকে, ক্রমে তাহাতে রজোগুণ পরিস্ফুট হইয়া সেই তমোগুণের রূপান্তর ও ভাবান্তর শনৈঃ শনৈঃ সম্পাদন করিতে থাকে। তমোগুণ স্বভাবতঃই বিষয়জনিত ক্ষতি লাভের দ্বারা পরিচালিত এবং বিষয় লোভ বা শাসন ভয় দ্বারা প্রতিনিয়ত সমাকৃষ্ট বা বিপ্রকৃষ্ট। তজ্জন্য তাহার ন্যায়ান্যায় সঙ্গতি দেখিবার চক্ষু নাই, তজ্জন্য অন্যকে কঠিন পীড়াদি প্রদান

ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত পর্য্যন্ত করিতেও সঙ্কোচ নাই। মোহ বশতঃ তাহার আপনার প্রকৃত শক্তিসাধ্য অবধারণ করিবারও সামর্থ্য নাই। সেই মোহান্ধতা হেতু সে জড়-পিণ্ডের ন্যায় এমন সকল বিষয়ব্যাপারে গিয়া গড়াইয়া পড়ে, যাহা হইতে প্রাণান্ত ভিন্ন অন্য উপায়ে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। কোন অভীপ্সিত বা উপভোগ্য বস্তু লাভার্থে বা কামাদি দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করণার্থে, পরভোগ্য সামগ্রী ও পরভোগ্যা স্ত্রী প্রভৃতি আত্মসাৎ করণার্থে, বলপ্রয়োগ, প্রলোভন প্রদর্শন অথবা গোপনে অপহরণাদি কার্য্যে সে কিছুতেই—কোন ক্রমেই পরাঙ্মুখ হয় না। ক্রমে এইরূপ বলপ্রয়োগাদি করিতে করিতে রজোগুণের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন ও তৎসঙ্গে শক্তি, বীরত্ব, বিক্রম, বীরাভিমান প্রভৃতি ক্ষত্রভাবের শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চার হইতে থাকে এবং আত্যন্তিক নীচ ও মলিন ভাব সকল, ক্রমশঃ সেই তমোগুণের অঙ্গ হইতে অপসারিত হইয়া রাজসিক ভাবপুঞ্জের স্থান সংস্থান করিতে থাকে। এই নূতন স্ফূর্ত্তি তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ স্বার্থানুগত। পরার্থে, সমাজার্থে, স্বদেশার্থে, স্বপরিবারার্থে, ঐশ্বরিক বা শাস্ত্রবিধির অনুগত হইয়া, যথাকর্ত্তব্য পালনার্থে, তামসিক বা তমঃপ্রধান রাজসিক জীবের কার্য্যকলাপ উদ্দিষ্ট হয় না। সে দিকে কোন লক্ষ্য থাকে না। শাসন-ভয়দ্বারা সংযত না হইলে স্বেচ্ছাচারই এই তামসিক জীবের জীবন-রাজ্যে পূর্ণমাত্রায় ক্রীড়া করিতে থাকে। সে কেবল মাত্র স্বকীয় ক্ষুদ্র বিন্দুর সুখ দুঃখাদিতে আবদ্ধ এবং সেই বিন্দুর চারিদিকে ভ্রাম্যমান। সে সেই ক্ষুদ্র বিন্দুতে পারিবারিক বা সামাজিক সমস্ত বিষয় ব্যাপারের লয় ও নির্ব্বাণ কামনা করে! সে অবশ্যই অন্যের সুখ দুঃখাদির প্রতি কাজে কাজেই, ঘোর নিদ্রাতে অভিভূত। তামসিক জনের ঈশ্বর বুদ্ধি স্থূল প্রতিমা বিশেষে অথবা ভূত প্রেত প্রভৃতি উপদেবতাদিতে আবদ্ধ। "প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে-,তামসা জনা" এই ভূত প্রেত প্রভৃতি হীন জাতীয় উপাস্যগণের পূজারাধনা, ভয়েই বা স্বার্থোদ্দেশেই, সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই উপদেবতাদিও তাহার দুর্দ্দান্ত স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় মাত্র রূপেই অর্চ্চিত হইয়া থাকে। এই স্বার্থাভিমুখ-ভাব যাহাদের আদর্শ, তাহারা আসুরিক বল বিক্রম ও সাহস সম্পন্ন পুরুষদিগের স্বতঃই অনুগত হইয়া থাকে। তাহাদের কেহ কেহ স্বর্গলোভে বা নরক ভয়ে গুরু, শাস্ত্র বা ধর্ম্ম বিশেষের অনুগত হইয়া সামাজিক নীতি-পালন ও স্বার্থ-প্রমুখ-ধর্ম্ম যজন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের হিতাহিত জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি নাই; ইহাদের কর্ম্ম সকল অনবধানে অনুষ্ঠিত হয়; সাধুদের সাধুতাতে ইহাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় না; তাঁহাদের প্রতি উপহাস বুদ্ধি ভিন্ন অন্য ভাব নাই; তাঁহাদের প্রতি সম্মান বোধ ইহাদের চিত্তমধ্যে কখনও স্থান পায় না। অন্যের সুখ ও অভ্যুদয় দর্শনে ইহারা স্বতঃই শোকাকুলিত হয় এবং অন্যের গুণ গৌরব নিয়ত আবরণ বা অস্বীকার করিয়া ইহারা আত্মমর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করে। স্বকীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ইহারা স্বতঃই আলস্য ভাব প্রদর্শন করে এবং স্বভাবতঃ চার্ব্বাক বা আসুরিক শাস্ত্র নীতি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের আত্মবুদ্ধি স্থূল দেহগত, এবং ঈশ্বরবুদ্ধি কখনও বা খণ্ডিত স্থূল শরীরগত এবং কখনও বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর উপ-

সেবক্তা গত। এই সমস্তই তমঃ প্রধান রাজসিক প্রকৃতিতে সময়ে সময়ে প্রকাশ পায়; এই সমস্তই তমোগুণের নিত্য সঙ্গী।

২৫। রাজসিকী লীলাতে কোথায় বা তমোগুণ এবং কোথায় বা সত্ত্বগুণ তৎসঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে অবস্থিতি করে। এই লীলাতে রজোগুণের প্রভাবে সত্ত্ব ও তমোগুণ অভিভূত ও আচ্ছন্ন থাকে। প্রথম স্ফূর্ত্তিতে সেই প্রভাবে সত্ত্বগুণ অভিভূত থাকে এবং তৎসঙ্গে তমোগুণ সংলিপ্ত ও ও সংশ্রুত হইয়া প্রকাশ পায়; পরে তমোগুণের ক্রমশ হ্রাস হইয়া সেই স্থানে সত্ত্বগুণের সংস্থান সম্পাদিত হয়। এই লীলাতে শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দাতৃত্ব ঈশিত্ব, স্বর্গলাভার্থ-প্রযত্ন প্রভৃতি ক্ষত্রভাব ও ক্ষত্র-নীতি সকল ক্রমে জাগ্রত হইতে থাকে। পরিজন-হিতব্রত, পরহিতব্রত, দেশহিতব্রত, সমাজ-সেবাব্রত, রাজসেবানুরাগ, শরণাগতরক্ষানুরাগ, স্ত্রীজাতির পক্ষ সানুরাগে অবলম্বন প্রভৃতি ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া শনৈঃ শনৈঃ যশঃস্পৃহা ও স্বার্থের বিস্তার হইতে থাকে। রজোগুণ উদ্যম ও কর্ম্মাত্মক এবং লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও স্পৃহার উত্তেজক এবং শোক দুঃখই ইহার পরিণামফল এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ইহার কর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রধান প্রবর্ত্তক। রজোগুণ স্বভাবতঃই অসমদর্শী বা ভেদদর্শী, দ্বৈতবাদী, গর্ব্বাত্মক ও রাগাত্মক। ইহা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থলে শাক্তধর্ম্মী বা শক্তির উপাসক। ইহাদের প্রাণের টান ও সমবেদনা যতটা রাক্ষসরাজ রাবণের প্রতি, ততটা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি নহে— যতটা যক্ষ রক্ষের প্রতি, ততটা সাত্বিক ভাবাত্মক দেবচরিত্রের প্রতি নহে। ইহাদের সম্বন্ধে এই জন্যে উক্ত হইয়াছে, "যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষ রক্ষাংসি রাজসাঃ।" এই শাক্তধর্ম্ম সত্ত্বগুণের সঙ্গে মিলিত হইলে, বিশুদ্ধ ক্ষত্রতেজ, সৎসাহসিকতা, নির্ভীকতা, কর্ত্তব্যপালনার্থে প্রাণোৎসর্গতা প্রভৃতি বীরভাব সকলের এবং তমোগুণের সমভিব্যাহারী হইলে, নিদারুণ সংস্কারপ্রিয়তা, চঞ্চল পরিবর্ত্তনপরতা, দুরন্ত ভঙ্গপ্রিয়তা প্রভৃতি মারাত্মক পৌরুষ ভাব সকলের স্ফূর্ত্তিদাতা হইয়া থাকে। এই রাজসিক ক্ষত্রভাব এদেশে গুরু-আনুগত্য-যোগে তন্ময়ত্ব ও তদাকারত্ব প্রাপ্তি হেতু সংস্কারদেহে অপরূপ অটল অন্তরঙ্গবিকাশ লাভ করিয়া, এক সময়ে জাগ্রত এবং বহুল কীর্ত্তির আস্পদ হইয়াছিল। এই প্রকৃতির লোকে যেমন এ দেশে, তেমনি অন্যান্যদেশে চিত্তবৃত্তির অনুরূপ আদর্শ বীর প্রকৃতির, বীরমূর্ত্তির স্বভাবসিদ্ধ অনুধ্যানে বা আনুগত্যে তদাকারে আকারিত হইয়া, তদনুরূপ বীরচরিত্রে ও ও ক্ষত্রতেজে ভূষিত হইয়া প্রাণার্পণ পর্য্যন্ত ত্যাগস্বীকারে সক্ষম হইয়া থাকে। রজোগুণ প্রধান তমোগুণে মানুষ মনোমদ পরদ্রব্য বা পরস্ত্রীতে প্রলুব্ধ হয়, সেই লোভ বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছাতেও পরিণত হয়, কিন্তু সেই ইচ্ছা সে কার্য্যে পরিণত করিতে তাদৃশ আগ্রহান্বিত হয় না, তাহার সুযোগ ও তাদৃশ সানুরাগে অন্বেষণ করে না। স্বকীয় কলুষিতচিত্ত মধ্যে সেই দূষিত ইচ্ছা ও বিষয় সম্ভোগ অবরুদ্ধ থাকে। রজোগুণ প্রধান সত্ত্বগুণে লোকের মনোগ্রাহী পরদ্রব্যে বা পরস্ত্রীতে লোভ চাঞ্চল্য জন্মে, কিন্তু সেই লোভ-চাঞ্চল্য অন্যায় আসক্তি বা দুরন্ত কার্য্যে সচরাচর পরিণত হয় না। চিত্তমধ্যে ধর্ম্মভয়, লোকলজ্জা দণ্ডভয় প্রভৃতি প্রতিবন্ধক সমূহ অভ্যুত্থিত হইয়া মানুষের প্রবৃত্তিকে সংযত রাখে।

রজোগুণ প্রতিনিরত ফলবাদী(utilitarian); ফল শাস্ত্রবিধি (utilitarianism) অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, এবং সেই শাস্ত্রীয় নীতির অনুসরণ করে। রজোগুণেব আত্মবুদ্ধি সূক্ষ্মদেহে বা প্রাণাদি কোষত্রয়ে বা মনাদি ইন্দ্রিয়গ্রামে এবং ইহাব ঈশ্বব বা ব্রহ্ম-বুদ্ধি খণ্ডিত সূক্ষ্মদেহশায়ী হিরণ্যগর্ব্ভে সচরাচর সংস্থাপিত। এইরূপ সূক্ষ্ম দেহেই ইহাব নিবাকাববুদ্ধি। এইজন্য রজোগুণ সাধু সজ্জন-দিগকে পবমাত্মে অভেদ বুদ্ধিব ধাবণায় অসমর্থ হইয়া, ভেদবুদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রামসম্পন্ন জ্ঞানে, বিচাবদৃষ্টিতে তাঁহাদেব দোষগুণের তাবতম্যানুসাবে তাঁহাদিগকে উচ্চ নীচপদে অভিষিক্ত কবিতে থাকে। রাজসিকী প্রকৃতি হিবণ্যগর্ব্ভেব রুদ্রতেজে, বীরাভিমানে বা বীবত্ব গৌরবরূপ ক্ষত্র স্বর্গে আত্মলয় বা আত্ম নির্ব্বাণ কামনা কবে ও প্রাপ্ত হয়।

২৬। সাত্বিকী লীলাতে শম দম তপ শৌচ ক্ষান্তি ঋজুতা জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্য, আনুগত্য, বিনয় ও নম্রতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও নীতি প্রাদুর্ভূত হয় এবং বৈবাগ্যনত ঔদাস্য, অদ্বৈতভাব, অভেদ বুদ্ধি, সমদৃষ্টি প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হয়। এই সাত্বিকী প্রকৃতি গুরু আনুগত্যাদি যোগে অন্তরঙ্গ দেহ বিশিষ্ট হইয়া সংস্কাব দেহে পরিস্ফুট হয়। এই সাত্বিক বা ব্রাহ্মণ্য অন্তরঙ্গ, নিষ্কামভাব, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, বিনয়, নম্রতা, শিষ্টাচার, দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও সদ্ভাব সমূহের আধার হইয়া সংস্কার দেহে সাত্বিকী ভাগবতী তনু গঠন করত স্বয়ং অনুগ্র থাকিয়াও কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া সৌরভ বিস্তার করে। এই সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণকে অভিভূত, [illegible] করিয়া আত্ম-পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। যে পরিমাণে সত্ত্ব গুণের কলেবর পুষ্টি সেই পরিমাণে রজ-স্তমোগুণ ক্ষীণ-দেহ ও হীনপ্রভ হইতে থাকে। শুদ্ধা সাত্বিকী ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধিতে সর্ব্ব-ভূতে পবিব্যাপ্ত এক অখণ্ড পরমাত্মতত্ত্ব আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ বিশ্বাসগত হইয়া প্রকাশ পায় এবং সাধু শান্তদিগকে পরমাত্মে অভেদ অনুভূত হইয়া তাঁহাদের গুণ দোষদির সমালোচনা বা তাঁহাদেব পবস্পবেব সঙ্গে তুলনা-প্রসূত তাবতম্যেব ধাবণা স্বতঃই পবিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। অনাসক্ত নিষ্কাম নিবপেক্ষ ধর্ম্ম ও নীতি, সাধুভক্তি, সাধু-সেবা, সাধুসঙ্গ ও নৈষ্ঠিক আতিথ্য ও জন হিতৈষণা সত্ত্বগুণের স্বতঃই নিত্য অবলম্বন হইয়া থাকে। সাত্বিকী প্রকৃতি, আশক্তি শূন্য ও কর্ম্মফল কামনা বিবহিত হইয়া শুদ্ধ কর্ত্তব্য জ্ঞানে, কর্ম্মে নিত্য প্রবৃত্ত থাকিয়া ও কর্তৃত্বাভিমান শূন্য নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করে। কামেন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া সে প্রকৃতি কদাপি বৈধ পত্নীতেও উপবত হয় না পরন্তু শিষ্টাচার শাস্ত্র বিহিত নিদেশানুসাবে ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে তদুপবত হইয়া থাকে। সাত্বিকী প্রকৃতি ঈশ্বরেতে বা জন সাধারণ্যে আত্মলয় বা আত্ম নির্ব্বাণ প্রার্থনা করে ও প্রাপ্ত হয়।

২৭। এই শুদ্ধ সত্ব ব্রাহ্মণ্য সদ্ভাব সকল শুদ্ধ সত্ব গুরু আনুগত্য যোগে যেমন সত্বর-ও সহজে ভাগবতী তনুস্ফূর্ত্তি লাভ করে, তেমন আর কিছুতেই নহে। তদাকারে আকারিত হইয়া তন্ময়ত্ব—ক্ষত্র ব্রাহ্মণ্যাদি অন্তরঙ্গ তনুলাভের পক্ষে গুরু আনুগত্যের ন্যায় পরম উপাদেয় মুক্তিযোগ আর নাই। প্রত্যেক বীর পুরুষ স্বীয় অন্তরের সিংহাসনে কোন আদর্শ মনোমদ বীর পুরুষের তেজ-পুঞ্জ বীর মূর্ত্তিকে স্বতঃই মহাসমাদরে প্রতিষ্ঠিত

রাখিয়া মানসে পূজারাধনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক প্রাণ বিসর্জ্জন-ক্ষম ধর্ম্মবীর তদীয় হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে কোন ধর্ম্মার্থে নিহত ত্যাগশীল ধর্ম্মবীরের বীরমূর্ত্তি স্বতঃই অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তাহার স্বভাব সিদ্ধ ধ্যান ধারণায় নিরত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক সাধু সজ্জনের অন্তরে অন্য কোন এক মনোমদ সাধু সজ্জনের সৌম্য মূর্ত্তি স্বভাবতঃই অনুক্ষণ আরাধিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সদ্‌গুরুর অন্তরঙ্গে অন্য কোন মনোমদ সদ্‌গুরু সাধুর প্রশান্ত আনন্দ ও ভক্তি রঞ্জিত বিগ্রহ স্বভাবে মিশিয়া নিহিত থাকে। বীরকুলতিলক মার্সেল নে বীরেন্দ্র কেশরী নেপোলেয়ঁার বীরমূর্ত্তি স্বতঃই এরূপ অন্তর্নিহিত করিয়া হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন যে, রাজাজ্ঞায় তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিবার প্রতিজ্ঞায় যুদ্ধে নির্গত হইয়াও যখনই তাহার দৃষ্টি পথবর্ত্তী হইলেন, অমনি আত্মবিস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া, অজ্ঞাতসারে সসৈন্যে তাহার পক্ষভুক্ত হইয়া, রাজবিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। (তাঁহার বিচার-কালীন আত্ম বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখ) এই মার্সেল তাঁহার আদর্শ বীর মূর্ত্তির স্বভাব-সিদ্ধ অনুধ্যানে তদাকারে আকারিত হইয়া, তাঁহার সঙ্গে অন্তরঙ্গে অভেদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মার্সেল নের পক্ষে নেপোলেয়ঁার বিরুদ্ধাচারী হওয়া, আর আত্ম-বিরুদ্ধাচারী হওয়া, তখন একই কথা। বাহিরের রাজাজ্ঞা কি নের অন্তরের আরাধিত বস্তুর বিপক্ষ করিয়া তুলিতে পারে? এই মার্সেল বীর পুরুষ তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য মূর্ত্তিকে অন্তরে রাখিয়া সহস্র সহস্র বিপদ সাগর গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পঞ্চাশৎ সহস্র রুশীয় সৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়াও তাঁহাদের দুর্জ্জয় দুর্ভেদ্য ব্যূহ পঞ্চশত ভগ্ন পাইক সহযোগে, তৃণব্যূহের ন্যায় ভেদ করিয়া, নিরাপদে স্বকীয় গম্যপন্থায় সংক্রান্ত হইয়াছিলেন। নের অন্তরে আদর্শ বীর মূর্ত্তির স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা না থাকিলে, এইরূপ দুষ্কর কার্য্য কলাপ তাঁহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারিত কি? মার্সেল নের উপরি উক্ত আত্ম-বিস্মৃতি-প্রাপ্তি সম্বন্ধীয় ঘটনার কারণ স্থলে, কেহ কেহ নেপোলেয়ঁার অলোকসামান্য বশীকরণ শক্তি উল্লেখ করিতে পারেন। কিন্তু সেই বশীকরণ শক্তি, ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য, বীর ওয়েলিংটন বা অন্যান্য বিপক্ষ বীরবৃন্দ সম্বন্ধে খাটে নাই। তাহা কি এজন্য নহে যে, সেই অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি কেবল তন্ময়ত্ব-প্রাপ্ত পাত্র সম্বন্ধেই সম্পূর্ণ খাটিয়া থাকে, অন্যত্রে তাহা তাদৃশ বল প্রয়োগ করিতে ও ফলোপদায়ী হইতে পারে না।

২৮। এই রাজসিক ও সাত্ত্বিক ঔৎকর্ষের,—আত্মতত্ব লাভের সাক্ষাৎ কারণ হইবার কোন সম্ভাবনা ও অধিকার নাই। কিন্তু ইহাই জীবের পরমগতি ও চরমাদর্শ বলিয়া সচরাচর গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা যে উচ্চতর বা উৎকৃষ্টতর গতি আছে, ইহা লোকের সচরাচর অনুমানগম্য হয় না।

২৯। স্বরূপগত বিষয়কে ব্যবহারিক ভাবে দূরস্থাপিত করিয়া তৎসঙ্গে সম্যক পরিচয় ব্যতীত বিষয়ী যেমন কোন অবস্থায় কোন প্রকার ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিমান সম্পন্ন হইতে পারে না, তেমনি এই স্বরূপগত বিষয়ের নিত্যব্যবহারিক আনুকূল্য ব্যতীত কোন প্রকারে সদেহ ও ইন্দ্রিয় গ্রাম সম্পন্ন হইতেও থাকিতে পারেনা। এই বিষয়রাজ্য যেরূপে বিষয়ীর আশ্রয়ীভূত ব্যক্তি বিষয়ীকে

ইন্দ্রিয় গ্রাম সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহার কথঞ্চিৎ বিবৃতির এখানে প্রয়োজন হইতেছে। বেদান্তে তাহার এইরূপ বিবৃতি দৃষ্টিগোচর হয়।

৩০। বেদান্তমতে অপঞ্চীকৃত বা অবিমিশ্রিত সূক্ষ্ম আকাশ বা শব্দ তন্মাত্রার সত্ত্বাংশ হইতে বিষয়ীর শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ও পুষ্টি; এতাদৃশ সূক্ষ্ম বায়ু বা স্পর্শ তন্মাত্রার সত্ত্বাংশ হইতে তাহার স্পর্শেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি ও পুষ্টি; এতাদৃশ সূক্ষ্ম তেজঃ পদার্থ বা রূপ-তন্মাত্রার সত্ত্বাংশ হইতে তাহার দর্শনেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি ও পুষ্টি; এইরূপে এতাদৃশ সূক্ষ্ম অপ্ ও ক্ষিতি পদার্থ বা রস ও গন্ধতন্মাত্রার স্ব স্ব সত্ত্বাংশ হইতে তাহার রসনেন্দ্রিয়ের ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে উৎপত্তি ও পুষ্টি প্রতিনিয়ত সম্পাদিত হইতে থাকে, পরে তাহার শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ জ্ঞানের যথাযথ কারণ হইয়া প্রকাশ পায়। উপরি উক্ত পঞ্চ তন্মাত্রার রজঃ ভাগ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও বিকাশ সম্পন্ন হইয়াছে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়-পুঞ্জের সত্ত্বাংশ হইতে মনোবুদ্ধি বা অন্তঃকরণের উৎপত্তি।

৩১। ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞানও এইক্ষণে এই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য প্রাচীন ইন্দ্রিয়োৎপত্তির দার্শনিক তত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানমতে বিষয়ীর শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারে যাহা এখন শব্দ বলিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহা বহুকালকল্প সেই শব্দায়ত্ত কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জের উপর সংঘাত করিতে করিতে, এবং তাহার স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারে যাহা এখন শীতোষ্ণাদিরূপে অনুভূত হইতেছে, তাহা সেইরূপ তদায়ত্ত কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জের উপর দিয়া প্রবহমান হইতে হইতে, এবং তাহার দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারে যাহা এখন রূপ বা আকৃতি, বিস্তৃতি ও বর্ণ বলিয়া পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তাহা সেই [illegible] আলোক-সম্পাত নিবন্ধন সেই [illegible] কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জের উপর উপরত হইতে হইতে, এবং এইরূপ তাহার রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারে যাহা এখন রসাস্বাদনে ও গন্ধাঘ্রাণে পরিণত হইতেছে, তাহা সেইরূপ সেই রস ও গন্ধায়ত্ত কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জের উপর যথাক্রমে সমাহিত হইতে হইতে, তাহাদের মধ্যে যথানুক্রমে আমূল পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ সংসাধন করিয়া, তাহাদিগকে এরূপ এক এক জাতীয় অপূর্ব্ব অব্যক্ত চিৎশক্তি সম্পন্ন অণুকণাপুঞ্জ (molecules) প্রস্তুত করিয়া তুলে, পরিণামে যাহারা বিষয়ীর দেহাভ্যন্তরে যথাযথ স্থানে যথানুক্রমে অধিষ্ঠান লাভ করিয়া, তাহার শব্দ স্পর্শরূপ রস ও গন্ধগ্রাহী ইন্দ্রিয়বর্গের যথা ক্রমে সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

৩২। উপরি উক্ত বৈজ্ঞানিক মত যে কেবল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের স্বকোপলকল্পিত মত বা অনুমান মাত্র, তাহা নহে। এইরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে যে, মার্কিণ দেশের ম্যামথ নামক সুগভীর অন্ধকার-গহ্বরে বা তদ্রূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্যান্য গুহাভ্যন্তরে, যেখানে সূর্য্যালোক বা অন্য প্রকার আলোকের গতি বিধি না থাকাতে আলোকানুভাত দ্রব্যাদির আকৃতি বিস্তৃতি ও বর্ণ কোন পদার্থে প্রতিভাত হইয়া তদন্তর্গত পরমাণুপুঞ্জকে রূপান্তরিত করিতে পারে না এবং তজ্জন্য তথাকার সেই পরমাণুপুঞ্জ দর্শনেন্দ্রিয় সৃজনোপযোগী সত্ত্বগুণাত্মক অণুকণাপুঞ্জ (molecules) সংগঠন করিতে স্বতঃই অসমর্থ হয়, সেই সেই গাঢ়

অন্ধকারাবৃত গহ্বরে বা গুহাভ্যন্তরে মৎস্যাদি জন্তুপুঞ্জ কোন ক্রমেই চক্ষুষ্মান ও দৃষ্টিক্ষম হইয়া উঠিতে পাবে না—এমন কি,তাহাদের চক্ষুর গঠন পর্য্যন্তও সম্পন্ন হয় না। তাহারা আজীবন অগঠিত চক্ষু ও অস্ফূর্ত্ত-দৃষ্টি থাকিয়া যায়।

৩৩। উপরি উক্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এখন অবশ্যই অসম্পূর্ণ। কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রের মনাদি ইন্দ্রিয়োৎপত্তিব মত বহুকাল পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন আকাবে কালেব পবিবর্ত্তনোৎপাদক কটাক্ষ ও ভ্রূকুটিব প্রতি কোন লক্ষ্য না বাখিয়া সুস্থিব ভাবে দণ্ডায়মান আছে। এ সম্বন্ধে যে কোন সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানানুমোদিত হইয়া ভবিষ্যতে প্রচারিত হউক না কেন, তাহা অবশ্যই বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের অনুকূল দিকেই অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকিবে, কিন্তু কদাপি তাহাকে অতিক্রম করিয়া উঠিবে, একপ বোধ হয় না। উপরি উক্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য যে, এ বিষয়ে বৈদান্তিক মতেব সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের অপূর্ব্ব মিলন চেষ্টা অজ্ঞাতসারে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

৩৪। উপরে যে জ্ঞানোৎপত্তির ও জ্ঞানেন্দ্রিয় স্ফূর্ত্তির নিয়ম প্রদর্শিত হইল, তাহা যেমন জ্ঞানের অনাত্ম-প্রকোষ্ঠে বহির্ব্বিষয় ও প্রতিবিম্বে প্রবুদ্ধ বিষয়ীর সম্বন্ধে খাটিতেছে, তদ্রূপ জ্ঞানের আত্মপ্রকোষ্ঠে আত্মস্থ বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধেও খাটিয়া থাকে। এখানেও —এই আত্ম প্রকোষ্ঠেও,এই আত্মস্থ বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর সাক্ষাৎ ব্যবহারিক মিলন ভিন্ন বিষয়ীর যথাকালে তদাকারে—তৎ-অন্তবঙ্গে পরিণত না হইয়া, কোন স্থলেই আত্মতত্ত্ব লাভের—স্বরূপগত আত্মজ্ঞানস্ফূর্ত্তির কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। এখানেও—এই আত্ম-প্রকোষ্ঠেও, এই জাতীয় বিষয়ও, বিষয়ীর আত্মস্বরূপ বিকাশোপযোগী ভাবদেহ—নিত্য নিরঞ্জন দেহ গঠন করিয়া—তাহাকে তদাকারে আকারিত করিয়া তাহার ভাবময় অন্তরিন্দ্রিয়েব স্ফুবণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এখানেও—এই অন্তবঙ্গেও, বিষয়ী এই জাতীয় বিষয়ের সৎসঙ্গ ও আনুকূল্য ব্যতীত না ভাবময় নিত্য নিরঞ্জন দেহ সম্পন্ন হইয়া ভাবময় অন্তরিন্দ্রিয় উন্মীলন করিতে পারে, না সেই বিষয়-রত্নের অন্তরঙ্গ বা অন্তরাকার লাভ করিয়া আত্ম-স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে পারে।

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

শিশির বাবুর গীতি-গ্রন্থ।

(প্রথম আলোচনা)

বাঙ্গালাসাহিত্য অধুনাতন ও পূর্ব্বতন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের শিরায় শিরায়,ইদানীং বিলাতী সাহিত্যের সতেজ শোণিত সিঞ্চিত সঞ্চালিত দেখিতে পাই। বিলাতী রক্তে, বাঙ্গালা ভাষা,এক নূতন রূপ—এক অভিনব অবয়ব ধারণ করিয়াছে। সেরূপকে কুরূপ বলি না ;—সে অবয়বে লাবণ্য কান্তি নিশ্চয়ই আছে। নিপুণ শিল্পীর হস্তে,তদ্রূপ রচনা—বিলাতী ভাব-বিভূষিতা, বিলাতি ভঙ্গিমা-সমম্বিতা বাঙ্গালা ভাষা,সর্ব্বথা শ্রী এবং মুক্তি

* কালাচাঁদ-গীতা, শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত, শ্রীমতিলাল ঘোষ কর্ত্তৃক ভূমিকা ও টীকা সহ প্রকাশিত। কলিকাতা, বাগবাজার ২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন। ১৩০২ সন। মূল্য ১৷০।

এবং সৌন্দর্য্য শালিনী হয়; পরন্তু, তাহাতে স্বাভাবিকতারও তাদৃশ অভাব থাকে না। কিন্তু লিপি-অকুশল লেখক, কবি বা ঔপন্যাসিক বা অন্য যে কোনও শ্রেণীর রচয়িতা— তাঁহাদেরই সংখ্যা অবশ্য অনেক অধিক,— বিলাতী ছাঁচে এবং ছন্দে যে বাঙ্গালা ভাষা গঠন করেন, সে ভাষা সর্ব্বত্র বিভীষিকা বিশেষ না হইলেও যে এক বিসদৃশ, বিদ্রূপকর ও অবোধ্য মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়,ইহাও নিশ্চয়; এবং সে মূর্ত্তি, নিত্যই, আজ কাল, নয়নগোচর হইয়া থাকে। বিলাতী পরিচ্ছদ পরিধানে অনভ্যস্থ,অনভিজ্ঞ ও অক্ষম বাঙ্গালীর অঙ্গে, অথবা কেবল বিলাতী বহির্ভাব অনুকরণ-উদগার-লোলুপ লঘুচেতা ব্যক্তির অঙ্গে, সে পরিচ্ছদ অপ্রয়োজনে অকস্মাৎ উপস্থাপিত হইলে যেমন কোনও শ্রী, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক না হইয়া, কেবল মাত্র এক অস্বাভাবিক উপসর্গ ও শঙের সাজে পরিণত হয় এবং শঙটীকে সমূহ উপহাসাস্পদ করে;—বাঙ্গালা ভাষাও তেমনি বাঙ্গালীর ন্যায়,—অনর্থক বিলাতী পরিচ্ছদপ্রিয় অন্তঃসার-শূন্য বাঙ্গালীর ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাও যদি বিলাতী বিলাসবাঞ্ছা বক্ষে করিয়া অনাবশ্যক স্থলে ও অযোগ্যহস্তে, অশোধিত বিলাতী ভাব আত্ম অঙ্গীভূত করিতে যায়—অভঙ্গিত বিলাতী ভঙ্গিমার ভজনা করিতে তৎপর হয়, তাহা হইলে কেবল মাত্র প্রবঞ্চিতা হয়; বিলাতী সাহিত্যের কোন শক্তিশ্রী বা সম্পদের অধিকারিণী না হইয়া কেবল কুরূপা কুৎসিতা ও কুলকলঙ্কিনী হইয়া দাঁড়ায়। এক ভাষার সহিত অপর সাহিত্যের উদ্বাহ, আমি, অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বিবেচনা করি না; কিন্তু উপযোগরূপ স্থলে পবিত্র বৈবাহিক বিশুদ্ধির পরিবর্ত্তে,ব্যভিচারবিকার-জনিত কলঙ্ক জারজতার চিহ্নই অঙ্কিত দেখা যায়।

বাঙ্গালা ভাষা বিলাতী সাহিত্য-শোণিতের সংস্পর্শে ও সংমিশ্রণে এক দিকে যেমন জীবনময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী হইতেছে, অপর দিকে তেমনি জারজতা প্রাপ্তও হইতেছে। কিন্তু উভয়ই একরূপ অনিবার্য্য; আলোকের ক্রোড়ে অন্ধকার,উন্নতি ঐশ্বর্য্যের অব্যবহিত পার্শ্বেই অখ্যাতি যেন থাকিতেই হয়! বিলাতীর মিশ্রণে বাঙ্গালায় যেমন এক প্রকৃতির মৌলিকতা উৎপন্ন হইতেছে; পক্ষান্তরে তেমনি ঐ মিশ্রণে, বাঙ্গালার নিজস্ব আত্ম মৌলিকতার মর্ম্মান্তিক ধ্বংসও হইতেছে;— ইহা,উহার অধঃগতির কথা একেবারেই ত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র উন্নতির কথা গ্রহণ করিলেও, অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

উপরোক্ত অভিনব বাঙ্গালার অভ্যুদয়ে পূর্ব্বতন বাঙ্গালা, বাঙ্গালীর নিজস্ব মৌলিক বাঙ্গালা সহজ, সরল, সর্ব্বজন সুবোধ্য খাঁটি বাঙ্গালা, সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। সে বাঙ্গালার মূর্ত্তি কিরূপ, এখানে দেখাইতে চাই না; তাহা আমাদের আলোচ্য গ্রন্থেই দেখা যাইবে। কারণ এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর সেই বিলুপ্ত-প্রায় ও বিস্মৃত-প্রায় পুরাতন ও বিনীত বাঙ্গালা ভাষাতেই গ্রথিত, কিন্তু এসময়ে, ইহা হয়ত,অনেকেরই নিকট, বিলক্ষণ আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইবে! কেননা উচ্চতর সাহিত্যের ও ইংরেজী শিক্ষিতের সাহিত্যের সর্ব্বত্রই এখন অভিনব বিলাতী বাঙ্গালার ব্যবহার ও আধিপত্য; তাহাতে বাঙ্গালীর নিজস্ব মৌলিক বাঙ্গালার প্রায় আর ব্যবহার নাই, প্রচলন নাই; সে বাঙ্গালা কেহ আর স্পর্শ করেন না, স্পর্শ করিতে কেহ হয়ত, সাহসই করেন

না। 'বটতলায়' বিক্রীত পুরাতন পুস্তক ব্যতীত সে বাঙ্গালা এখন আর কোথায়ও বিদ্যমান দেখিনা; এমন কি বটতলাতেও এখন অভিনব বিলাতী ছন্দের বাবু বাঙ্গালা প্রবেশ করিয়াছে এবং প্রবল প্রতাপ বিস্তার করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের পবিত্র পদাঙ্কচিহ্নিত সেই পুরাতন সাহিত্য-স্থানকে শাসন করিতেছে! এরূপ অবস্থায়, এবং এরূপ সময়ে, শিশিরকুমার ঘোষ যে সাহস করিয়া, বিলাতি বার্নিশ-বিহীন ও সংস্কৃত শব্দাড়ম্বর-বিহীন বাঙ্গালীর-গৃহ-জাত সহজ ও স্বাভাবিক বাঙ্গালায় তদীয় এই গীতি-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্য বই কি?

অভিনব অঙ্গের ও আকৃতি অবয়বের বাঙ্গালা রচনা, উহার অবিকৃত ও উপযুক্ত অবস্থায়, নানা গুণশালিনী, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার সবিশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ এই যে, উহা সামর্থ্যে সম্পূর্ণ রূপে এখনকার সময়োপোযোগিনী। উহার যদি অন্য কোন গুণও না থাকিত, তাহা হইলেও কেবল এই উপযোগিতার জন্যও অন্ততঃ, উহা উপেক্ষনীয় হইত না। ফলতঃ ইদানীন্তন কালের ভাব জ্ঞাপন ও ভাবোদ্দীপনের সামর্থ্য সংক্ষিপ্ততা এবং ওজস্বিতাদি স্বরূপে বর্ত্তমান কালের অধিকতর কার্য্যোপযোগিনী, প্রধানতঃ এই কারণেই, ঐ রূপ রচনা আবির্ভূত হইয়া তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিয়াছে; অনুসৃত ও অনুকৃত হইতেছে। নতুবা উহার সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় এবং উহার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সহায়তা ও পুষ্টি সাধন কিছু মাত্র হইতে পারিত কি না সন্দেহ। কারণ, লালিত্য, কোমলতা, লাবণ্য, করুণা ও মাধুর্য্যাদি গুণে ও গৌরবে এখনকার গঠিত অভিনব বাঙ্গালা, পূর্ব্বতন বাঙ্গালার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আত্ম-আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে কখনও পারিত না ও কখনও, বোধ হয়, পারিবে না। তথাচ, লালিত্য ও মাধুর্য্যাদি সুকুমার স্বরূপও যে এখনকার গঠিত অভিনব রচনায় বিদ্যমান থাকে, তাহার কারণ পূর্ব্বতনের সহিত অধুনাতনের অথবা মৌলিকের সহিত মিশ্রিতের গণ-মিলন ও ধাতু সংমিশ্রণ। এই 'গণ মিলন' ও 'ধাতু মিশ্রণ' কার্য্য যে সকল লেখক যে পরিমাণে সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, পারেন ও পারিবেন, তাঁহাদেরই গঠিত নব প্রণালীর রচনা, বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বভাবের সহিত সেই পরিমাণে মিশিতে ও মানাইতে পারিয়াছে, পারে ও পারিবে। নহিলে, যে সকল স্থলে 'গণ-মিল' হয় নাই ও হয় না, সে সকল স্থলে সাহিত্য শরীরে ভাষার কেবল বিকার ব্যভিচার ও বর্ণসঙ্করত্ব মাত্রই ঘটে।

নূতন রীত্যনুসারিনী রচনার প্রধান দোষ, তাহার দুর্ব্বোধ্যতা। শিক্ষিত ভিন্ন অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না। কোন কোন সময়ে শিক্ষিতেরও তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। সে দিন কোন ইংরেজী রচনা-নিপুণ সম্পাদক বন্ধু বলিতেছিলেন "তোমাদের এখনকার এ আধ সংস্কৃত ও আধ বিলাতী "বিভীষিকে" আমার বোঝা ভার। বাঙ্গালা পোড়তে বড় ভালবাসতুম, কিন্তু এখনকার এ বিষম বাঙ্গালার ভয়ে তা গিয়েছে।"

সম্পাদকের সম্মুখে টেবিলের উপর কয়েক খানা বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে এক খানা পুস্তক যদৃচ্ছা টানিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া সহাস্যে পুনঃ বলিলেন,—"এ সব বই অবশ্য For Kind notice" কিন্তু দেখ, এ পোড়তেই ত প্রথম প্রাণ-অন্ত পরিচ্ছেদ,—এক একটা সমস্ত [illegible]

শর্ব্বঃ--যথার্থই আমি এ কটমট,কায়দার ভিতর আন্‌তে পারিনে ;—তার পব এ বুঝতে শব্দ-কল্পদ্রুমেও কুলয় কি না,তোমবাই জান।"

উত্তরে আমি কিছু বলিতে উদ্যোগ কবিতেছিলাম, কিন্তু বন্ধু আমাব আবম্ভেব পুর্ব্বেই পুনঃ বলিলেন ;—"ঐ ত গেল এক রকম ; ও গুলোকে কি বোল্‌বে ? দাঁতভাঙ্গা ডুবন্ত বাঙ্গালা, না বিদ্যাবত্ন পুরুত ঠাকুবেব বিলিতি বাঙ্গালা ? কেন না, টিকি, ফোটা, নামাবলী ও নস্যদানি ত আছেই, তাহাব উপব ওয়েষ্টকোট, অ্যালবার্ট সিঁতি, গোঁফ, গালপাটা, নেক্‌-টাই ও ন্যাপকিনও দেখতে পাই। মাথায় হ্যাট্‌ ও কপালে হাডিকাট্‌,—এখনকাব বাঙ্গালা ভাষাব। তাতেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সেনটেন্স গুলো নামতাব মত লম্বা, আব সোয়াএ আড়াযেব মত শক্ত। দেখ-লেই ভয় পাই। কিসেব ভয় তা জান ? সে কালের পাঠশালাব সেই বেতেব ভয়, আর বিছুটির ভয়। আবাব, আব এক বক-মেব বাঙ্গালা বই পেযে থাকি, তাও হয় ত এখানেই আছে ; সে গুলো পাঠশালা নয় বটে ; কিন্তু হাটখোলা। হেয়ালী গুলো দেখে হাত পা পেটে যায়,কিন্তু,ঝুমুবওয়ালী গুলকে ঝাঁটা-পেটা না কবে থাকা যায না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম ;—"কেন ? তা আর তত মন্দ কি ? এ অবস্থাটাতে ত মোটের উপর বেশ "তউল" ঠিক রাখ্‌ছে।"

সম্পাদক।—"হাঁ তা বটে ! কিন্তু যাই বল, এখনকার বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজী ইডি-য়মের নকল শিখ্‌তে যেয়ে, ইংরেজী অপে-ক্ষাও অধিক ইংরেজী হ'য়ে উঠ্‌ছে ; যেমন বাঙ্গালী সাহেব সাজতে যেয়ে, সাহেবদের চেয়েও দু'চার বেশী চালে। আর এই যে আছোলা সংস্কৃত শব্দ গুলাতে বর্ত্তমান বাঙ্গা-লাব গাল গলা ফোলা আব কুঁচ্‌কি কণ্ঠ পর্য্যন্ত পবিপূর্ণ—পীড়িত, ও গুলা যথার্থই "প্লেগ"—আসল বিউবনিক প্লেগ ; ডাক্তার সিমসনেব কল্পিত কলিকাতার মিউনিসিপাল প্লেগ নয়।"

পবিহাস বসিকতায় অতিবঞ্জিত হইলেও, উপবোক্ত মন্তব্যেব স্থানে স্থানে অল্পাধিক পবিমাণে সত্য উক্তি আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? ফলতঃ এখনকাব বচনা, গদ্য বা পদ্যই হউক,কিছু দুর্ব্বোধ্য বটে ; অন্ততঃ লোকে ঐ দুর্নাম বটায। কিন্তু ইহাও স্মরণ বাখিতে হইবে যে, পাঠকেব বোধ শক্তিব ও শিক্ষাব পবিমাণ ও লিখিত বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুতাব উপবেও দুর্ব্বোধ্যতা ও সহজ বোধ্যতা নির্ভব কবে। আমাব যাহা অবোধ্য, যদি তোমাব তাহা বোধ্য হয়, তাহা হইলে বচনাকে অবোধ্য না বলিয়া আমাকেই অবোধ বলা উচিত। তথাচ দুর্ব্বোধ্য ও সহজ বোধ্য বলিয়া বস্তু আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন বচনা এত হালকা, পাতলা, সবল ও তবল যে, তাহা নিমেষ মধ্যে মিছবিব শববৎবৎ বোধ শক্তির তলদেশে যাইয়া পৌছে। পক্ষান্তবে এম-নও রচনা থাকে,না থাকিলে চলে না, যাহা চিন্তা কবিয়া চিবাইয়া বুঝিতে হয়। এখন-কাব গম্ভীব প্রকৃতিব বচনার প্রতি এই শ্রেণীব দুর্ব্বোধ্যতা প্রযুক্ত হইতে পাবে। এই প্রকৃতির রচনা অশিক্ষিতের একরূপ অবোধ্য এবং শিক্ষিতদিগের অল্পাধিক পরিমাণে দুর্ব্বোধ্য, কেননা চিন্তা করিয়া ও চিবাইয়া তাহা বুঝিতে হয়। কিন্তু এরূপ রচনার সর্ব্বথা প্রয়োজন আছে ; বিশেষতঃ বাঙ্গালা বুঝা যায় বলিয়া যখন বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে

শিক্ষার্থীর সাহিত্য হইতে বেদখল করিয়া দিয়াছেন, তখন বাঙ্গালারও উচিত, কিঞ্চিৎ কঠোরতা অবলম্বন করিয়া দুর্ব্বোধ্য হওয়া। নহিলে সংক্ষুব্ধ সম্ভ্রম সজীব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নেহাত নির্ব্বোধকেও বুঝিতে দেওয়ার ক্ষতি ষোল আনা রকমই হইয়াছে। হইয়াছে এই যে, বাঙ্গালা এখন বেওয়ারেশ বস্তু, অতি অযোগ্য অপদার্থেরাও অপবিত্র হস্তে উহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অপমান করে। ফলতঃ যাহা চিন্তা সহকারে লিখিত, তাহা আয়ত্ত করিতে কিঞ্চিৎ চিন্তার প্রয়োজন হইয়াই থাকে; তজ্জন্য বিচলিত হইতে পার না। তথাচ রচনা যে প্রকৃতিরই হউক, বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ও বিবৃতির বৈচিত্র্য ভেদে, গুরু বা লঘু হউক, কঠিন বা কোমল হউক, শুষ্ক বা সুললিত হউক, প্রাঞ্জলতা সকল অবস্থাতেই প্রার্থনীয়। কেবল প্রার্থনীয় নয়, অনিবার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। যাহা অপ্রাঞ্জল ও অস্পষ্ট, তাহা অল্লাধিক পরিমাণে অবোধ্য। অবোধ্য রচনা নিষ্ফল বৃথা বাক্য যোজনা মাত্র। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ রচনা আছে, প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে, ইহাই অনুশোচনীয় এবং সমালোচকের কটাক্ষেরও আবশ্যকস্থলে কষাঘাতেরও উপেক্ষনীয় নয়। যাহাদের বুঝিবার কথা, তাহাদের বোধগম্য না হইলে নিশ্চয়ই সে রচনা অবোধগম্য ও সেভাব কষ্ট-কল্পিত বলিতে হয়। তবে অবোধ্য সাহিত্যের বা শ্লোকের এক-বর্ণও না বুঝিয়া "আহা মরি" বলিয়া মাথা নাড়ে, এমন অন্তঃসারশূন্য লোকেরও অভাব নাই। কিন্তু তাহারা কৃপার পাত্র।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে যাহা ছিল না, অথবা নাই, তাহার নূতন সৃষ্টি করিতে অগত্যা এবং ইষ্টের অনুরোধে, সংস্কৃতের এবং বিলাতীর অনুসরণ, অনুকরণ করা হয়, আশ্রয় ও সহায়তা লওয়া হয়; অতএব তাহা কেবল অনিন্দনীয় নয়,—প্রশংসনীয়ও হইতে পারে। তবে, তাহা বাঙ্গালার ধাতুগত গতি প্রকৃতির সহিত সমন্বয় করিয়া লওয়া চাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গুরু বিষয়ক, গদ্য সম্বন্ধীয় সন্দর্ভ-সমালোচন, সাহিত্য, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, জটিল ও কঠিন বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ-প্রবন্ধ প্রভৃতি যাহা কেবল শিক্ষিত সমাজের উদ্দেশে ও শিক্ষিতদিগকেই সম্বোধন করিয়া লেখা হয়, তাহার আকাঙ্ক্ষা ও আবশ্যকতানুরূপ শব্দের জন্য, সংক্ষিপ্ততার জন্য, ও শিল্প-শৃঙ্খলার জন্য, সংস্কৃত শব্দ-সাগর মন্থন, ইংরেজী ইডিয়ামের বা বাক্য-বিন্যাস প্রণালীর সু-মানান অনুকরণ বা অনন্যতন্ত্র আর কোন পথ অবলম্বন করাতে রচনা যে অশিক্ষিত বা ইতর সাধারণের অবোধ্য হয় বা শিক্ষিত সাধারণের শ্রম-বোধ্য হয়, তাহাতে উপায় নাই। এ সকল স্থলে, এক মাত্র প্রাঞ্জলতার প্রতি দৃষ্টি থাকিলে, অন্ততঃ এই সংগঠন কালে, আর কোন কথা বলা চলে না। একবার কতক গঠিত হইয়া গেলে পর, তখন সাহিত্যের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কাটছাট পড়িয়া অসমর্থ সমর্থকে রাখিয়া স্বস্থানচ্যুত হইবে।

কিন্তু বাঙ্গালা কবিতা বা কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে, বোধ হয়, কথা কিছু স্বতন্ত্র। বাঙ্গালা-সাহিত্যের অদ্যকার অনেকানেক উপকরণ নূতন হইলেও, কাব্য কবিতা নূতন নয়। ফলতঃ কেবল কাব্য কবিতাই পূর্ব্বতন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সাহিত্য ছিল। পূর্ব্বে কেবল কাব্য কবিতাই সুমহৎ সাহিত্য নামে অভিহিত হইত। এবং তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই বুঝিত এবং বুঝে, বর্ণজ্ঞের ন্যায় বর্ণহীনেও বুঝে। কিন্তু, এখনকার বাঙ্গালা কবিতা

তাহারা বুঝে না। সে কবিতা বুঝা শিক্ষিতেরও কৃচ্ছ্রসাধ্য, কতক স্থলে আদৌ অসাধ্য। কিন্তু তাহা অন্যান্যাংশে হয় ত উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট।

এখনকার নানা রূপিনী কবিতার আদর্শ মূর্ত্তি অঙ্কিত বা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেই কাজটা কিছু সোজা হইত, কিন্তু স্থান হইবে না; সে মূর্ত্তি কি রূপ, এখনকার পদ্য গ্রন্থের পাঠক মাত্রেই জানেন; অতএব তাহাই পর্য্যাপ্ত। ভবিষ্য আলঙ্কারিক সম্প্রদায় এখনকার কবিতার সাধাবণ লক্ষণ নির্ণয় কল্পে কি লিখিবেন, বলা যায় না, কিন্তু এখন মোটেব উপর দেখিলে, প্রায় ইহাই অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে, উহা সংস্কৃত শব্দ-বহুল, বিলাতী বাঙ্গালা ও অবাঙ্গালা ইডিয়ম-প্রভাবিত পংক্তি-মালা। লৌহবৎ কঠিন, বা নবনীতবৎ কোমল, পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র,—স্থক্ষ বা দেউলবৎ দীর্ঘ,—স্থূল শব্দ;—অত্যন্ত অতিরিক্ত সাধুভাষা এবং ইতরাদপি ইতর শব্দ; অমরকোষ হইতে কৃচ্ছ্র-সংগৃহীত অশ্রুতপূর্ব্ব সংস্কৃত শব্দ এবং কোথাও বা প্রাদেশিক অপ্রচলিত গ্রাম্য শব্দ;—একত্রে, অভেদে, একাধারে সংযোজিত; চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত-ব্যবহৃত নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জলা সংস্কৃত, রন্ধনশালার বা নাট্য-কক্ষের নারীজন-ব্যবহৃত অপভ্রংশ বাক্যের সহিত একত্রে মিলিত:—যদৃচ্ছ ছন্দে ছন্দ-বর্দ্ধিত বা ছন্দ-বিহীন; কোথায়ও অতীব কঠোর, কোথায়ও তাদৃশ কোমল, কোথায়ও উভয়ে সংমিশ্রিত, কোথাও উজ্জ্বল, কোথায়ও অস্পষ্ট, কোথায়ও বোধ্য, কোথায়ও দুর্ব্বোধ্য, কোথায়ও বা অতীব শ্রুতিমধুর একান্ত অবোধ্য পদার্থ। আধুনিক উচ্চতর আখ্যান কাব্যের ও গীতি কবিতার ইহা বাহ্যাবয়ব বা শারীরিক গঠন। এবম্বিধ আকার-শালিনী কবিতাকে কেহ বলেন "সান্ধ্যগগনের মুর্ম্মর দহন" কেহ বা হয় ত বলিবেন "ফুৎকারোৎফুল্ল উষবুর্ধাঙ্গে নির্জ্জরানঙ্গ চুম্বন।" কিন্তু এ উক্তি বিদ্রূপ রসিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে; আর কিছুই হইতে পাবে না। কোন কোন স্থলে আধুনিক বা এই আকৃতিব কবিতা নিন্দা ও ব্যঙ্গের বিষয় হইলেও, সে নিন্দা ও সে ব্যঙ্গ সবিশেষ অর্থযুক্ত ও ন্যায্য নিশ্চয়ই নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। নিন্দার কথা কিছুই নাই, প্রত্যুত প্রশংসার কথা বিস্তর আছে। শব্দ-নির্ব্বাচনেব ও শব্দ-সংযোজনার প্রণালী সম্বন্ধে সাধাবণতঃ কিঞ্চিৎমাত্রায় এবং সময়ে সময়ে অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত মাত্রায় যথেচ্ছাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইলেও ইহা স্থির যে, বর্ণের ও শব্দের জন্য শিল্পী, চিত্রকর বা কবি, সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে ও সর্ব্বত্র হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে অধিকাবী। তাহাতে ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট নাই। ইষ্টানিষ্ট যাহা কিছু, তাহা শব্দের বা বর্ণের বিন্যাস-বৈচিত্র্য-নিপুণতার তারতম্যেই ঘটে, কিন্তু সে বিচার আমি এখানে করিতেছি না; করার প্রয়োজন নাই; এবং এ প্রকার সাধারণ ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে সে বিচার সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ ভাবে করাও যায় না। আমি, আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে, কেবল এই বলিতেছি যে, বাঙ্গালী সাধারণের তাহা দুর্ব্বোধ্য এবং অবোধ্য। বাহ্যাবয়বে যেমন, অন্তঃস্বরূপেও সেই রূপ। আধুনিক কবি-কল্পনা ও ভাব, উচ্চতায় বা বৈচিত্র্যে বা কাব্যোপযোগী সত্ত্বায়, কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট নহে, অনেক স্থলেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তথাচ তাহা অল্লাধিক পরিমাণে বাঙ্গালীর ভাব নহে;—বাঙ্গালী-চিত্তের চিরন্তন, চিরাভ্যস্ত

এবং চিরামর বাঙ্গালা সংস্কার নহে। তাহা হইতে উহা দূর,—প্রায়ই বাঙ্গালী হৃদয়ের নিকট হইতে উহা প্রচুর দূর। কাজেই ইংরেজী যুগের বাঙ্গালা কবিতা বাঙ্গালী সাধারণে বুঝে না।

সাধারণ মানব-স্বভাবই সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক এবং তাহারই অনুসরণ, উদ্ঘাটন ও বর্ণন, কবি ও কাব্যকে অমর করে ও জাতীয় সাহিত্যকে উন্নত করে, ইহা স্থির। কিন্তু যে জাতির জন্য, যে জাতীয় ভাষায় ও যে জাতিকে সম্বোধন করিয়া কাব্য ও কবিতা লিখিত হয়,—কাব্য কবিতা-বর্ণিত সার্ব্বভৌমিক সাধারণ মানব-স্বভাব, দেব-স্বভাব বা পশু-স্বভাব, সেই জাতির হৃদয়-গত সংস্কারের বা স্বভাবের নিকটবর্ত্তী না হইলে, নিকটবর্ত্তী না করিয়া দিলে, সে জাতির তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না; সুতরাং সে জাতির পক্ষে,—সকল জাতির পক্ষেই তাহা প্রায় নিষ্ফল হয়। কেননা, সবিশেষ ভাবে যে জাতির জন্য তোমার কাব্য কবিতার সৃষ্টি, সেই জাতির সর্ব্ব সাধারণের যদি তাহা বোধগম্য না হইল, তবে আর কোন জাতিরই বা হওয়া সম্ভব? সেক্সপীয়র বা অন্য কোন অমর ইংরেজ কবি যে সকল স্থলে সাধারণ ও সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক মানব-প্রকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন, সে সকল স্থলে সে প্রকৃতি ইংরাজ প্রকৃতির স্বজাতীয় সংস্কারের সহজ-পরিচেয় ও নিকটবর্ত্তী করিয়া অঙ্কিত করেন নাই, কে বলিবে? কিন্তু এপক্ষে আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতা-প্রণেতাগণ (কথাটা অবশ্যই অত্যন্ত বিস্তৃত ও সাধারণ ভাবেই বলিতেছি;—ইহার ব্যতিক্রম স্থলও বিস্তর আছে) বিলক্ষণ উদাসীন। এখনকার বাঙ্গালা কবিতা, বরং এপক্ষে, বিলাতী, মিসরী, মান্দ্রাজী, পঞ্জাবী, রাজপুতনা ভূমির বাবু-বঙ্গের বা বিবি বঙ্গের, বা অন্য কোন স্থানের, কিন্তু প্রায়ই সাধারণ বাঙ্গালার ও সর্ব্ব সাধারণ বাঙ্গালীর ভাব ও স্বভাব-সুগম্য নহে। আবার হয় ত, কোথাও সে কাব্য-ভাব এত গাঢ়, এত ঘন, এত অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট, এত অস্পষ্ট যে সংস্কৃত "সূত্র" অপেক্ষাও সংযত ও সূক্ষ্ম। সুতরাং অবোধ্য, অকর্ম্মণ্য। সর্ব্ব সাধারণের নিকট ত তাহা পৌঁছেই না। শিক্ষিত সাধারণেরও সাহিত্য-স্বার্থের বিষয়ীভূত হয় না, অথবা অতি অল্পই হয়।

ইদানীং এদেশীয় লোকের (বিদ্যা, বহু বিদ্যালয়, বহু পুস্তক ও বহু পুস্তকালয় সত্ত্বেও) সাহিত্য-প্রীতি প্রবলা নয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্য প্রীতি অতীব অল্প, কাব্য-সাহিত্য-প্রীতি ততোধিক অল্প। এরূপ অবস্থায় কাব্য-গত রসানুভূতির কিঞ্চিন্মাত্র কাঠিন্যও সে প্রবৃত্তির প্রতিকূল হইয়া ক্রমে সে প্রবৃত্তিটী পর্য্যন্ত একান্ত পরিম্লান ও অকর্ম্মণ্য করিতে পারে। যৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাধিক কাব্য ও কবিতা পুস্তক ছিল না, তৎকালে কিন্তু বাঙ্গালীর কাব্য-প্রীতি, কাব্যামোদ প্রচুর ছিল, এখন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, ইহা আমি জানি, অনেকেই জানেন। এ কালে কাব্য-প্রীতি কমিবার নানা কারণ উৎপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, সে সকল কারণের মধ্যে উপরোক্ত কাব্য-রসানুভব-কাঠিন্যও একটী কারণ নয়, কে বলিবে? রসাস্বাদ-পথ দুর্গম হইলে বা যে কারণেই হউক, ক্রমাগত রসাস্বাদে বঞ্চিত হইলে, সরস দ্রব্যেও লোকে বীতস্পৃহ হয়—বিরক্ত হয়। কাব্য-রস দুর্জ্ঞেয় হইলে, সাধারণ লোকে কাব্য মাত্রেই বিরক্ত হয় এবং আন্তরিক

রস-তৃষ্ণা অল্প অকিঞ্চিৎকর উপায়ে পরিতৃপ্ত করিতে যাইয়া কোমল প্রবৃত্তি, হীন, মলিন, কলুষিত করে, ইহা তত আশ্চর্য্য নয়; বিশেষতঃ এখনকার বাঙ্গালী-প্রকৃতি প্রায়শঃই যেমন অসার, অসহিষ্ণু ও চঞ্চল, তাহাতে ইহা যার-পর নাই সহজ ও সুবিধাকর। পরন্তু, অন্নাভাব, অপরিমিত শ্রম, অতিরিক্ত অর্থ লিপ্সা, জড়-বাদ, বিলাস-পরায়ণতা, বাঙ্গালীকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে; এ সকল কাব্য-প্রীতি পীড়িত করিবার প্রচুর ও প্রবল কারণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু, পক্ষান্তরে কাব্য-প্রীতি পরিরক্ষণক্ষম পদার্থও এখন প্রচুর বিদ্যমান। সৌন্দর্য্যানুভব-শক্তি-উদ্দীপক স্বভাবিক দৃশ্য ও শিল্প দ্রব্য এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ-প্রাপ্য ও সুলভ হইয়াছে; সাধারণ শিক্ষার অধিকতর বিস্তার এবং সর্ব্বোপরি নূতন নূতন উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থের প্রচার হইতেছে;—এ সকলই কাব্য-প্রীতি ও কাব্য-রসাস্বাদস্পৃহা পরি-বর্দ্ধনকর পদার্থ। অথচ দেখিতেছি, সে প্রীতি—সে স্পৃহা পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক কমিয়াছে। এই কারণেই বলিতেছিলাম, এখনকার কাব্যের দুর্জ্ঞেয়তা ও দুর্ব্বোধ্যতাও হয় ত, উহার একটী অন্তরায়। ফলতঃ ইহা সকলেই জানেন যে, কাব্য গ্রন্থের নাম শুনিতেই লোকে এখন শিহরিয়া উঠে, শিক্ষিত বাবুরা পর্য্যন্ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কুপিত হন; নাচ ও নক্সা, তাস বা তাদৃশ কোন তামাসা তল্লাস করেন; রঙ্গাভিনয়ের অভাবে বরং শতরঞ্চ ক্রীড়ায় বসেন;—বড় জোর একটা থিয়েটারী নাটক বা নোংরা নবেল টানিয়া লন। শেষোক্ত কার্য্যটাই এখন কাব্য-প্রীতির চরম-সীমা; সাহিত্যানুরাগের সুবৃহৎ লক্ষণ!!

কাব্যানুশীলন সম্বন্ধে সাধারণতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধিকাংশের এখন অবস্থা এই। অশিক্ষিত সাধারণের অবস্থা ইহা অপেক্ষা অধিক হেয় না হইলেও, ইদানীং তাহাদের কাব্য রসাস্বাদ পরিবর্দ্ধনের দ্বার-রুদ্ধ। কারণ এখনকার কাব্য তাহারা বুঝে না। বোধ হয়, এখনকার কাব্য কবিতা তাহাদের জন্য, তাহাদের উদ্দেশে লিখিতও নয়। যাহাদের জন্য তাহা লিখিত, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেও কিন্তু তাহার আদর নাই, অগ্রেই বলিয়াছি। অতএব এখনকার কাব্য-সাহিত্য স্বকার্য্য সাধনে একদিকে আদৌ নিষ্ফল, আর এক দিকে সম্পূর্ণ রূপে সফল নহে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে।

কিন্তু, অশিক্ষিত ইতর সাধারণের তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা সর্ব্বত্র এবং সকল সময়েই মুষ্টিমেয়। ইতর সাধারণের মধ্যে কাব্য-জ্যোতি বিকীরণ ও তাহাদের কর্ত্তৃক কাব্য-রসাস্বাদনই প্রকৃত উন্নতি; তাহাই জাতীয় সাহিত্যের সারবান প্রসার এবং জাতীয় জীবনের যথার্থ স্ফূর্ত্তি। জ্ঞান প্রাণ মন এবং অন্তঃকরণ ইতর সাধারণের মধ্যে সঞ্চার করে, কাব্য সাহিত্যই প্রধান কল্পে। অন্ততঃ এদেশে করিয়াছিল; তজ্জন্যই অদ্যাবধি এদেশে সে সমাজের অসীম মহাসাগর অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ সলিলময় রহিয়াছে।

বলা বাহুল্য, কাব্যপ্রীতির এই খর্ব্বতা—কাব্যালোচনা ও কাব্যামোদের এই ঔদাসিন্য, মহানিষ্টপ্রদ এবং ক্রমে ক্রমে পাশবিকতা-গ্রস্থ। কাব্য-প্রীতিও কাব্যামোদে মুহূর্ত্ত মধ্যে মানুষের অব্যবহিত অভাব, অন্ন-ব্যঞ্জন, টাকা পয়সার উপায় করে না বটে; কিন্তু, যাহা উৎপন্ন করে ও আনিয়া দেয়, তাহা অর্থ ও অন্ন ব্যঞ্জনেরই মত অত্যন্ত

আবশ্যকীয় পদার্থ। অথচ তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ ও উপাদেয়। তাহা, আধ্যাত্মিকতা। মানুষের মনুষ্যত্ব উন্নত করিবার ও পশুত্ব প্রশমিত রাখিবার একমাত্র উপায়। কাব্য-সাহিত্য যেরূপ অতি সহজে ও অজ্ঞাতে, জনসমাজে আধ্যাত্মিকতা বিস্তার করে—এতাবৎকাল করিয়াছে, সেরূপ আর কিছুতেই করিতে পারেনা। অপিচ, কাব্য-সাহিত্যের এই স্বরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা করি। অতএব জীবজগতে, সলিল সমীরণ সূর্য্যকিরণাদির ন্যায় মনুষ্য-সমাজে কাব্য-সাহিত্য ও কাব্যরসাস্বাদ সহজ, সুপ্রাপ্য, স্বচ্ছন্দ ও সাধারণ হওয়া অভিলাষত। কেবল অভিলষিত নয়, তাহা স্বাভাবিক, এবং তাহা সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতার প্রকৃত পরিচায়ক বলিয়াই আমার মনে হয়।

কাব্য-কবিতা তাহার এই স্বভাব চ্যুত হইয়া শিল্প কাঠিন্য-পূর্ণ হইলে স্বকার্য্য-সাধনে, অন্ততঃ তাহার শ্রেষ্ঠতম কার্য্য-সাধনে, সমর্থ হয় না। মহা কাব্যোপাধিক অমর কাব্য কবিতার গঠন, কাব্য সাহিত্যের এই সুমহৎ স্বাভাবিক স্বরূপের পরিচয় স্থল। প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা শিল্পাংশে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্টই হউক, সর্ব্বজন-সুবোধ্য। কিন্তু আমাদের আধুনিক উচ্চতর কাব্য-কবিতা, তাহাদের শতবিধ শিল্প-চাতুরী, ও সৌন্দর্য্য-প্রবণতা সত্বেও, এ পক্ষে অনুপযোগী; সুতরাং বহুকালাবধি বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে কাব্য কবিতার অভিনব জ্যোতি-বিকীর্ণ হয় নাই। বিগত পঞ্চাশ বৎসর কাল মধ্যে বাঙ্গালা কাব্য-কবিতার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এই নব যুগের কোন কবিই,—অত্যুৎকৃষ্ট কবিও খাঁটী বাঙ্গালীর হৃদয়ে আঘাত করিতে সমর্থ হন নাই। বস্তুতই ইহা বড় আক্ষেপ। আক্ষেপ কেবল বঙ্গীয় কবির পক্ষে নহে, বঙ্গ সমাজের পক্ষেও বটে যে, এ যুগের কাব্য রসাস্বাদে তাহারা বঞ্চিত। হায়! সুমহৎ সরস ফল এত উচ্চে,—এতদূরে যে, তাহা নিম্নস্থ জনের জীবনে, আদৌ অপ্রাপ্য, অনাঘ্রাত !!

শিশিরকুমার ঘোষের এই গীতি-গ্রন্থের অন্য কোন পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, আমি প্রথমতঃ কেবল এই কথাটী বলিতে চাই, এবং এই কথাটী বলিবার জন্য এতক্ষণ এতাধিক কথা উত্থাপন করিয়া, সাহিত্যের বিশেষতঃ কাব্য সাহিত্যের উপস্থিত অবস্থা বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি যে, যে অংশে এখনকার উচ্চ শ্রেণীর উপাদেয় কাব্য গ্রন্থ অসমর্থ ও অনুপযোগী, ইহা নিজে উচ্চ অঙ্গের উপাদেয় ও অতি স্বাস্থ্যকর কাব্য হইয়াও, সে অংশে সম্পূর্ণ রূপে সমর্থ ও উপযোগী; অর্থাৎ ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই বোধগম্য, সহজ ও অনায়াস-বোধগম্য। নিরক্ষর কৃষাণ কৃষাণী ও বাক্য-শ্রবণ-ক্ষম বালক বালিকাও ইহা শুনিয়া বুঝিতে পারে, ইহার সৌন্দর্য্যানুভব ও কিয়ৎপরিমাণে রসাস্বাদ করিতে পারে; অথচ মনুষ্য জীবনের সর্ব্বোচ্চ সমস্যা এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত; অতএব অতি বড় বৈজ্ঞানিক ও তত্ত্ববিদ্ দার্শনিক পণ্ডিতেরও ইহা বিবেচনার বিষয়। কিন্তু, এই গ্রন্থের এই গীতির গঠন যদি আমাদের বর্ত্তমান কাব্যযুগের কবিতার গঠন হইত এবং ইহার কল্পনা, কারুকার্য্য ও সমাহিত সদ্ভাব নিচয় বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সংস্কার ও স্বভাব হইতে সুদূরে ও অত্যুন্নত উচ্চে সংরক্ষিত করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিশির বাবু,

তাঁহার এই কাব্য গ্রন্থের সহজ-বোধ্যতা সম্বন্ধে কখনই সফল হইতে পারিতেন না। যুগপ্রচলিত সাহিত্য-রীতির উল্লঙ্ঘন করিতে সকলে পারেন না, শিশির বাবুর মত ব্যক্তিই পারেন; কিন্তু সে বিষয়, ভাষার গঠন, ছন্দের মিলন, শিল্পের সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্যের শৃঙ্খলাদি সম্বন্ধীয় কোনও বিষয় শিশির বাবুর বিবেচনায় ও চিন্তায় আদৌ স্থান পায় নাই; তাহা এই পুস্তক দেখিয়াই বুঝা যায়। এখন কোন্ রীতি প্রচলিত বা অপ্রচলিত, তৎপ্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া, যাহার বিষয় আমরা এত আড়ম্বরের সহিত আলোচনা করিতেছি, সেই ভাষা ও ভাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যেমন আসিয়াছে, ঠিক তেমনি ভাবে শিশির কুমার আত্ম-হৃদয় উন্মুক্ত ও অভিব্যক্ত করিয়াছেন;—তাহার চিহ্ন এই গীতির অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত। ফলতঃ ভাষা, ভাব বা শিল্প-চাতুরী এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় নহে, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অন্য রূপ, তাহা পরে বলিব। কিন্তু ভাষা, ভাব, শিল্প-সৌন্দর্য্য ও কাব্য রসাদি লক্ষ্য না হইলেও, ভাবে, ভাষায় শিল্প-লাবণ্যে ও রসোচ্ছ্বাসে, কল্পনায় ও চিত্র-কৌশলে, কার্য্যতঃ ইহা অতি উপাদেয় ও অভিনব কাব্য। অগ্রেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীর গৃহ-পালিত সরল ও সহজ বাঙ্গালা শিশির বাবুর ভাষা; তাহা অধুনাতন অপেক্ষা বরং পূর্ব্বতন, কিন্তু সঠিক তাহাও নহে; রচনা বিষয়ে তিনি আদৌ অনন্ত-তন্ত্র। ভাষা আছে, অথচ তাহার ভাণ নাই, শিশির বাবু সম্পূর্ণরূপে শব্দাড়ম্বরশূন্য। শিল্প-কৌশলে অবশ্য এরূপ শব্দ-আয়লা হইতে পারে; কিন্তু, এ স্থলে তাহাও নহে; লেখকের লেখার স্বভাবই সেই রূপ, ইহা সূক্ষ্মদর্শী পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। নহিলে, সহজ ও সরল রচনা, কি আর এত অসাধ্য সাধন? কে তাহা না পারে? আমি নিজেই পারি। ইচ্ছা করিলে, শিশির বাবু অপেক্ষা শত গুণ সরল ও সহজ বাঙ্গালা প্রস্তুত করিতে পারি। কিন্তু তাহা আমার স্বভাব নহে, তাহা হইলে আমার শিল্প-কারিগরী আর লিপি-বাহাদুরি! জোর করিয়া, চেষ্টা করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া তাহা লিখিতে হইবে। ভাষা যেরূপ স্বচ্ছন্দ, শিশির বাবুর ভাব-বৈভব, কবিত্ব ও চিত্র-সৌন্দর্য্যও তদ্রূপ স্বাগত। উদ্বেগ নাই, অবতরণিকা নাই, চিন্তা নাই, চমৎকারিত্বের ও লিপি-চাতুর্য্যের চেষ্টা মাত্র নাই; অথচ, সুন্দরের পরে আরও সুন্দর, মধুরের পর আরও মধুর, চিক্কণের পর আরও চিক্কণ, ভাব, চিন্তা, চিত্র ও দৃশ্য, শিশির বাবুর এই কোমল-করুণ-কাব্যে, প্রভাত কুসুমবৎ স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত।

কিন্তু, শিশির বাবু, কবি বলিয়া, কখনও আত্ম পরিচয় দেন নাই। বাঙ্গালা লেখক রূপেও তিনি, অপেক্ষাকৃত, অল্প লোকের নিকট পরিচিত। শিশির বাবু চির রাজনৈতিক, প্রায় আজীবন ইংরেজী লেখক এবং এই উভয় স্বরূপেই অতিশয় প্রখর, ইহাই লোকে জানিত ও জানে এবং আমিও এ বিষয় একবার, এই নব্যভারতে, তদীয় ভক্তি-স্বরূপ সমালোচনা কালে, সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছিলাম। শিশির বাবু সাহিত্য-জীবনের বরং শেষাংশেই সেই গৌরাঙ্গ-গৌরব প্রচারার্থে, পুনঃ বাঙ্গালা লেখনী ধারণ করিয়া বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। বোধ হয়, দুই বৎসর পূর্ব্বে, আমরা তাঁহার "অমিয়-নিমাই-চরিত" প্রথম খণ্ডের আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহার পর ঐ গ্রন্থের আর

তিন বৃহৎখণ্ড ও অত্যুৎকৃষ্টাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, এই আলোচ্য গীতি-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে "প্রবোধানন্দ ও গোপালভট্ট" প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহার পূর্ব্বে নরোত্তম-চরিত প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান প্রাত্যহিক পত্র পরিচালনার প্রধানত্ব ও দুর্ব্বহ দায়িত্ব যাঁহার স্কন্ধে, ভারতীয় প্রজানীতির নিরতিশয় শঙ্কা উদ্বেগে যাঁহার বক্ষ নিয়ত বিলোড়িত, তাঁহারই লেখনী, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে, এত দ্রুত চালিত, ইহাও এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। সম্প্রতি শুনিলাম, শিশির বাবু, ইউরোপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারার্থে ইংরেজীতে চৈতন্য চরিত-গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা তদীয় বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদ বা অনুকৃতি হইবে না; বৈষ্ণব-তত্ত্ব ইউরোপায় স্বভাব-সংস্কারের যাহাতে সহজ বোধগম্য হইতে পারে, তদনুরূপ এক মৌলিক গ্রন্থ হইবে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে শক্তি-বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। নানাদিক-প্রসারিণী প্রতিভার ইতিবৃত্ত কিন্তু ইউরোপেই অধিক। বৃদ্ধ মিঃ গ্লাডষ্টোনের শক্তি-বৈচিত্র্য-গৌরব অদ্ভুত। পরিশ্রমের ন্যায় তদীয় পাণ্ডিত্যের প্রসারও অদ্ভুত। কিন্তু, উপরোক্ত অবস্থাপন্ন জনৈক কৃষকায়, রুগ্ন বাঙ্গালীর পক্ষে, উপরোক্ত প্রকৃতির অবিচলিত অধ্যবসায় ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিকে শক্তি-শ্রম-সঞ্চালনের দৃষ্টান্ত বস্তুতঃই বিরল। স্বদেশ-প্রাণ শিশির বাবু বাঙ্গালীর মানসিক শক্তির সবিশেষ গৌরব করিয়া থাকেন, এবং প্রায় প্রতি দিনই স্বদেশীয়দিগের সে শক্তির দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া থাকেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ শক্তির দৃষ্টান্তটী বড় কম দৃষ্টান্ত নহে। তজ্জন্যই এস্থলে প্রসঙ্গতঃ তাহার উল্লেখ মাত্র করিলাম।

কেহ তত জানেনা, কিন্তু ইংরেজী পত্রের সম্পাদকতা সত্বেও শিশিরবাবু বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রের অতি পুরাতন হস্ত। "পত্রিকার" প্রথম যুগের কথা প্রবীণ পাঠক স্মরণ করুন, তৎকালে যুবক শিশির কুমারের সরস সাহিত্য চিত্রগুলি, শ্লেষচ্ছটায় ও রসিকতা-কৌশলে চিরস্মরণীয় ও অতুলনীয়। সুনিয়মিত, সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বিভাসিত ও নির্দ্দোষ হাস্যরসের এক একটী উৎস, সে গুলি শিশির বাবুর "রাজনৈতিক জ্যামিতি" (Political Geometry) বঙ্কিম বাবুর "দম্পতী-দণ্ডবিধি আইনের" (Matrimonial Penal Code) জ্যেষ্ঠ সহোদর। আক্ষেপ, সেই সরস হীরক খণ্ডগুলি আজও পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হইয়া নব্যদিগের নয়নাকর্ষণ করে নাই। পরন্তু, আমার অনুমান যদি নেহাত ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে সেই অদ্বিতীয় সামাজিক নাটক "নয় শ' রোপেয়া" শিশির বাবুর নামের সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে। সে নাটক বা তাহার অভিনয় যে কেহ দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহা আজও ভুলেন নাই, ইহা নিশ্চয়। কারণ যে সব দ্রব্য একবার দেখিলে কখনও ভুলা যায় না, 'নয় শ' রোপেয়া" নাটক তাহারই মধ্যের একটী।

অথাচ, বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক লেখক ও পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট বাঙ্গালা-রচয়িতা রূপে শিশির বাবু সবিশেষ পরিচিত বলিয়া আমার বোধ হয় না। কারণ, সে দিকে তাকাইয়া দেখিবার ও তল্লাস লইবার তাঁহার তত অবসর হয় নাই। পরন্তু, মধ্যে কতক কাল তাঁহার বাঙ্গালা রচনা খণ্ড কিছু প্রকাশিতও হয় নাই, যদ্দ্বারা বর্ত্তমান নব্য সম্প্রদায় তাঁহাকে জানিতে পারেন।